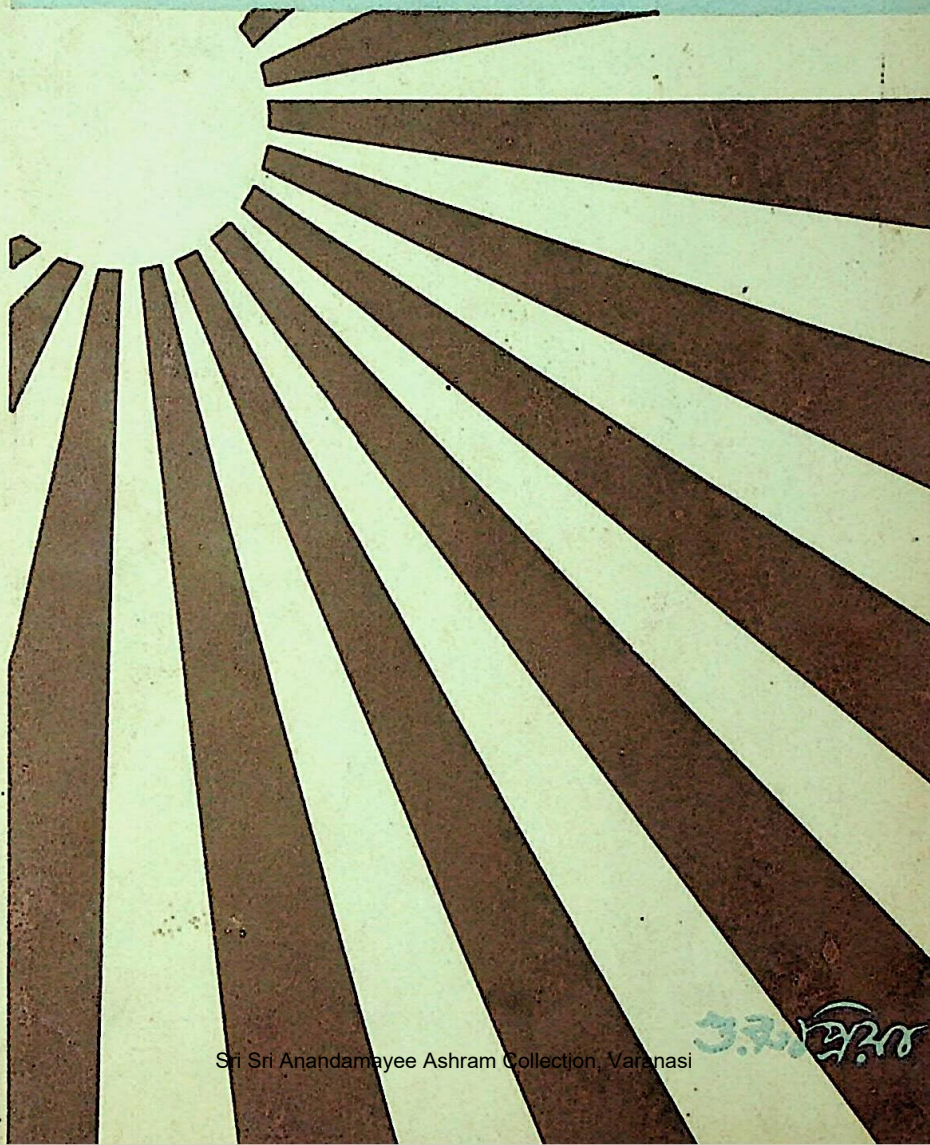


CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রীশ্রীমা অন্নন্দময়ী

৬ষ্ঠ ভাগ



শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ষষ্ঠ ভাগ—

মানবমন চির-জিজ্ঞাসু। অজানা, অদেখা, সুদূরের প্রতি তার দুরন্ত প্রলোভন! শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কে? কোথায় তিনি থাকেন? বি তাঁর উদ্দেশ্য? জগতের কোন্ মঙ্গল তাঁর দ্বারা সাধিত হইল?—এই সব বহুবিধ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে মাতৃরূপা — “পূর্ণব্রহ্মনারায়ণী” — মা সন্তান কল্যাণে দেশ-দেশান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিতেছেন— “তোমরা ভাল হও ও আমাকে দ কর।” এই যে অবিশ্রান্ত জীব ধারা, তার মধ্যে যে সব ঘাঁ সংঘটিত হইতেছে ও যে সব ত তাঁর পাবনস্পর্শে রূপান্তরিত হাঁ যাইতেছে, এই গ্রন্থমালা তা মোটামুটি ইতিহাস।

হরিদ্বারে ভোলানাথের প্রয়াণের পর সিমলা, এলাহা কলিকাতা নবদ্বীপ, কাশী, বিষ্ণু ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণের সাথে অমূল্য উপদেশরাজী বিব আত্মপরিচয়, সাধনা, পূর্বকথা ইত্যাদির নি সংগ্রহেই এই ভাগের সার্থকত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী
ষষ্ঠ ভাগ

প্রাপ্তিস্থান

- ১। আনন্দময়ী আশ্রম, ২৯৪ ভট্টদমৌ, বেনারস।
- ২। আনন্দময়ী মন্দির,
৪১৪, একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
- ৩। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সেন,
কুইন্সওয়ে, হিন্দুস্থান বিজিৎস, নিউ দিল্লী।
- ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য,
'কবীলজ', ক্রিসলদারবাগ, লক্ষৌ।
- ৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
"দেবালয়" ২৮, ডি, এ, ভি, কলেজ রোড, হেস্তান
- ৬। শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১২৯, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ষষ্ঠ ভাগ

[বৈশাখ—কাঁঠিক, ১৩৪৫]

ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

১৯৯৪ ভদ্রমৌ, বেনারস

—অষ্টম মুদ্রণ—

কাঠিক, ১৮৫৮

দুই টাকা মাত্র

[সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

শ্রীশ্রীমা অনন্ময়ী অশ্রী, ৪১৪ একডালিরা রোড হইতে শ্রী কুম্ভ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত, ত্রি-প্ত প্রেস ২০১ নং চৌমাঝার এবং ইন্সটাইটেড্ প্রিন্টিং
এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৩৪৪ নং গঙ্গা নদী বন্দ, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

প্রকাশকের কৈফিয়ত

এই বইখানার ছাপা আরম্ভ হওয়ার সময় নানা কারণে সুদূর-
কার্য পরিদর্শন ও সংশোধন আশা প্রদ হয় নাই—সেজন্য কিছু কিছু
ভুলত্রুটি আছে। তবে এই ভুল সবই ছাপা ও পাণ্ডুলেখনের। ঘটনা
বা তারিখের গুরুতর ভুল বিশেষ কিছু নাই। প্রকৃত পক্ষে
এখানার ষষ্ঠ ভাগ, কিন্তু ছাপা হইয়াছে পঞ্চম ভাগ হিসাবে। এই
সকল নানা কারণে বইখানার উপস্থিত প্রকাশ স্থগিত রাখাই সঙ্গত
হইত, কিন্তু পঞ্চম ও সপ্তম ভাগ ছাপা শেষ হওয়ার ধারাবাহিক
ক্রম যাহাতে বাহত না হয়, তাই ইহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।
কাগজের দুস্ত্রাপ্যতার জগ্য আবার কতদিনে যে নূতন সংশোধিত সংস্করণ
প্রকাশ হইত তাহা পুরাপুরিট অনিশ্চিত। অনিশ্চিতের জগ্য কেলিয়া
না রাখিয়া ইহাই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এই ত্রুটির জগ্য
ভক্তদের নিকট সহানুভূতি ও গার্জনা পাইব। ভরসা আছে এই সব
ভুলত্রুটি মাতৃতত্ত্ব সন্তানগণের লীলারস আনন্দনে বাধা জন্মাইতে
পারিবে না। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই নূতন পরিকল্পনায় করা হইল।

দীপান্বিতা—১৩৫৫

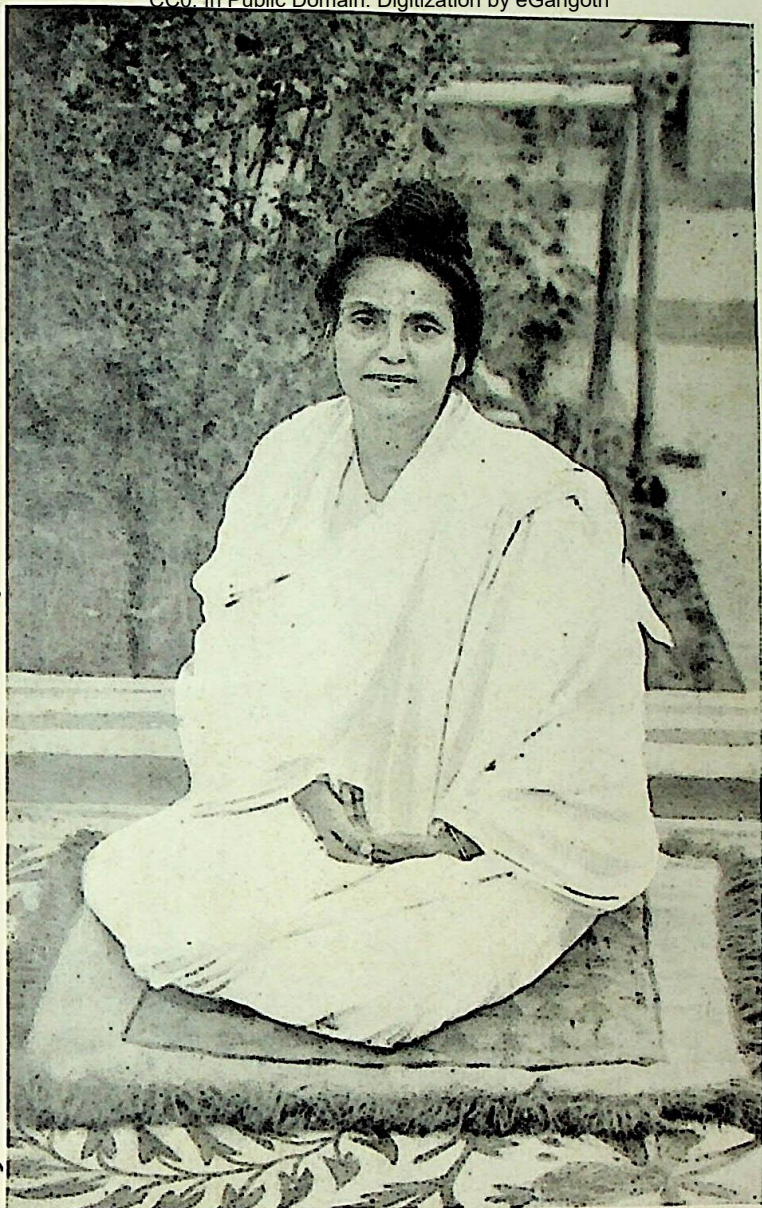
বিনীত—

২১৯৪ ভদৈনৌ, বেনারস।

প্রকাশক

সুচীপত্র

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
হরিদ্বার ত্যাগ ও দেবদ্বীন আগমন	১
কুঞ্জবাবুর সম্যাস	১৩
ঢাকার কালীগুজার ইতিহাস	১৬
বাবা ভোলানাথের দেহরক্ষা	৫৪
সিমলায় মা ও নামবজ্র	১০৩
“পূর্বব্রহ্ম নারায়ণের” কথা	১২১
সোলনে নামবজ্র ও মায়ের ভাবাবেশ	১২৫
মুনোরী	১৫৮
নির্মল বাবুর মৃত্যু	১৮৮
স্বকুমারের মৃত্যুর বিবরণ	২১০
দেবদ্বীনে মায়ের উপদেশ ও নানা কথা	২১৭
হরিদ্বার—মায়ের অস্থিতা	২২১
কঙ্কাগ্রাম প্রতিষ্ঠা	২৪৩
এলাহাবাদে ভক্তসঙ্গে মা	২৬৯



Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ।

পঞ্চম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সন ১৩৪৫ সাল ১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার :—

দুপুরে সকলে জিনিষপত্র নিয়া অতিকষ্টে স্টেশনে গেলেন কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর হয়রান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাকে নিয়া আমরা দুইটার জন বাসায় ছিলাম। অসম্ভব ভীড়ের জন্য কেহ যাইতে পারিলেন না। স্টেশনের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মা আবার বলিলেন “চেষ্টা কর” সহর গরম, ব্যারাম দেখা দিয়াছে। এত লোক নিয়া যত শীঘ্র সম্ভব বাহির হওয়া বিশেষ দরকার কিন্তু বাহির হইবারও উপায় নাই। শেষে স্থির হইল রাত্রি ১২টায় মোটরে সব দেরাডুন যাওয়া হইবে। মা সন্ধ্যার পরই গিয়া ছাতে বসিলেন। আজ মার শরীর বিশেষ অসুস্থ দেখিতেছি বেশী শুইলেন না। বোধহয় যাওয়া যাওয়া একটা ভাব সেটা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির ভাবে শরীরটা পড়িতেছেন। সন্ধ্যার সময় খানিক সময় ছাতেই শুইয়া রহিলেন তারপর উঠিয়া বসিলেন, বেশ আনন্দিতভাব। ছাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন গান করিতেছেন। সকলে মোটরের অপেক্ষা করিতেছে। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন “ডাক্তার সাহেব কত যত্নে পাখীটিকে ঘরে রাখিয়া ১০টায় দরজা বন্ধ করিয়া

দিয়া গিয়াছে আর পাখী যে শিকলী কাটিয়া বাহিরে গিয়াছে।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় গাড়ী আসিল। সব বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রি প্রায় ২১ টায় আমরা রওনা হইলাম। সকলে বাসে সাহারানপুর হইয়া দেৱাডুন গেলেন। মার মোটরে আমি, হরিরাম যোশী, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার কন্যা ননী দেৱাডুন আসিলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়া আমরা আসিলাম। দলে দলে হরিণ, খরগোস দেখা যাইতে লাগিল। শুনিলাম এ জঙ্গলে বাঘ, হাতীও আছে, লার্ট সাহেব বছরে দুইবার এই জঙ্গলে শিকার করিতে আসেন। মার শরীর খুবই অসুস্থ, কিন্তু এই ভাবে জোর করিয়া বাহির হইয়া না আসিলে ও অনেক অসুবিধা হয়ত হইত।

২রা বৈশাখ শুক্রবার :—

আজ ভোর ৫টায়া আমরা আশ্রমে পৌঁছিলাম। মার জ্বর আসিয়াছে। কিন্তু বেশ আনন্দে আছেন। আমার মার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইতেছি কারণ শরীর এত দুর্বল তার মধ্যে আবার জ্বর। বেলা প্রায় ৯টায় ভোলানাথ সকলকে নিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। আশ্রমের সামনের ছোট বাড়ীটা ভাড়া করিয়া জামসেদ পুরের ডাক্তার যতীশবাবু সপরিবারে আছেন। মাকে পাইয়া তাঁহাদের কত আনন্দ। আশ্রমের নিকটে আরও একটা বড় বাড়ী

ভাড়া নেওয়া হইল। গৃহস্থ ভক্তেরা সকলে আসিয়া সেখানে স্থান নিলেন। দুপুরে কি কথায় কথায় মা বলিতেছেন “যতক্ষণ ভাষা ততক্ষণই কৰ্ম্ম আছে, যতক্ষণকৰ্ম্ম আছে ততক্ষণই ভাষা আছে।” মার শরীর অস্থস্থ ঘরে ভীড় বেশী না হয় সেজষ্ঠ অনেক সময়ই দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে। সারাদিন রাত্রিই জ্বর চলিল।

৩রা বৈশাখ শনিবার :—

আজ সকালে সকলে মার কাছে বসিয়া আছেন হঠাৎ শচীবাবু বলিলেন “মা, রায় বাহাদুর কলিকাতা হইতে ঠিক করিয়া আসিয়া ছিলেন যে এবার মাকে নিয়া মুর্সোরী যাইবেন। মা অমনি বলিলেন “বেশত এখনই যোগাড় কর চল যাই।” কিন্তু রায় বাহাদুর মার এই শরীর নিয়া মাকে মুর্সোরী নিয়া যাইতে কিছুতেই রাজি হন না অবশেষে মা বলিলেন “আমি ভালই থাকিব তোমরা দেখিও চল যাই।” মার উৎসাহ বাক্যে প্রায় ১৬জন মাকে নিয়া বেলা ১১টার মুর্সোরী চলিলেন। বেলা ৪টার তথা হইতে দেৱাচুন কিরিয়া আসা হইল। সত্যিই দেখা গেল মা অপেক্ষাকৃত ভালই আছেন। সন্ধ্যা ৬টার রায় বাহাদুর, শচীবাবু প্রভৃতি কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন।

৪ঠা বৈশাখ, রবিবার :—

খবর পাওয়া গিয়াছে মা সকলকে নিয়া হরিদ্বার ছাড়িবার পরই হরিদ্বারে ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

আগুণ লাগিয়া বহুলোকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, পুলিশের সঙ্গে সেবা সমিতির মারামারি হইয়া গিয়াছে এই সব খবর পাইয়া মিনিষ্টার গোবিন্দবল্লভপান্ড হরিদ্বার আসিয়া ডাক্তার পীতাম্বর পান্ডের বাড়ী উঠিয়াছেন। সেই বাড়ীতে পুলিশ ইত্যাদিতে ভরিয়া গিয়াছে। মা যদি পূর্বেই ঐ বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া না আসিতেন বড়ই মুস্কিল হইত। হরিদ্বারের এই সব গোলমাল শুনিয়া মা যে কেন সকলকে একরকম টানিয়া ঐ ভীড়ের মধ্যে বাহির হইয়া আসিয়াছেন তাহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারিলেন। মা এই সব শুনিয়া যত্ন যত্ন হাসিতে লাগিলেন। আজ অনেক কষ্টে প্রাণকুমার বাবু সপরিবারে হরিদ্বার হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি পীতকুঠীতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন না অগতঃ ছিলেন তাই আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই সহরের এমন অবস্থা যে কেহ কাহাকেও খবরাখবর দেওয়া এক ভয়ঙ্কর ব্যপার। খাস যেন বন্ধ হইয়া যায় সহরের এই অবস্থা। নানা ভাবে লোক মারাও যাইতে লাগিল। প্রথম হইতে যেরূপ স্তম্ভনাশ শান্তি রক্ষার কাজ চলিতেছিল শেষ দিকে আর সেই স্তম্ভনা বজায় রাখিতে পারে নাই। ভয়ানক একটা অবস্থা দাঁড়াইয়া গেল। এখানে আসিয়াও ডাক্তার সাহেবের নিয়মানুযায়ী মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল।

৫ই বৈশাখ সোমবার :—

আজ ও মার জ্বর জ্বর ভাবটা আছে আর উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই।

৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার :—

আজ মার জ্বর জ্বর ভাবটা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত একটু ভাল দেখা যাইতেছে। মালিশ, সেক সব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বলিতেছেন “অনেক দিন ত করিয়া দেখিলে এখন সব বন্ধ কর।” আজ দুপুরে বেশী শুইলেন না। বৈকালে উঠিয়া বারান্দায় বসিলেন। নাম ঘরে কেহ কেহ বসিয়া নামগান করিতে লাগিল। রোজই সন্ধ্যা ও সকাল বেলা কীর্তন হয়। কথায় কথায় ভূপতি দাদা বলিলেন “মা, কিছুইত নষ্ট হয় না তুমি সেদিন কি বলিতেছিলে?” মা বলিলেন “নষ্ট কিছুই হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র। কি রকম নষ্ট হয় জান? যেমন বীজ হইতে গাছ হইল সেই বীজটা নষ্ট হইয়া গেল কিন্তু ঠিক সেইরূপই হাজার হাজার বীজের সৃষ্টি করিয়া দিল। তবেই নষ্ট সবই হয় আবার কিছুই নষ্ট হয় না দুই কথাই বলা হয়।”

আবার কথায় কথায় মা বলিতেছেন “রোগের মূর্তিগুলিও তোমাদের যেমন দেখিতেছি এমনই দেখি “দিনেরাত্রে বা শুয়ে বসে যেভাবে ধাকা হ'ক। তাই আমরা বিশ্রাম করিতে দেখিলেও বাস্তবিক মা'র সব সময় বিশ্রামের প্রশ্ন হয় না, তাই বলিতেছিলেন।

৭ই বৈশাখ বুধবার :—

আজ মার শরীর একটু ভাল দেখিতেছি, ভোলানাথ কয়েকজনকে নিয়ে মুসৌরী গেলেন। মার শরীর একরকমই আছে। তবে মুসৌরী হইতে আসিয়া জ্বর ইত্যাদি কমিয়া গিয়াছে। হাতের ব্যথা আছে।

৮ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার :—

আজও উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই।

৯ই বৈশাখ, শুক্রবার :—

মা আজ একটু বেশী বেলায় উঠিয়াছেন, অনেকে একান্তে মার সঙ্গে কথা বলিলেন। বেলা প্রায় ৯টার মাকে মুখ ধোয়াইয়া একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। বেলা ১১টায় ভোগ দেওয়া হইল। কয়েকটি মেমসাহেব মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। উপস্থিত সকলেও মার কাছে বসিয়াছেন, বেলা প্রায় ১২টা অবধি সকলেই মার কাছে বসিয়া নানাবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। ১২টার পর মার ঘর খালি করিয়া দেওয়া হইল মা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বৈকালে মা বাহিরে একটু হাঁটিতে লাগিলেন। কয়েকজন দর্শন করিতে আসিয়াছে বিহারের গির্ধোরের রাণী আজ সন্ধ্যাবেলায় মার দর্শনে আসিয়াছেন। ইনি সোলন রাজার কুটুম্ব।

১০ বৈশাখ, শনিবার :—

আজ বৈকালে সংজ্ঞাদেবীর মোটরে মাকে নিয়ে একা

বেড়াইতে বাহির হইলাম। হরিরামের অমুখ। তাহার বাড়ীর দরজায় যাওয়া হইল। মাকে বাড়ীতে পাইয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া মাকে দর্শন করিল। তারপর কাশীবাবুর বাসায় ও মনোহর মন্দিরে ঘুরিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসা হইল। আজ শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত প্রাণ কুমার বসু প্রভৃতির সপরিবারে কলিকাতা রওনা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রাণ কুমার বাবুর শ্বশুরী খুবই অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবং যথাসময়ে গাড়ী না আসায় আজ যাওয়া হইল না। আগামী কল্য যাইবেন স্থির হইল।

১১ই বৈশাখ, রবিবার :—

আজ মা সকালে একটু দুখ খাইলেন। তারপর মাকে নিয়া একটু রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতে কয়েকজন বাহির হইলেন। মার শরীর দুর্বল একটু হাঁটিয়া আসিয়াই নিজের ঘরে বসিলেন। এখন মা দুধরুটাই খাইতেছেন আর সব প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মা বলেন “এত স্বাভাবিকভাবে তোমরা খাওয়া দাওয়া করাইলে আমার শরীর তোদের দৃষ্টিতে ভাল থাকিবে না।” আবার নিজের ভাবে অতি সামান্যই খাইতেছেন। ভাত, তরকারী, ফল ইত্যাদি সবই প্রায় বন্ধ। কখনও সকলের কথায় হাত দুইখানি গরমে রাখিবার বেশ ব্যবস্থা করেন আবার সব খুলিয়া ফেলিয়া দেন, বলেন “এতদিন ত তোমরা সব ব্যবস্থা করিলে এখন খোঁলা বাতাসে থাকিতে দাও।” কাল রাত্রি প্রায় ১২ট,

বলিতেছেন দরজা জানালাগুলি সব বন্ধ করিয়া দাও, ঘরে ভয়ানক গরম কিন্তু মার কথায় তাই করা হইল।

এবার হরিদ্বারে ভোলানাথ যখন ফুলের মালা ও চন্দনে সাজিয়া দলবল নিয়া কীর্তনে বাহির হইতেন তখন কীর্তনের ভাবাবেশে তাঁহাকে খুবই সুন্দর দেখাইত। বাস্তবিকই কীর্তনে তিনি একটা গভীর আনন্দ পান। রাস্তায় দলে দলে লোক তাঁর চরণধূলা লইতে অনেকেই ব্যস্ত হইত। কুস্ত্র স্নানের দিন ভোলানাথ যখন দলবল নিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে নামিলেন তখন দলে দলে নাগা সন্ন্যাসীরা আসিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে আরম্ভ করিল। কি রূপ তাঁহারা ভোলানাথের মধ্যে দেখিয়াছেন তাহা ভোলানাথও জানেন না। সেবাসমিতির ছেলেরা ভোলানাথকে বাঁচাইতে গেল কিন্তু নাগা সন্ন্যাসীরা ছাড়ে না, তাহারা সকলে মিলিয়া মহানন্দে ভোলানাথকে স্নান করাইতে লাগিল। ভোলানাথ বলিতেছেন “এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমারও যে তখন কিরূপ মনের অবস্থা হয় তাহা বলিতে পারি না আমি যে কোথায় আছি তাই যেন ধারণা করিতে পারিতেছিলাম না!” রোজই ভোলানাথ প্রাতে কীর্তনের দল নিয়া বাহির হইতেন পূর্বেই লিখিয়াছি। মা গিয়া ভোর ৬টার আঙ্গিনায় দাঁড়াইতেন। মার কাছে খানিক সময় নাম করিয়া ভোলানাথ দলবল নিয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। রাস্তায় তাঁহার দলে মিলিয়া অনেকেই কীর্তনে যোগ দিতেন। মহানন্দে প্রায় তিন ঘণ্টা

কীর্তন নিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি কিরিয়া আসিতেন। কীর্তনে তাঁহার ক্লাস্তি বা বিরক্তি নাই মহানন্দে কীর্তনে ভোলানাথ নৃত্য করেন।

আজ বেলা প্রায় ৯৷ টায় দুইটি ব্রহ্মচারী (শম্ভুদাস বাবাজীর শিষ্য) মার দর্শনে আসিয়াছেন, তাঁহারা মুর্সোরী যাইতেছেন। একজন বলিতেছেন তিনি প্রায় ৯ বৎসর যাবত সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। গৃহে থাকা কালীনই তিনি মধ্যে মধ্যে কামাখ্যা ও বশিষ্ঠাশ্রম ইত্যাদি স্থানে গিয়া একান্ত মনে ধ্যান জপ করিতেন সেই সময়েতে অনেক হরিণ তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তিনি ভাবিলেন সংসারে থাকিয়া একটু জপ করিতেই এভাবে হরিণাদি আসিয়া গায়ের কাছে দাঁড়ায়; সব ত্যাগ করিয়া ভগবানের নামে বাহির হইলে হয়ত ব্যাভ্রাদিও হিংসা ভুলিয়া কাছে আসিবে, কিন্তু বলিতেছেন এখন যেন সেই গভীর ভাবটা নাই। অনেক সময় তাঁহারা মার কাছে বসিয়া রহিলেন। অপর ব্রহ্মচারীটির কাঠের কোপীন আছে। সেও ৮ বৎসর গৃহত্যাগ করিয়াছে। ইহারা দুই জনেই আজ আমাদের আশ্রমে স্থান নিয়াছেন।

আজ বৈকালে কাশীবাবুর স্ত্রী লছমী রাণী আসিয়াছেন। গত পরশু দিন তাহার ভয়ানক পেটের অসুখ হইয়া শরীর বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন ছিল পরদিনই ভাল হইয়া যায়। আজ মার কাছে আসিয়া তিনি বলিতেছেন এক অদ্ভুত ঘটনা। তিনি বলিতেছেন “মা, আমি অসুখের

পূর্বদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতেছি এক মূর্তি খুব কালো কিন্তু ভয়ঙ্কর নয় মূর্তি উজ্জ্বল যেন চমকিতেছে। সেই মূর্তি আপনার সামনে আসিয়া হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে আমি মনে করিতেছি এমন সুন্দর মূর্তি একি শিবের মূর্তি? তবে সর্প কোথায়? এর মধ্যে ঐ মূর্তি চক্ষের ইঙ্গিতে আপনার কাছে যেন কিসের আদেশ নিল সেই আদেশ যেন আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই হইল, আপনিও স্থিরভাবে বসিয়া আছেন ঐরূপ চক্ষের ইঙ্গিতেই যেন আদেশ দিলেন, আদেশ পাওয়া মাত্রই যোড়হাত হঠাৎ খুলিয়া দিতেই এক ভয়ঙ্কর সর্প বাহির হইল, প্রকাণ্ড তাহার মুখ সেই সর্প বাহির হইবার পর পূর্বের কালো মূর্তি আর দেখিলাম না। সেই সর্প বাহির হইয়াই আমার বস্ত্র খাইতে শুরু করিল, এতগুলি করিয়া কাপড় মুখে নিতেছে যেন সব খাইয়া ফেলিবে। আপনি স্থিরভাবে বসিয়া দেখিতেছেন আমি তখন ভয়ে চীৎকারে বলিতেছি মা, তুমি বসিয়া দেখিতেছ আমাকে সর্প খাইতেছে? মা, আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর কাতরভাবে এইরূপ চীৎকার করিবার পর সর্প মূর্তি যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর আমার মনে হইল বোধ হয় মৃত্যুরাজ আসিয়াছিল, মার রূপায় আমি বাঁচিয়া গিয়াছি হয়ত আমার একটা কঠিন ব্যারাম হইবে, কিন্তু আমি মরিবনা ভাল হইয়াই উঠিব। তাই হইল পরদিন সকালবেলা হইতেই হঠাৎ ঐ রকম অসুখ

আরম্ভ হইল যেন হাত, পা ভাঙ্গিয়া আনিতেছিল, তার পরদিনই ভাল হইয়া গেলাম।” মা এই ঘটনা শুনিয়া একটু হাসিলেন, আমি বলিলাম “তুমি যে মূর্তির কথা বলিলে ছবির মধ্যে যম মূর্তি ঐ রকমই দেখা যায়।”

এই ঘটনায় আমার কতগুলি ভাব মনে হইল। ধর্ম্মরাজ নিজের কাজ করিবার জন্য মার আদেশ চাহিলেন মার আজ্ঞা পাইয়া মহাকাল সর্পরূপে গ্রাস করিতে লাগিলেন। আর মা যেন দ্রষ্টারূপে স্থির ধীর নির্বিবকার ভাবে বসিয়া বসিয়া এই ধ্বংস লীলা দেখতেছেন। কোন ও রূপ বিকারই সেখানে স্থান পায় না। এই ভাবটা ভাবিতে-ও যেন প্রাণ ধীর স্থির হইয়া যায়। আবার প্রার্থনার কলও দেখাইলেন। এ সমস্তই সেই নিত্য পুরুষেই সম্ভবে। গীতায় যিনি বলিতেছেন আমি সবই করি আবার কিছুই করিনা যুগপৎ দুইটি বীপরীত ভাবই তাঁর মধ্যে খেলিতে পারে। মার মধ্যেও এ লীলা সর্বদাই দেখা যায় তবে সব সময় আমরা ধরিতে পারিনা। সাধারণের বুদ্ধির অতীত বিষয় তাই ধরিবার উপায় নাই।

সন্ধ্যা ৬টার শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র গুহ প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেলেন। রুগ্মা বুদ্ধাটিকে অনেক কষ্টে মোটরে উঠাইয়া আশ্রমের দরজায় আনিবার পূর্বেই মা আমাকে বলিতেছে “রোগও ত তাঁরই একরূপ চল আমরা রোগের রূপ দেখিয়া আসি।” এই বলিয়া আমাদের

নিয়া রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইতেই মোটর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। মাকে বৃদ্ধা খুব অনুরোধ করায় না মোটরে উঠিলেন। তিনি পায়ের ধুলা লইলেন, মার হাত টানিয়া নিয়া নিজের মাথায় গায় বুলাইয়া দিলেন। না বলিলেন “বিশ্বনাথ চিন্তা করিতে করিতে যাইও।” তাঁহাকে কালী নিয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর শ্রীযুক্তা সংজ্ঞা দেবী আসিলেন। তাঁহার মেয়ে জামাই-ও সঙ্গে তাঁদের মোটরে, আজও মাকে নিয়া মুর্সোরীর রাস্তায় একটু ঘুরাইয়া আনিলাম। গুজরাটি ব্যাস আজ দুই দিন হইল ইউরোপ হইতে ফিরিয়া এখানে আসিয়াছে। সন্ধ্যার পর সে মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিতে বসিল।

আজ সকলেই প্রায় চলিয়া গিয়াছেন শুধু ভূপতি দাদা ও নবতরু দাদা আছেন। যাওয়ার সময় সকলের কান্না বিশেষতঃ বুনির কান্নায় অনেকেরই চোখে জল আসিল। না বলিতেছেন “আমি হাসিতেছি, আমার জন্ম কি কঁাদিতে আছে?” আবার এক দিন বেলুরা যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন “তোমরা কঁাদিতেছ আমি হাসিতেছি এ কিন্তু একই।” একথায় বেলুর কান্না আরও বাড়িয়া গেল। সে দেখিল মার চোখও বুঝি ছল ছল। ইহার পরিমাণ এই হইল যে ঢাকা গিয়াও তাহার সংসার ভাল লাগিতেছে না সে চোখ দুটিই শুধু মনে পড়িতেছে আর মনে হয় ছুটিয়া সব ফেলিয়া মার কাছে চলিয়া যাই।”

মার যে এই রকম কত ভাবে আকর্ষণ তাহা বুঝিয়া ওঠা মানবের সাধ্যাতীত। তবুও আমার। দূরে সরিয়া যাইতে চাই কি দুর্ভাগ্য আমাদের। এমন সুযোগ হেলান হারাইতেছি। মা যে কত ভাবে সকলকে কৃপা করিতেছেন তাহা বুঝিবার শক্তি কোথায়? আজ বৈকালে কি কথায় কথায় আমি বলিতেছিলাম “মা, সব নিতে চাহিতেছেন।” মা হাসিয়া বলিলেন “দেয় কে? নিজেদের সব ঠিক রাখিয়া যাহা বাঁচে তাহা হইতেও সামান্য একটু দেয় কিনা সন্দেহ।” সকলেই একথার সত্যতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জ মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মা তুরীয়ানন্দ স্বামী নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধিমত বিরজা হোমাদি করিয়া সন্ন্যাস নেওয়া হয় নাই। তাই আজ দুই দিন হয় মা তাঁহাকে বিধিমত বিরজা হোমাদি করিয়া সন্ন্যাস নিবার জগু কনখল মঙ্গলানন্দ গিরির আশ্রমে পাঠাইয়াছেন। আজ সকালে তাঁহার সন্ন্যাসাদি দেখিবার জগু ভোলানাথ ও অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে মা তথায় পাঠাইয়াছেন। আজই শেষ রাত্রিতে তাঁহার সন্ন্যাস নিবার কথা স্থির হইয়াছে। ভোলানাথ নিজের শরীর একটু খারাপ বলায় মা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন কিন্তু ভোলানাথ যাইবার জগুই প্রস্তুত হইলেন। মা আমাকে একান্তে বলিলেন “ভোলানাথের একটা অসুখ ঠিক হইয়া আসিতেছে”। আমি বলিলাম “তবে যাইতে

বিশেষ করিয়া বাধা দেই?” মা বলিলেন “কল হইবে না যাইবেই, অমুখও হইবেই।” এই বলিয়া আবার চোখ বুজিয়া শুইয়াই রহিলেন। কয়েক দিন পূর্বেও বলিয়াছেন “তোদের দৃষ্টিতে “বিপদ আসিতেছে।”

১২ই বৈশাখ, সোমবার :—

আজ সকালে মা উঠিয়াছেন। মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিতেছি এর মধ্যেই হরিদ্বার হইতে বাবা ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী, শান্তি প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালই সন্ন্যাস নেওয়া হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ খুব অসুস্থ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার জ্বর ও পেটে বেদনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় “শ্রীশ্রী আনন্দময়ী প্রসঙ্গ” নামে মায়ের একখানা বহি বাহির করিয়াছেন। আজ ডাক যোগে তাহা এখানে পাঠাইয়াছেন। দুপুরে সেই বইখানি আমি মাকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। বেশ সুন্দর হইয়াছে। অমূল্যদাদা মার দর্শন পাইলেই মাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। মাও তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে ভালবাসেন। তিনি গভীর প্রকৃতির লোক। বাজে কথায় বড় যোগ দেন না। তিনি উপস্থিত থাকিলে বেশ ভাল ভাল কথা হয়। তাঁহার লিখিত বই মার কাছে পড়িতেছি। এক বায়গায় লিখিতেছেন শাহবাগ দেখাইতে গিয়া মা তাঁহাকে কবরের মধ্যে যে মার নমাজ।

পড়ার ভাবটা হইয়া গিয়াছিল সে কথাটা বলিতেছেন। একটা স্থানে একটু ভুল হইয়াছে। তাঁহার দোষ নাই। এই চরিত্র নিখিতে গিয়া সকলেরই পদে পদে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আমাদের ভাব ও ভাষাটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসিয়া পড়ে। যাক নিখিতেছেন, মা বলিতেছেন “আমার ভাবাবেশ হইল” মা কিন্তু এ শব্দ বলেন না। বলেন “শরীর জানি কি রকম হইয়া গেল”। আমি হাসিয়া বলিলাম “মা, এই টুকু আমাদের ভাষা হইয়া গিয়াছে।” মাও বলিলেন “আমার ত এ ভাষা বাহির হয় না। ভাবাবেশ যদি বল তবে ত সব সময়ই এক একটা ভাবাবেশ আছেই যেমন তোমাদের সঙ্গে যখন তোমাদের মত হইয়া কথা বলিতেছি তখন সেই একটা ভাবাবেশ। যখন তোমরা যে ভাবটা সামনে ধর তখন এই শরীরটা তদ্ ভাবাপন্নই হইয়া যায়। ভক্তিব্যোগের কথা বল, কর্মব্যোগের কথা বল, জ্ঞানব্যোগের কথা বল, জাগতিক যে ভাবের কথাই বল, সেই ভাবের সঙ্গেই এই শরীরটা যোগ দিয়া যায়, কথায় ও শারীরিক আকৃতিতেও সেই ভাবই ফুটিয়া ওঠে তাই তোমরা দেখ মার এক এক সময় এক এক ভাব। আসলে তোমরা যে ভাব সম্মুখে আন সেই ভাবেই ভাবাবিত দেখ। কাজেই সবইত ভাবাবেশ।” আবার এক যায়গায় আছে মা বলিতেছেন “আমি নিজেও তাহা জানিতাম না” এ কথাটাও ঠিক হয় নাই আমি “জানিনা”

মা এই কথায় এখনই বলিতেছিলেন “কেন ইহা বলি জান ? হয়ত সে কথা তোমাদের কাছে তখন বলা চলে না তাই বলি তোমরা বলিতেছ না বা বলিতে পারি না অর্থাৎ বলা হইবে না। জানি না একথা কখনও বলা হয় না ত। যে কথাটা বলা হইবে না সে কথাটা ঐ ভাবে বাদ দিয়া রাখা হয় মাত্র।” এই কথা বলিয়া মুদ্র মুদ্র হাসিতে লাগিলেন। একথা সত্যিই অনেক সময় একথার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। না বলার হইলেই কথাটা ঐ ভাবে বাদ দিয়া রাখেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলিয়া ফেলি মাও হয়ত জানে না। এই চরিত্র যে বড়ই দুর্বোধ্য।

আর এক স্থানে কালী পূজার ইতিহাস লিখিতেছেন। মা শুনিতেন শুনিতেন বলিতেছেন “সত্যি দেখিতেছি কি যেমন শিশু মার কোলে কাপাইয়া পড়ে সেই ভাবে কালী মূর্তি আমার কোলে কাপাইয়া পড়িতেছে আমিও যেমন শিশুকে হাত বাড়াইয়া কোলে নেওয়া হয় সেই ভাবে হাত বাড়াইয়াছি। আচ্ছা বল ত এসব কি ? এই একটা শরীর, আর সে কি করিতেছে, “না কালী মূর্তি কে শিশুর মত ভানে কোলে।” এই বলিয়া হাস্যময়ী মা শিশুর মত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন “দেখ আমি দেখিয়াছিলাম চলন্ত কালীমূর্তি, শিব নাই। তাহার অর্থ কি জান ? এ যে আগ্নেয়শক্তি। আমি অনেক কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কালীর নীচে শিব নাই কোন্ অবস্থায় ? কেহ জবাব দিতে

পারিলনা। কেন এ মূর্তি দেখিলাম জান? বলিয়াছিত তোমরা যে ভারটা নিকটে আনিয়া উপস্থিত কর তখন এই শরীরটা তদভাবাপন্নই দেখায় ও বলে। সেই সেই ভাবের পূর্ণ প্রকাশ যেন শরীরের মধ্যে হইয়া যায়। দীপাবলিতা আসিয়া পড়িয়াছে কালী পূজার জন্য তোমরা সকলে আমাকে বলিতেছ তাই স্বয়ং আদ্যাশক্তির রূপটি কালী মূর্তিতে প্রকাশ হইল।” কোন সঙ্কল্প বিকল্প নাই ত, তাই মা বলেন “তোমরা যে ভাব সামনে ধর সেই ভাবেরই খেলা শরীরটার মধ্যে হইতে থাকে।” কখনও কখনও দেখা যায় মহাপুরুষদের ও সমাধি ভঙ্গে জাগতিক যে ভাবটা প্রবল সেই ভাবের কথাটাই বাহির হয়। মারত সে রকম কখনও কিছু দেখি নাই। সব ভাবই যখন ফুটিয়া ওঠে, যখন রুগ্ন হইয়া পড়েন তখন রোগের ভাবটাই বা ফুটিবে না কেন? তাহাও পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া ওঠে। ১০৭ ডিগ্রি জ্বর। চোখে হয়ত দেখিতেছেন না, কানে শুনিতেছেন না, মাথায় যেন এঞ্জিন চলিতেছে। কিন্তু কোন ভাবের প্রবলতা নাই, তাই যদিও কখনও কিছু কথা সে অবস্থায় বলেন সে কথা পূর্ব মুহূর্তে যাহা করিয়াছেন তাহাই মাত্র, দুই একটা হয়ত কখনও বলিয়াছেন নতুবা আর কোন কথাই নাই। কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

১৩ই বৈশাখ, মঙ্গলবার :—

আজও ভোলানাথ খুব অসুস্থ। মা কালই বলিয়া রাখিয়াছেন

“ভোর বেলা তোমরা আমাকে একা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিও আমি যখন হয় উঠিব।” তাই করা হইয়াছে ভোর বেলা হইতেই মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেলা প্রায় ৯টায় মা উঠিলেন। তার পর হাত মুখ ধুইয়া একটু হাটিলেন। ধীরে ধীরে উপস্থিত সকলে মার চারিদিকে আসিয়া বসিলেন। বেলা প্রায় ১০টায় মার ভোগ দেওয়া হইল। ১২টায় মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমি অমূল্যদাদার লিখিত বইখানি একটু মাকে পড়িয়া শুনাইতেছি। সাপের ঘটনা শুনিতেছেন। সব সময় যেন শোনেন না। হঠাৎ বলিয়া ওঠেন “তুমি কি পড়িতেছ আমি ত শুনি নাই” বলিয়া হাসিতে থাকেন। বিছাকূট হইতে ফিরিবার পথে সাপের সহিত নৌকায় দেখা পড়িতেছি, মা বলিতেছেন, “সত্যই কি আশ্চর্য্য! দেখিয়াছিলে, নোকা চলিতেছে অথচ সাপটা নোকা হইতে ঠিক হাত দশেক দূরে দূরে আসিতেছে বেশী দূরেও নয় নিকটেও নয় এদিক ওদিকেও নয় একেবারে আমার বরাবর দশহাত দূর দূর আসিতেছিল চলন্ত নৌকার সহিত ও তাহার গতি ঠিকই রাখিতেছিল, সন্ধ্যা হয় হয় তখন আমার সামনে আসিয়াছিল।” তারপর যখন বীরেন দাদা অনেক বার জিজ্ঞাসা করিলেন “এ সাপটি কে মা?” তখনও মা বলিয়াছিলেন “আমি দেখিতেছি হাত দশেক উপরে এক সাধু ও তাহার সঙ্গে তাহার শিষ্য।” আজ বই পড়িতে পড়িতে কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “মা, তুমি অনেক সময় বল “তোমরা আমাকে

হয়ত শৌণ্ডাইয়া রাখিয়া যাও বিশ্রাম করিবার জন্ত তোমরা দেখিতেছ শরীরটা শুইয়া আছে কিন্তু তাহা নয় অন্য অনেক রকম আত্মাদের সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে তখন তোমাদের সঙ্গে যেমন করি ঠিক তাহাদের সঙ্গেও ঠিক সেই রকমই করি। একটুও পার্থক্য নাই। কাজেই বিশ্রাম বলিতে তোমরা যাহা বোঝ তাহা হয় না। আবার সব সময় তোমাদের মত তাহারা চঞ্চলতা করে না তখন আবার চুপ থাকি।” এই যে বল সেই সব জীবদের স্বরূপ কি? তাহারা কি আমাদের মতই হাত পা বিশিষ্ট না গন্ধের মত বাতাসে তাহাদের আগমন বুঝিতে পারা যায়?” মা বলিলেন “সব রকমই আছে একেবারে তোমাদের মত পরিস্কার হাত, পা বিশিষ্টও আছে আবার বায়ুর মধ্যে গন্ধের মত যে বলিলে সেই রকমও আছে আবার হয়ত শুধু বাণীই শুনা যাইতেছে আর কিছু নাই আবার হয়ত বাণীও নাই তাহাদের উপস্থিতি শুধু অনুভবের জিনিষ মাত্র। এই রকম অনেক রকমের আছে। তোমরা বলিতে পার আমরা যখন দেখি না তখন তুমি বলিলে কি হইবে? অনেকেই এইভাবে কথা বলে, কিন্তু উত্তর এই যে তোমরাই যদি দেখিতে পারিতে তবে ত তোমরাও সেই স্তরেই থাকিতে। এই স্তরে থাকিয়া তোমরা কি করিয়া সে সব দেখিবে? যেমন জলে কত পোকা আছে বায়ুতে কত পোকা আছে তোমরা এই চক্ষে দেখিতে পার না অথচ ডাক্তাররা যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দেখেন তোমরা কি তাহা অবিশ্রাম করিতে পার? ডাক্তাররা যে সেই

সব দেখিবার জন্ম কত বছর পড়িয়া সাধনা করিয়া আসিয়াছে তাই তাহাদের সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহারা জানে এই এই যন্ত্রের সাহায্যে এই এই জিনিষ দেখা যায়। সবই সাধন সাপেক্ষ, সাধনা না করিলে দৃষ্টি খুলিবে কি করিয়া?" এইরূপ অনেক কথা হইল। পাঁচটায় অনেক লোক মাকে দর্শন করিতে আসিল। মা নিজের কোঠায় বিছানায় বসিয়া আছেন। ডাটায় মাকে বলিলাম “মা, চল বাহিরে একটু হাটিবে।” মা উঠিয়া গিয়া বাহিরে একটু হাটিতে আরম্ভ করিলেন। ভোলানাথের ভয়ঙ্কর বমির ভাব, দুই দিন অনবরত চলিতেছে, মা হাটিতে হাটিতে সেই ঘরেও গেলেন। আবার বাহিরে গিয়া হাটিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টায় মাকে একটু দুখ রুটি খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ১০টায় মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৪ই বৈশাখ, বুধবার :—

মার শরীর একই রকম চলিতেছে। ভোলানাথেরও খুবই বমির ভাব, হামও উঠিয়াছে। মা আজও প্রায় ৯টায় উঠিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সংজ্ঞাদেবী আসিয়াছেন মাকে একটু টপকেণ্ডর নিয়া যাইবেন। মোটর নিয়া আসিয়াছেন। মাকে মুখ ধোয়াইয়া একটু দুখ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। মাকে, দিদিমাকে ও মনোরমাদিদিকে নিয়া সংজ্ঞাদেবী চলিয়া গেলেন। ভোলানাথ অস্থস্থ বলিয়া আমি গেলাম না। তাঁহারা প্রায় বেলা ১০। টায় ফিরিলেন। তারপর মায়ের ভোগ দেওয়া হইল।

ভাত বড় খান না, রুটী ও একটু তরকারী এবং দুধ দিয়াই মার সাধারণতঃ ভোগ হয়। কিছুই প্রায় খাইলেন না। খাওয়া দাওয়ার পর মা বিছানায় গিয়া বসিলেন। উপস্থিত সকলের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। বেলা ১২টার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যে কোনভাবে আমরা মার সম্মুখে উপস্থিত করি মা যে অনেক সময়ই তদ্ব্যবস্থাপন হইয়া যান সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন “দেখ এই যে হাতের লেখা তোমরা কত রকমের পাইতেছ তাহারও কারণ এই, একবার শরীরের যে কুমুদিনী পিগিমা ছিলেন সে লিখিতেছে দেখিয়া সেই রকম লিখিব বলিয়া বসিলাম দেখি কি ছোট ছোট ঠিক তাহার মতই অক্ষর গুলি হইয়া যাইতেছে। আবার বাবার লেখার কথা খেয়াল করিয়া যখন লিখিলাম তখন দেখি লেখার ছান্দ গুলি বাবার লেখার ছান্দই হইয়া যাইতেছে। আবার হয়ত সে সব খেয়াল না আসিলে ছাপার অক্ষর দেখিয়া লিখিলে অক্ষর গুলি সেই রকম করিবার জন্যই পুটুলী দিয়া দিয়া বিশেষ ভাবে লিখিতেছি। এদিক ওদিক হইলে পছন্দ হইতনা। ছোট বয়সে একা একা বসিয়া (শুদ্ধ অশুদ্ধের দিকে খেয়ালই নাই) এই সব কাণ্ডও দুই এক দিন হইয়া গিয়াছে, বুঝলেত লেখা পড়ার পণ্ডিতি।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মার সব কাজই ত এই রকম যাহারা দেখিয়াছেন তাহাদের মুখে শুনিতাম মার মত ঘর লেপিতে বা উনান তৈয়ার করিতে কেহই পারিত না। সবটার মধ্যেই

যেন একটা বিশেষত্ব থাকিত। তখনও সকলে ইহা লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু এ ভাবে দেখেন নাই যে ভাবে এখন দেখিতেছে। এক দিন নরুন্দিতে হাতের লেখা দেখিয়া সকলে ভাবিল বোঁ বুঝি খুব বিদ্বান। হাতের লেখাটাও পড়া শুনার তুলনায় অস্বাভাবিক। ভাবের যেন পুতুল। আমাদের ইচ্ছাতেই তাঁহার শরীরের মধ্যে নানা ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে আবার দেখা যাইতেছে এ সকলের অতীত। সব ভাবেরই একত্র সমাবেশ। তাই যখন আমরা বলিতাম “মা, তোমার অস্থখটা এখন সারাইয়া ফেল।” তখন হাসিয়া বলিতেন “খেয়াল হইলে নিশ্চয়ই সারিয়া যায় কিন্তু তোমরা যে খেয়ালটা করাইতে পারিতেছ না।” আজও সেই কথাই কথ্য হইতেছে, মা ও আমি বসিয়া আছি; মা কথায় কথায় বলিতেছেন “দেখ এই যে বলা হয় আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করিনা, এই ইচ্ছা হইল কি জান? তোমাদের মত জাগতিক ইচ্ছা বা সঙ্কল্প এই শরীরটার ভিতর হয় না, সেই মহান ইচ্ছাই সব হইয়া যাইতেছে কাজেই এক কথায় বলিতে গেলে ইচ্ছা করিলেই সব করা যায় আবার ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিনা এই দুই কথাই বলা হয়, দুই কথাই এই ভাবে সত্য,” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার বলিতেছেন “এই যে ইচ্ছা করিয়া কিছু করিনা ইহাও সেই মহতী ইচ্ছার। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া কোন কথাই নাই। তোমরা ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যে আছ

তাই ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রকাশ মাত্র। কি বলিলে যে ঠিক হয় বাস্। কার্যাদি যে দেখ তোমরা ভাবিওনা যে অপর একটা শক্তি আসিয়া করিয়া যাইতেছে। সে দিন যে তোমরা ভাবাবেশ ভাবাবেশ বলিয়া কি সর বলিলে এই শরীরে নিত্য নূতন করিয়া আবেশ ভাবিও না, ইহাতে যাহা কিছু দেখ ইহা স্বভাব। যেমন কথা বলা, হাসি ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব ইহাও ঠিক সেই রকম আর কি? আবার ভাব অভাব বলিয়া কোন কথাই নাই।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মার এই ভাবের একটু আভাব পাইয়াই ডাক্তার পাস্ত মার অসুখের সময় বলিয়াছিলেন “মা আমি আজ গঙ্গা মার নিকট প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি যে আপনার আরোগ্য হইবার ইচ্ছা জাগ্রত হউক।”

খাওয়ার পর আমরা সকলে বসিয়া আছি মা ছোট বেলার গল্প করিতে করিতে বলিতেছেন “একবার এক আত্মীয় আমাকে পায়ের একটা রূপার গহনা দিয়াছিল আমি পুকুরে গিয়া তাহা খুলিয়া পাড়ে রাখিয়া ছিলাম, তথায় যে দাড়াইয়াছিল তাহাকেও আমি চিনি, আমি উহা ওখানেই ফেলিয়া চলিয়া আসি, বাড়ী গেলে মা ঐ গহনা আনিবার জন্ত আমাকে আবার পুকুরে পাঠাইয়া দিলেন, গিয়া দেখি সেখানে তাহা নাই আমি বাড়ি আসিয়া মাকে বলিলাম “মা, একজনে পায় দিবার জন্ত নিয়া গিয়াছে।”

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম “ছোট বেলা হইতেই ত এক রকম বুদ্ধিই চলিতেছে এখনও কেহ কাপড় দিলে মা বলেন “আমার কাপড় আমি নিয়া গিয়াছি, তোমরা আমাকে দিয়াছ মনে করিয়াছ বুঝি ? আবার নিজের কাপড় যখন কাহাকেও দিয়া দেন তখনও বলেন যার কাপড় সে পরিবার জন্ত নিয়া গিয়াছে “এই বলিয়া হাসিতে থাকেন।” আবার বলিতেছেন “আচ্ছা দেখ, যিনি একবার সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছেন অর্থাৎ যাহার সমাধি অবস্থা পাকা হইয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে আবার এই ভাবে বলা হয় কেন যে “তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন ?” এই কথার মীমাংসা এখন হইলনা। আমরা মার কথাগুলি যথাসাধ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছি শুনিয়া মা হাসিয়া বলিতেছেন “এ সব লিখিয়া কি হইবে ? কত মহাত্মা কত লিখিয়া গিয়াছেন, ভগবান তোমাদের কত ভাবে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে বুঝি হইলনা। ইহাও ত সেই রকমই একটা হইবে নূতন আর কি করিবে ? নূতন কিছুই নাই। সবই যে পুরাতন।” এই বলিয়া শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন।

বৈকাল বেলা প্রতিদিনের মতই আশ্রমের সামনে একটু হাটিতেছেন সকলে চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়াও যেন কাহারও তৃপ্তি হইতেছে না। সন্ধ্যার সময় বারান্দায় বসিলেন। অগাধ কয়েকজন দর্শনার্থীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় ৯টা অবধি মা বারান্দায়ই

বসিয়া রহিলেন। নামঘরে সন্ধ্যার কীর্তনাদি হইয়া গেল।
 মাকে ভোগ দিবার জন্য উঠাইয়া আনিলাম। একটু তরকারী
 সিদ্ধ ও রুটি খাওয়াইয়া দিলাম। সেই আসনে বসিয়া মা
 ছোটবেলার দুই চারিটা গল্প করিতেছেন আমি, দিদিমা, ভূপতি-
 দাদা, একটি ব্রহ্মচারী (নিগমানন্দ স্বামীর একটি শিষ্য কয়েক
 দিন হয় মায়ের কাছে আসিয়াছেন) যতীশবাবু সপরিবারে
 মার চারিদিকে বসিয়া মার মধুর হাসি ও কথা শুনিতেছেন।
 কথায় কথায় মা বলিতেছেন “আমি যখন ছোটবেলায়
 আমার বাড়ী যাইতাম সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের বেড়াইতে
 যাইবার সময় ছিল এই তোমার সুশীলা মাসীমা সঙ্গেই
 থাকিত “এই বলিয়া মাসিমাকে দেখাইয়া দিলেন। তারপর
 হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন “একটা কথা বলিতেছি
 শোন, আমার খেয়াল হইতেছে কি করব বল !” এই
 বলিতেছেন “সন্ধ্যা বেলায় বা সকাল বেলায় যখন বেড়াইতে
 বাহির হইতাম সেই সময়েই ত গুরুগুনি বাহির হইবার
 ও বাড়ী ফিরিবার সময়, তা ত আর আমাদের খেয়াল
 হইত না, কি কাণ্ড শোন গুরুগুনি আমার দিকেই আসিত,
 আসিয়া কোন কোনটা আমার গা চাটিত একদিকে জঙ্গল
 একদিকে জলাশয় সরু রাস্তা আমি কোনদিকে যাইতে পারিতাম
 না, শিশুরা যেমন করে “গরু আসিল, গরু আসিল,” বলিয়া
 চিৎকারও করিতাম কিন্তু দাঁড়াইয়াও থাকিতাম দূর হইতে
 এরা (সুশীলা মাসিমাকে দেখাইয়া) সকলে দাঁড়াইয়া হাসিত

ইহারাও ছোট ত ঐ দিকে বুড়া মানুষ কেহই প্রায় থাকিত না এই কাণ্ড আর কি ?” বলিয়া হাসিয়া আকুল। শিশুর মত সরল সুন্দর হাসি মুকু হইয়া আমরা এই কথা শুনিলাম। যতীশ বাবুর স্ত্রী (জামসেদপুরের ডাক্তার) বলিলেন “কেউঠাকুরের লীলা হইত বুঝি মা।” মা আবার ব্যস্ত সমস্তের ভাব দেখাইয়া বলিলেন “এ সব কথা বলিতে নাই। ঠাকুর দেবতার কথা এ ভাবে বলিতে আছে ?” মুখে মধুর হাসি সবই অপরূপ। ১০-টায় মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথকে মা শুইবার পূর্বে দেখিতে গেলেন তখন ভোলানাথ বলিতেছেন “দেখ তুমি যে আমাকে ঢাকায় বড় অস্থুখের সময় একবার চিড়া ভিজা খাওয়াইয়া ঠাণ্ডা করিয়াছিলে সেইরকম খাওয়াইলে বোধ হয় আমি এবারও ঠাণ্ডা হইব।” এই বলিয়া মার দিকে কাতর ভাবে চাহিলেন। ছর, হাম ও বমিতে বমিতে তিনি চার পাঁচ দিনেই ভয়ানক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। মা বলিলেন “আচ্ছা তাই হইবে” তখনই চিড়া ভিজাইয়া রাখা হইল পর দিন দেওয়া হইবে।

১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার :—

আজও মা প্রায় ৮টায় উঠিয়া বসিলেন, মুখ হাত ধোয়াইয়া মাকে একটু জল খাওয়াইয়া বসাইয়াছি এর মধ্যে ভূপতি দাদা আসিয়া খবর দিলেন দুই তিনটা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মাকে দর্শন করিতে চান। আমরা মার আসন বারান্দায় দিলাম। মা গিয়া বসিতেই সকলে মাকে প্রণাম করিলেন। একটা ভদ্রলোক

মার পরিচিত তিনি বলিতেছেন “মা আমার সঙ্গীয় এই লোকটী আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে “ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন যখন কিছুই হইতে পারে না তখন পাপ পুণ্যে ফল ভোগ আমি করি কেন?” আমি বলিয়াছি মাতাজী তোমার এই প্রশ্নের মিমাংসা করিয়া দিবেন তাই আপনার কাছে নিয়া আসিয়াছি।” মা হাসিয়া বলিলেন “ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না এ— বিশ্বাস তোমার স্থির ভাবে আছে ত?” তিনি বলিলেন “হঁ” মা বলিলেন ‘তবে ত পিতাজীর পাপ পুণ্যের প্রশ্নই নাই। তোমার যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসিয়াছে তখন আমি বলিব তোমার এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস নাই।’ তখন সেই লোকটী মার কথার অনুমোদন করিলেন। তখন মা বলিলেন “বিশ্বাস চিরদিনই অন্ধ। প্রত্যক্ষ হইল কি? না যেমন আমি তোমাকে দেখিতেছি তুমি আমাকে দেখিতেছ। প্রথমে অন্ধ বিশ্বাস করিয়াই এই প্রত্যক্ষে যাইতে হয়। পড়া চাই পিতাজী, পড়া কি? বাহিরের পুস্তক পড়িবার কথা আমি বলি নাই বাহিরের পুস্তক পড়িলে যেমন বাহিরের বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায় মুর্থ শিশুও পণ্ডিত বিদ্বান হইয়া ওঠে তেমনই সকলের ভিতরই একখানা করিয়া বই আছে তাহা পড়িবার চেষ্টা কর তাহা পড়িলেই আর কোন বিষয়ে সংশয় আসিবে না, প্রশ্ন থাকিবে না, এখন যে বিষয় প্রশ্ন করিতেছ এই বিষয় তখন নিজেই বুঝিতে পারিবা।” আজ ভোলানাথকে কাল যে চিড়া ভিজান হইয়াছিল তাহা দিয়া সরবত করিয়া দেওয়া হইল। মা খাওয়াইবার সময় সেই ঘরের

ভিতরই দাঁড়াইয়া ছিলেন। হাটিতে হাটিতে মধ্যে মধ্যে ঐ ঘরে যাইতেন। খাওয়াইবার সময়ও মা হাটিতে হাটিতে ঐ ঘরে গিয়াছিলেন, খাওয়াইবার পর মা বলিলেন “এখন ঘরে বেশী লোক থাকিও না” রোগীকে বলিলেন “চুপ করিয়া এখন শুইয়া থাকত ?” এই বলিয়া হাটিতে হাটিতে আবার বারান্দায় চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় কীর্তনাদি হইল।

১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার :—

আজ শ্রীযুক্তা সংজ্ঞাদেবী মার ভোগের সব জিনিষ নিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ মার ভোগ দিবেন। ভোলানাথের বমির ভাব অনেকটা কম। তবে হাম খুব উঠিয়াছে। মা আজ সকালেই উঠিয়াছেন। গতবার মা যখন এখানে ছিলেন তখন সকলেই সন্ধ্যায় ও সকালে নাম ঘরে যাইয়া ধ্যান, কীর্তন ও জপাদি করিতেন, গতকাল সেই কথা মা বলিলেন। আজ সকাল বেলা আমি সকলকে ডাকিয়া ভোর ৬টার নাম ঘরে বসিলাম, আধঘণ্টা সকলেই স্থির ভাবে তাঁর চিন্তা করিলাম। যাঁহার ইচ্ছা তিনি আরও বেশী সময় থাকিবেন। আমরা নাম ঘর হইতে উঠিবার পূর্বেই মা উঠিয়া বারান্দায় গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা উঠিয়া আসিলাম কেহ কেহ বসিয়া রহিলেন। মা উঠিয়াছেন জানিয়াই আমি উঠিয়া আসিলাম, মার মুখ খোয়াইয়া দিব এই চিন্তায় আমাকে আর বসিতে দিল না। আমার এই রকমই স্বভাব। মার একটুখানি সেবায় আমি যে আনন্দ পাই ধ্যান জপে আমার

সেই আনন্দ হয় না। অবশ্য বেশ বুঝি এই ধ্যান জপই মার বড় সেবা তাহাতেই মার শরীর বিশেষভাবে পুষ্ট হয় কিন্তু সকলে সব কাজের উপযুক্ত ত হয় না, এক একজনের এক এক রকমের সংস্কার।

ভোলানাথের অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল সমস্ত শরীর ও মুখ ফুলিয়া গিয়াছে। যন্ত্রনায় দিন রাত্রি ঘুম নাই। সকলেরই মন খারাপ। মা মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসেন। বৈকালেই মার দর্শনার্থী সকলে আসেন। শ্রীযুক্ত কনি-ভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এল এল, বি, এল, টি (প্রফেসর ছিলেন) মহাশয় রোজই বৈকালে আসেন কখনও কখনও নানা কথা হয়। আবার কোন কোন দিন বিশেষ কোন কথাই হয় না। রহস্যময়ী মা কখনও কখনও কত রহস্যই করেন। কখনও আবার স্থির, ধীর ও গম্ভীর। কাছে গিয়া কথা বলিতেও আমাদের সাহস হয় না আবার এক এক সময় এমন হাস্য কৌতুক করেন যে অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক বা নূতন যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের কাহারও কোন সঙ্কেচ থাকেনা সকলেই যেন মার কাছে তখনকার মত কেমন হইয়া যায়। এবার কুস্তের মেলায় হরিদ্বারে। শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ সেন মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী মার কাছে আসিয়াছেন। একদিন রাত্রিতে মা নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন ঘরে অনেক লোক বসিয়া আছেন এর মধ্যে বিনয় দাঁদার স্ত্রী একখানি থানায় করিয়া কিছু

মিষ্টি ও ফল মার জন্তু নিয়া আসিলেন আজ তাঁহার স্বামী স্ত্রী উপবাস করিয়াছেন এই প্রসাদ হইলে আহার করিবেন। খালাখানা মার বিছানার নিকটে ছোট একটি টুলের উপর রাখিয়া তিনি জলের গ্লাশ আনিতে চলিয়া যাওয়া মাত্রই, মা বিনয় দাদাকে বলিতেছেন “দেও ত তুমি একটু কিছু আমার মুখে, তারপর খালাখানা সরাইয়া নিয়া যাও, দেখি মা আসিয়া কি বলে?” হাসি হাসি মুখে এমন ব্যস্ততার সহিত মা এই কথা গুলি বলিলেন যে বিনয় দাদা আর কিছু চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না তখনই উঠিয়া গিয়া তাহাই করিলেন একটু সন্দেশ উঠাইয়া মার মুখে দিতেই মা বলিলেন “আর কিছু নয় এখন শীঘ্র শীঘ্র খালাখানা সরাইয়া ফেল মা আসিয়া পড়িবো।” এতব্যস্ত ভাব যেন একটি বালিকা দুর্ভাগ্যী করিবার একটা অবসর পাইয়াছে। খালাখানা উঠাইয়া নিয়া যাওয়ার পরই বিনয় দাদার স্ত্রী ঘরে ঢুকিতেই মা বলিলেন “হইয়া গিয়াছে এখন জল দাও” বিনয় দাদার স্ত্রীও এই ব্যাপারে কেমন হইয়া পড়িলেন, তিনিও এদিক ওদিক ভাবিবার অবকাশ পাইলেন না মাকে জল খাওয়াইতে গ্লাশটা মার মুখের নিকট নিয়া গেলেন। গ্লাশটা মুখের কাছে ধরিতেই মার মুখের মুহূর্ত্ত হাসিতে তিনি মুগ্ধ হইয়া মাকে না জড়াইয়া ধরিয়া পারিলেন না। সকলের দিকে পিছন দিয়া দাঁড়াইয়া তিনি যেই মার মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়া আদর করিবেন

অগ্নি মা নিজের মুখের ভিতর যে সন্দেশ রাখিয়া দিয়া ছিলেন তাহা তাহার ঠোঁটে লাগাইয়া দিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন আর বলিতে লাগিলেন “দেখ দেখ ওর ঠোঁটে সন্দেশ ? তুমি সন্দেশ খাইতেছ নাকি ?” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন “এই দেখ ওর মুখে সন্দেশ” আর তার মুখ খানা ধরিয়া ধরিয়া সকলকে দেখাইতে লাগিলেন। মার এই ব্যাপারে সকলেই উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। এই রকম কত কাণ্ডই না মা করিতেছেন।

আজ কথায় কথায় মা বলিতেছেন ছোট বেলায় ভাস্করের বাসায় যখন ছিলেন তখন ভাস্করপো আশুকে তার বাবা বলিলেন “কাকীমার লেখা সুন্দর তুই কাকীমার কাছে গিয়া লিখা শিখিস্ মা আশুকে ক, খ, লিখা শিখাইতেন ইচ্ছা শক্তিতেই যে ক্রিয়া হয় সে কথায় বলিতেছেন “আশুকে লিখা শিখাইতেছি হঠাৎ একবার কি খেয়াল হইল লিখিয়া দিয়া বলিলাম “এই ভাবে লিখত” তার লিখিবার দিকে খেয়ালটা গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় শিশুছেলে অবিকল আমার লিখার মত লিখিয়া ফেলিল। প্রতি দিনই সে তাহার বাবাকে নিজের লেখা শ্লেটে দেখাইত আজও দেখাইয়াছে। বাবা সেই লেখা দেখিয়া বলিতেছেন “ইহা বুঝি তোর কাকীমার লেখা ?” আশু বলিল “না বাবা, আমিই লিখিয়াছি” কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেছেন না, অবিকল আমার অঙ্কর।

পরে কিন্তু আর সেই রকম নিধিতে পারিল না। তার বাবা তাহাকে লিখাইতে বসাইলেন কিন্তু আর পারিল না। খেয়ানটাই হইলে এমনই কাজ হইয়া যাইত। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

১৭ই বৈশাখ শনিবার :—

আজ দুপুর বেলা কথায় কথায় গুরুর কথা উঠিয়াছে। মার শরীর ভাল নয় মা ঘরে শুইয়া আছেন আমি কাছে বসিয়া আছি আর কেহ ঘরে নাই। মা বলিতেছেন সদগুরু সদগুরু কথা হয় গুরু কি আবার অসৎ হয়? গুরু মাত্রেই সদগুরু। দেখ জগদ গুরুই ত গুরু, এক ঈশ্বরই গুরু কুলগুরু সেখানে হইলেন কুলেরদেবতা সেখানে কুল মিলে। অকুলের প্রশ্ন থাকে না তাঁহারই কুলই ত কুল কি বল? তাঁর ত কোন বিচার করিতে পারনা, তারপর স্বভাবে যিনি স্থিত তিনি সদগুরু আবার যিনি স্বভাবে স্থিত হইতে যাইতেছেন তিনিও সদগুরু। কারণ যিনি বি, এ, বা এম, এ, পড়েন তিনি তার চেয়ে নীচের ক্লাশের ছেলেদের পড়াইলে তাহাদের বি, এ, এম, এ, ক্লাশে যাইবার সহায়ক হন এই হিসাবে তিনিও সদগুরু। আবার যাহার নিকট হইতে বতটুকুই হউক সংশিক্ষা পাইতেছে তিনি ও গুরু। স্বরূপ পাওয়ার যিনি সহায়ক হন, তিনিই সংগুরু। তারপর নানা কথা উঠিল। ব্রহ্ম সমুদ্র, তদঙ্গ হইল জীব সত্ত্ব সাকার নিগুণ নিরাকার ইত্যাদি ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিলাম

“মা, কে এ তরঙ্গের সৃষ্টি করিল?” মা উত্তর দিলেন “ইহা যে তাঁহার স্বভাব কারণ সগুণ ও সাকার কথাটা আছে কিনা? আবার নিগুণ নিরাকার বলে কেন? না যাহার আকার, গুণ তুমি ভাষাতে ব্যক্ত করিতে পারিতেছ না। যেমন একটি ফুল দেখিয়া তাহা কেমন সুন্দর বা একটি রসগোল্লা খাইয়া তাহার ক্রিপ স্বাদ তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছ না যে দেখবে, যে খাবে সেই ত জানে। কতকটা ভাষায় বলিলে (ভাষায় যেটুকু বলিলে তাহাই স্বভাবের গুণ প্রকাশ হইল) আর কতকটা অব্যক্তই রহিয়া গেল কোন আকারেই তাহা ভাসাইতে পারিলে না। ইহা যার যার বুঝিবার, ইহা যে ভাসে না। তবে এর মধ্যে একটা কথা রহিল নিরাকার আর সাকার, ইহাও একটা ভাষা রহিল কি না, তাই এ সবেই পার হওয়া চাই যে। আবার যাওয়া আসা কাহারও দেখা দেখির কথা থাকিলে চলিবে না কিন্তু। স্বয়ম প্রকাশ কি না তাই যত টুকু প্রকাশ হইতে পারে স্বভাবে প্রকাশ হওয়া চাই। আবার দেখ সমুদ্রের উপরেই তরঙ্গ ভিতর খীর স্থির গম্ভীর। তোমরা বল ভিতরে কারেন্ট আছে, তা থাকুক তাহাতে ত টুকরা হইতেছে না কাজেই তার ভিতরেও স্থিরত্ব অখণ্ডত্ব ও গম্ভীরত্ব থাকিয়াই যায়।” তারপর আবার বলিতেছেন “দেখ এ সব কথা যত ভাবেই বলা যায় আসল কথা যেন কিছুই বলা হয় না।”

অমূল্য দাদার বইয়ের ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের কথা উঠিল আমি বলিলাম “আচ্ছা মা, ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের উপায়

কি?" মা বলিলেন “ভগবান লাভের চেষ্টা করিতে যাইয়া যে তাপ সহন করিতে হয় সেই তাপ সহন দ্বারাই ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। যেমন দেখনা যজ্ঞ করিতে যাইয়া আগুনের তাপ সহন করিতেছ আবার সেই অগ্নিতে সব আহুতি দিতেছ। জপ করিতে বসিলে জপ করিতে ইচ্ছা করে না অধৈর্যসত্ত্বেও যে চেষ্টা করিবে সেই হইল তাপ সহন করা, আবার উদয়াস্ত কি অর্কপ্রহর নাম যজ্ঞ করিবে সঙ্কল্প করিয়া নাম আরম্ভ করিয়াছ নাম যজ্ঞে কি করিতেছ? না, বাজে চিন্তা, বাজে কথা নাম রূপ যজ্ঞে আহুতি দিতেছ। অসহনীয় হইলেও সঙ্কল্প রক্ষার জন্ত তাপের মত সহ্য করিয়াও নাম চালাইয়া যাইতেছ। নামের আনন্দ আর সাধারণ লোকের কতটুকু সময় থাকে? কাজেই বলি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত যে তাপ সহন করা হয় তাহাতেই ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণের সহায়ক হয়। তাহাকেই তপশ্চা বলে। আবার দেখ আগুনে যেমন জল শুষ্ক করিয়া দিতে পারে, জল যেমন শীতল করিয়া দিতে পারে সেই রকম একবার যদি তাঁর তাপ বা প্রতাপ নিতে পার তবেই ত ত্রিতাপের শান্তি। তাঁকে পাইবার জন্ত যে অস্থিরতা বা মনের চঞ্চলতা ইহাই হইল তাঁকে পাওয়ার পথের সহায়ক। চঞ্চল মন নিয়া তাঁহার পূজা তাঁর নাম জপ এ চিন্তায় কি ফল হইবে? ইহা ভাব কেন? তাঁর জন্ত অশান্তি না হইলে শান্তি হয় না। “আবার বলিতেছেন” এই যে সংসারে যে তাপ মনে করা হয়

তাহাও কিন্তু তপস্শা। যেমন রৌদ্র, রুষ্টির মধ্যেও ছেলেরা পড়িবার জন্য স্কুল কলেজ যাইতেছে, চাকুরী করিতে যাইতেছে “এই সবই তপস্শা, যদি ভগবানের দিকে লক্ষ্য থাকে।” আবার বলিতেছেন “লক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক এক রকমে উহাও কিন্তু তপস্শা হইয়া যাইতেছে কারণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব সময়ই হয় কিনা।” এই বলিয়া হাসিয়া বলিতেছেন “আমারত আবোল তাবোল কথা। তপস্শা শব্দের অর্থ তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তোমরা জান।” আবার কথায় কথায় বলিতেছেন “অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে জাগতিক কর্মাদি করা হয় তাহাতে নূতন কর্মের সৃষ্টি হয় না। কারণ ইহা সঞ্চিত কর্মের ফল হয় কিনা। বাসনাতেইত কর্মের সৃষ্টি। ভগবান লাভের বাসনাকে বন্ধনের কারণ বলনা। জাগতিক কর্মের অনিচ্ছার ভিতর যদি ভগবৎ প্রাপ্তি কর্তব্য ইচ্ছা থাকে তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। কাজেই ভগবৎ কর্মের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন। যেমন বলা হয় নিজের স্বরূপ দেখিবার জন্য গায়ের ময়লা ধুইতে গায় সাবান মাখা হয় সাবানও ত ময়লাই তাহাও না ধুইলে ত নিজের স্বরূপ দেখা হয় না। আবার দেখ এর মধ্যেও জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি আছে যেমন সাবান গায় লাগাইলেও শুধু হইবে না তাহা দিয়া ষথিতে হইবে তারপর জল দিয়া ধুইতে হইবে। তবেই না স্বরূপ দেখিতে পাইবে। সেখানে কিসে ধোয় জান? জ্ঞান গঙ্গায় ধুইয়া নেয়। “আবার কথায় কথায় বলিতেছেন” দেখ তোমার ভিতরেই সব আছে সে বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়।

আনন্দ ও শান্তি চাহিতেছ তাহা আবার স্থায়ী আনন্দ না হইলে তোমার তৃপ্তি হইতেছে না আজ হয় ত একটা জিনিষ নূতন দেখিয়া তোমার কত আনন্দ হইতেছে আবার পরক্ষণেই আর সেই জিনিষ তোমাকে সে আনন্দ দিতেছেন। এই ভাবেই সাধক মন চাহিতেছে স্থায়ী আনন্দ। আর দেখ, স্থায়ী আনন্দের স্বাদ যে তুমি জান তাই তাহাই তুমি চাহিতেছ। তাই বলি তোমার ভিতরই সব আছে, তোমাদের বাহির ভিতর আছে কিনা, তাই ভিতর বলা হয়। আবার দেখ এই যে বলা হয় এই শরীরটা যাহা দেখে তদভাবাপন্ন হইয়া যায়। ভাবিয়া দেখ সকলের মধ্যেই কিন্তু তাহা কিছু কিছু প্রকাশ পায়। যেমন দেখ কেহ ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতে বসিয়াছে গ্রাস মুখে দিবার সময় তাহারও মুখ খুলিয়া যাইতেছে। একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া তোমারও চক্ষে জল আসিল একজনের হাসি দেখিয়া তোমারও হাসি পাইল একজনের রোগ দেখিতে দেখিতে তোমারও শরীরটা অসুস্থ বোধ হয়। তবেই দেখ যাহা সামনে আসিতেছে তোমরাও কতকটা তদভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছ। হবেনা কেন? ভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে সাধক তদভাবাপন্ন হইয়া যায়। কাজেই বলা হয় তোমরা নিজেকে জানিতে চেষ্টা কর তবে সব জানিতে পারিবে।

সন্ধ্যার পরই আজ মা শুইয়া আছেন। আবার জ্বর জ্বর হইয়াছে। আমি মার কাছে বসিয়া আছি ঘরে আর

কেহ নাই মা বলিতেছেন “দেখ, শীতকালে মাথা ঠাণ্ডা হইয়া বাহিত আবার এমন গরম পড়িতেই প্রকৃতির ক্রিয়া কেমন চলিতেছে। প্রকৃতিও যেন নানারূপে পূর্ণ ভাবে নিজকে নিয়াই নিজে খেলা করে। রোগগুলিও যেমন শরীরটার মধ্যে খেলা করিতেছে সেই রকম আর কি। যখন যাহা হইবে তাহাই যেন পূর্ণ ভাবে হয়।” এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ভোলানাথের অবস্থা ভয়ঙ্কর, দেখিলে ভয় হয়। সমস্ত সুখ চোখ শরীর ফুলিয়া গিয়াছে। সর্বদাই প্রায় রোগের বদ্বণায় কষ্ট প্রকাশ করিতেছেন। কি হইবে জানি না। মাকে মাঝে মাঝে বলি “মা, আরত দেখা যায় না, কি আরম্ভ করিলে?” মা স্থির ভাবে হাসিয়া উত্তর দেন “বাঃ রোগ হইলে রোগের মূর্তি দেখিবে না? যার যে ভোগ তাহা যে হইবেই।” নির্বিকার ভাবে জবাব দেন। আমরা ইহা ধারণাও করিতে পারি না। রাত্রি হইল ধীরে ধীরে সকলেই বিশ্রাম করিতে গেলেন। ভোলানাথের ঘরে শুশ্রূষা করিতে দুই তিন জন রহিয়া গেল।

১৮ই বৈশাখ রবিবারঃ—

আজ মা প্রায় বেলা ১০টার উঠিলেন। ভোলানাথের অবস্থা ভাল নয়। অভয় রায়পুর চলিয়া গিয়াছে। ৩নিগমানন্দ স্বামী এবং ৩শান্তদাস বাবাজীর দুইজন শিষ্য এখানে আছেন সাধনের সুবিধার জন্ত মা আজ তাহাদের দুইজনকেও রায়পুর পাঠাইয়া দিলেন। বিশু ব্রহ্মচারী তথায় আছেন। একটি

ঘরে মার জন্তু সে আসন পাতিয়া রাখিয়াছে সেই ঘরেই সে
খ্যান জপাদি করে।

মা নিজেই বলিতেছেন “ভোলানাথের হাম নয় তোমরা
ভাল করিয়া দেখ।” এই বলিয়া নিজেই ডাক্তারদের
দেখাইতেছেন। বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন “আমি বলি
সব রকম মিলিয়াই উঠিয়াছে। অবস্থা ভাল নয়।” ডাক্তার-
রাও একথার অনুমোদন করিয়া বলিলেন “সব কথা ত বলা
যায় না মা।” মা বলিলেন “দেখ রোগের মূর্তিগুলি সব চোখে
ভাসিয়া ওঠে কি না তাই তোমরা যখন হাম বলিতেছ তখন
আমার ঠিক বলিয়া খেয়াল হয় না। কি হইবে না হইবে
সবই যেমন কখনও বাহির হইতে ডাকিয়া তোমরা একটা
কথা বল, আবার কখনও কখনও সাম্নে বসিয়াই বলিয়া যাও
এই এই হইবে।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ফণী-
বাবু প্রফেসার আসিয়া বসিয়াছেন। তিনি একথা শুনিয়া
বলিলেন “আচ্ছা মা এসব রোধ করা যায় না?” মা বলিলেন
“হাঁ, তাহাও হয়। কেমন জান? ভোলানাথকে দিয়াই
একটা উপমা দিতেছি। এক সময় দেখা গেল কি জান একটা
যেন জলাশয় তাহাতে ভোলানাথ ডুবিতে ডুবিতে একেবারে
ডুবিয়া গেল একটুখানি জটীর অংশ মাত্র দেখা যাইতেছে
তখন খেয়াল হইল কি জান? ডুবিতে দেওয়া হইবে না এই
বলিয়া আবার দৃষ্টিটা সেই জটীর দিকে যাইয়া স্থির হইল।
জানিতেছি একটু যদি অণুদিকে দৃষ্টি যায় তখনই জটা ডুবিয়া

যাইবে, কিন্তু দৃষ্টি এদিক ওদিক হইতেছে না একেবারে স্থির দৃষ্টি সেই জটীর দিকে। দেখিতে দেখিতে ভোলানাথ উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন যেন স্নান করিয়া আসিলেন। তারপরই খুব অসুখ হয়। ধীরে ধীরে ভাল হইয়া ওঠেন। তারপর সেই অসুখে থাকিতে থাকিতেই আমি এখানে ভোলানাথকে রাখিয়া সোলেন চলিয়া গেলাম। জটীর অংশ যেটুকু দৃষ্টির মধ্যে ছিল সেইটুকু শেষে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তবে ইহাও ঠিকই যে যাহা রোধ হইবার তাহাই রোধ হয়।” আবার খেয়াল হইলে সবই হয়। এই বলিয়া চুপ করিলেন।

আজ দুপুরবেলাও মা শুইয়া আছেন আমি কাছে বসিয়া আছি, কথায় কথায় উঠিল শাস্ত্র, মা বলিলেন “শাস্ত্র ত স্ব অস্ত্র যেমন স্বভাবে স্থির হইবার জন্য যে যে কর্তব্য করা যায় তার মধ্যে যে এক লক্ষ্য থাকে আত্ম চিন্তা, সেই যে একধারা অন্তরুপী চিন্তা সেই অস্ত্র দ্বারাই খণ্ড খণ্ড সংস্কার হইতে মুক্ত করে। তাই শাস্ত্রকে আমার আবোল তাবোল ভাবায় স্বতন্ত্র বলি তোমরা যাই অর্থ করুণা কেন?”

আবার কি কথায় বলিতেছেন “দেখ পাথর ভাব থাকিলে যেমন শিব ভাব জাগে না আর শিব ভাব জাগিলে যেমন পাথর ভাব থাকে না সেইরূপ গুরু বখন বলিব তখন মনুষ্য ভাব থাকিলে চলিবে না কারণ একটা চিন্তা করাই মানুষের স্বাভাবিক কি না? জীবের ভিতরে একের আভাষটাও দেখ কি সুন্দর।”

আবার কথা উঠিয়াছে ধরে ধরে সকলে লক্ষ্মীপূজা করে সরস্বতী পূজা করে (অমূল্য দাদার বইয়ের ২০৮ পৃষ্ঠা পড়িয়াই একথা উঠিয়াছিল) মা বলিতেছেন “মা লক্ষ্মীদের লক্ষ্মী পূজায় জাগতিক ভাবে ধনের উপকারিতা আছে সেইরূপ ছেলেদের সরস্বতী পূজায়ও অর্থকারী বিজ্ঞান উপকারিতা আছে বই কি ? তবে যে ধনে ধনী হইলে চিরধনী এবং যে বিছানাভ করিলে চির নিরুত্তি সেই কথা হইয়া হইয়াছিল। তাই মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী পূজার কথা হইয়াছিল।

প্রকৃতি ও পুরুষের কথা উঠিয়াছে মা বলিতেছেন “পুরুষ না থাকিলে প্রকৃতি খেলিবে কাহার মধ্যে ? তবে তুমি ও তোমার প্রকৃতি যেমন অভিন্ন (যেমন বলা হয় তোমার প্রকৃতি বা স্বভাবই এইরূপ) সেইরকম। পুরুষ না থাকিলে প্রকৃতি নাই প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষ নাই। প্রকৃতি হইল ক্রিয়াশীল, আর পুরুষ হইল নিত্য নির্বিবকার।”

১৯শে বৈশাখ, সোমবার :—

আজ বৈকালে কথায় কথায় শ্রীমতী কমলা নেহেরুর কথা উঠিয়াছে। শুনিলাম কমলা নেহেরুর প্রথম দেৱাচুন কাশীবাবুর বাসায় আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার কথা শুনিয়া ৬পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্ত্রী মাকে দেখিতে চাহিলেন, মা তখন আনন্দচকে ছিলেন। এক দিন ৬কমলা নেহেরুই তাঁহার শ্বাশুরীকে মার নিকট মন্দিরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যান। মার সঙ্গে দেখা করেন না। তারপর একদিন

ফল ফুল ইত্যাদি নিয়া ৬কমলা নেহেরু ও তাঁর শাশুড়ী মার কাছে আসেন। মার কাছে আসিয়াই নাকি তিনি এক দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া থাকেন ও কিছু পরেই শুইয়া পড়েন, তাঁর শরীর কাঁপিতে থাকে তিনি আর কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এর পর হইতেই কমলা নেহেরু রোজই প্রায় মার কাছে যান মাকে ফল মিষ্ট ইত্যাদি নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিতেন। আর মাকে দেখিলেই তাঁর ঐরূপ একটা নেশার মত অবস্থা হইত। তিনি বলিয়াছেন মাকে তিনি কৃষ্ণ মূর্তিতে দেখিতেন। এর পর এমনও হইয়াছে যে রাত্রি ১২টা অবধি মার কাছে লোকে থাকে বলিয়া তিনি রাত্রি ১২টার পর নিজের দুই একখানা কম্বল ও টর্চটী নিয়া মার কাছে আসিয়া মার বিছানার কাছে প্রায় মার কোলের কাছে নিজের কম্বলটী বিছাইয়া শুইয়া পড়িতেন আবার ভোর বেলা সকলে আসিবার পূর্বেই চলিয়া যাইতেন। কখনও কখনও কথায় কথায় রাত্রি কাটিয়া যাইত। মার উপর তাঁহার একটা খুব ভক্তি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কখনও কখনও মাকে দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহার যখন ঐরকম একটা অসাড় অবস্থা হইত তখন হয়ত রূপ্তি আসিয়া তাঁহার শরীর ভিজাইয়া দিত তাঁহার খেয়াল নাই উপস্থিত সকলে কাপড় টানাইয়া তাঁহার শরীর বাহাতে ভিজিতে না পারে তাহার চেষ্টা করিত। এরপর তিনি অশ্বিকা মন্দিরে যাইয়া মাকে নিয়া যজ্ঞাদি করেন সেই সব খবর পূর্বেই লিখা

হইয়াছে। তারপর তাঁহার অস্থখ বাড়ে, তিনি ভাওয়ালি গিয়া থাকেন তখন মা একবার আলমোড়া যান মাকে দর্শন করিবার জন্ত কমলা নেহেরু খুব ব্যস্ত হন তাই মা যাওয়ার পথে তাঁহাকে দেখিয়া যান তখনও তিনি মাকে দেখিয়া কাঁদিতে থাকেন ও তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। যা যখন আবার আলমোড়া হইতে ফিরিয়া আসেন তখনও তাঁর প্রার্থনায় মা তাঁহাকে দেখা দিয়া আসিয়াছিলেন তিনি তখন মাকে বলিয়াছিলেন “মা, তোমাকে দেখিলে আমার ঐরূপ অবস্থা হয় বলিয়া আজ আমার নাগ’ আমাকে তোমার সহিত দেখা করিতে নিবেদন করিয়াছিল কিন্তু আমি বলিয়াছি “দেখা না করিলে আমার শরীর আরও খারাপ হইবে তাই রাজি হইয়াছে।” মাকে দেখিবার জন্ত তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে মা তথায় পৌঁছাইবার পূর্বেই তিনি নারান্দায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। মাকে নিয়া দেয়াতন তিনি অনেক সময় একান্ত স্থানে মোটরে বেড়াইতেন, এবং নির্জন স্থানে মোটরে বেড়াইতেন এবং নির্জন স্থানে হাটিয়া হাটিয়া মার সহিত বেড়াইতেন এবং সেই সময় ঐরূপ ভাবাবস্থায় তিনি অনেক সময় জঙ্গলের মধ্যে মার কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মাকে বলিতেন “জগতের মধ্যে তুমিই এখন আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়” যা যখন জিজ্ঞাসা করিতেন জাগতিক হিসাবে কে বেশী প্রিয় “তখন বলিতেন” জাগতিক হিসাবে স্বামীই আমার সব চেয়ে প্রিয়।” যত দিন জীবিত

ছিলেন মাকে পত্র দিতেন নিজের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা মাকে জানাইতেন। অসময়ে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া গেল ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি নাকি ইহাও মাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, “মা তুমি যদি আদেশ কর তবে আমি গিয়া মহাত্মাকে বলি যে আমার দ্বারা এসব কাজ চলিবে না।” মা বলিলেন “না, তুমি এখন মহাত্মাজীকে কিছু বলিও না যাহা তোমার পক্ষে দরকার হইয়া যাইবে।”

আজ বিকালেই লছমী রাণীর সঙ্গে ফয়জাবাদের এক জজের স্ত্রী আসিয়াছেন মার সঙ্গে তিনি চার পাঁচ দিন থাকিবেন এই আশায় অনেক কক্ষে স্বামীকে মত করাইয়া আসিয়াছেন কিন্তু ভোলানাথের কঠিন বসন্ত রোগ হওয়ায় আশ্রমে কাহাকেও রাখা ঠিক হইবে না এই সব কথা হইতেছে। তিনি মার সঙ্গে একান্তে কথা কহিতেছেন। এর মধ্যে সেবা (সারদা) লক্ষ্মীর এক ডাক্তারকে নিয়া আসিয়াছেন তিনি মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আমি যেই মাকে এই খবর বলিলাম অমনি মা বলিলেন “তাহাকে ডাক আমাদের কথা শেষ হইয়া গিয়াছে।” সকলে মার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মা ডাক্তারকে দেখিয়াই বলিতেছেন “এই বাবাজীকে আমি আজ দুপুরবেলা দেখিতেছিলাম” তারপর যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই ডাক্তার বাবুর পূর্ব জন্মের দৃশ্যটি মার চোখে আজই ভাসিয়া উঠিয়াছিল ইনি একজন বড় অকিসার ছিলেন হ্যাট কোট পরিয়া যেন

মার কাছে আসিয়াছেন আর ইংরাজীতে কথা বলিতেছেন মার মুখ হইতেও সেই রকম ভাবাই জবাব হইয়া যাইতেছে। এর যখন কাচা পাকা দাঁড়ি হইয়াছিল এবং পেন্সন নিবার কিছু বাকী ছিল তখন ইহার দেহান্ত হইয়াছিল, দেহান্ত হইবার পূর্বে প্রবল একটা শুদ্ধভাব জাগিয়াছিল তাই মার চোখে ইহার সেই সময়ের দৃশ্যটা ভাসিয়া উঠিয়াছে। মার কাছে গিয়া ইনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন “মনটা কি?” মা বলিতেছেন “মন ও তিনি তাঁর চঞ্চলতা ও তিনি যেমন অন্ন ব্রহ্ম, জল ব্রহ্ম এক ছাড়া কিছুই নাই” এই কথায় ইনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। মার এই সব কথা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এমন ভাবে ত মা সকলকে যেন কচিং কখনও বলেন ইনি নূতন লোক, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই যেন ইহাকে মা এ সব বলিয়াছিলেন। ইনিত কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। মা বলিলেন, “তোমরা মনে কর নূতন পুরাতন লোক আমি ত দেখি সবই পুরাতন সবই নূতন।” আরও বলিতেছেন “পূর্ব জন্মের কতগুলি লক্ষণ এ জন্মেও ইহার শরীরের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাই দেখিয়া আমার খেয়াল হইল। আর কথা বার্তা হইতেছে “দরজা বন্ধ করিয়া আমাকে তোমরা বল নাই যে কেহ আসিয়াছে কিন্তু আমার খেয়াল হইল যাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম কথা শেষ করিয়া দেওয়া হইল এর মধ্যেই তুমি (আমাকে বলিতেছেন) খবর দিলে একজন ডাক্তার দেখা করিতে আসিয়াছেন, আমি জানি বাবাজি

আসিয়াছেন “এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, লক্ষ্মী আসিয়াছেন মার কাছে কাঁদিতে লাগিলেন বলিতেছেন “মা, মন স্থির হয় না আবার সাংসারিক কত বাধা ভগবানের কাজ কিছুই করিতে পারিতেছি না।” মা বলিলেন “কি করিয়া স্থির হইবে? যাহা ধারাপ জিনিষ খাইয়াছ তাহা বদ হজম হইবেই ত, ডাক্তাররা কি করে জ্ঞান? প্রথম দাস্তের ঔষধ দেয় তারপর পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে শেষে আবার ঔষধ দিতে আরম্ভ করে। তোমরাও তাই করিতে থাক। আবার একবারে বেশী ঔষধ দেওয়াও যেমন ঠিক নয় সেই রকম একদিনে খুব নাম করিলে এমন করিলে যাহাতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে আবার কয়দিন নাম নিবার ইচ্ছাই করিল না। ইহা ঠিক নয় সবই ধীরে ধীরে নিয়ম মত করা দরকার তাহাতে স্নফল পাওয়া যায় একদিনে ঐরূপ করিলে অবসাদ, নাস্তিকতা এসব আসিবার ভয় থাকে।”

রাত্রিতেও মার শুইবার ভাবই নাই। ভোলানাথেরও বসন্ত উঠিয়াছে এতদিন কেহ ধরিতে পারেন নাই অথবা ধরিলেও বলেন নাই। মা নিজেই ডাক্তারদের ডাকিয়া ডাকিয়া ভোলানাথের শরীর দেখাইয়া দিয়াছেন এবং বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন “তোমরা কি হাম হাম বল এয়ে আসল জিনিষ উঠিয়াছে এখন দেখিয়াছ ত?” ডাক্তাররা তখন স্বীকার করিলেন ও বলিলেন “মা, কি বলিব রুগী ভয় পাইবে তাই বলা ঠিক হয় না আর যাহা করিবার তাহাত করাই হইতেছে।” মা বলিলেন “তোমরা বলিতেছ

হাম অথচ আমি রোগের যে মূর্তি পরিষ্কার দেখিতেছি তাহা হামত নয়ই, তাই নিজে গিয়া দেখিয়া তোমাদের দেখাইলাম।” অনেক সময় দেখা গিয়াছে ডাক্তারী বা ঢাকায় মন্দির তুলিবার সময় কণ্ট্রাক্টারকে মা যে সব কথা তাহাদের কাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহা তাহারা মানিয়া নিয়াছেন, প্রথমে তাহাদের মাথায় সে সব কথা খেলে নাই শেষে মার কথা শুনিয়া যেন তাহাদের খেলান হইয়াছে সত্যই ইহা করিলেই ত ভাল হয়। এই রকম সব বিষয়েই মায়ের পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রাত্রিতে মা ও আমি বারান্দায় বসিয়া আছি। মা বিছানায় শুইয়া আছেন আমি পাশে বসিয়া কি একটু সেবা করিতেছি ভোলানাথের ঘরে একজন জাগিয়া সেবা করিতেছেন আর সকলেই ঘুমাইয়া আছেন, রাত্রি প্রায় ১টা। অল্প অল্প জ্যোৎস্না আসিয়া মার বিছানায় পড়িয়াছে। মা “বলিতেছেন এ সময়েতেও কত সব আসে যায়।” সুক্ষ্ম শরীরীদের কথা বলিতেছেন। সব সময়তেইত আসিতেছে যাইতেছে। আমি বলিলাম “আচ্ছা মা! তোমার কাছে যখন অনেক লোক বসিয়া থাকে তখনও কি ইহারা আসেন? মা বলিলেন “আসিবেন না কেন? তাহারা কখনও ভীড়ের মধ্যে কখনও একান্তে সব সময়ই আসিতেছে যাইতেছে তাহাদের সঙ্গে কথা বার্তাও হইয়া যাইতেছে। তোমরা দেখিতেছ ভীড়, তাহাদের কাছে কেমন জান? যেমন

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া তোমরা দেখ নতুবা ছোট জিনিষ দেখাই যায় না তোমরাও তাহাদের কাছে তেমনই কাজেই বাধা পাইবে কেন? আবার কেহ কেহ বাধাও পায় সব রকমই আছে। আবার দেখ কাহারও প্রিয়জন হয়ত তাহার পরলোকগত আত্মীয়কে মনে করিয়া দুঃখ করিতেছে তাহাতে সেই পরলোকগত আত্মারও কষ্ট হয়। অথচ আসিতেও পারে না এই জন্মই বলা হয় পরলোকগত আত্মার জন্ম দুঃখ করিতে নাই।” আমি বলিলাম “আচ্ছা সেই পরলোকগত আত্মা যদি আবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তবুও কি এই জন্মের আত্মীয়দের তাহার জন্ম দুঃখ তাহাকে ব্যথিত করে?” মা বলিলেন “তাহাও করে, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না কেহ ব্যথিত হইতেছে। পূর্ব জন্মের আকর্ষণও এই ভাবে ক্রিয়া করে।” এই বলিয়া বলিতেছেন “এসব বলিবার কিছুই নাই তোমাদের সঙ্গে মিলনও যেমন স্বাভাবিক উহাদের সঙ্গেও ঠিক তাই তবে তোমরা শুনিতে চাও তাই বলা হয়।” মা মধ্যে মধ্যে ভোলানাতের ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, বলিতেছেন “সবই দরকার বোধ হয় তাই হইয়া যাইতেছে, যাহারা সেবা করিতেছে তাহারা এই শরীরটা উপস্থিত থাকিলে একটু শক্তি পায় নতুবা তাহাদের অবসাদ আসিয়া পড়ে, এই জন্মই হয়ত যাওয়া হয়।” বাস্তবিকই এক এক সময় দেখা গিয়াছে মা তখন না গেলে রোগীর যাহা বিশেষ আবশ্যক তাহা

করা হইত না কেহ বুঝিতে পারিতেছিলনা। যেই আবশ্যক
অমনি মা গিয়া তথায় উপস্থিত। সব সময়ই এই ঘটনা
দেখিতেছি।

২০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার :—

আজও মার ঐ অবস্থাই চলিতেছে, আজও রাত্রিতে শোওয়া
হইল না। আমিও জাগিয়া আছি। এই ভাবেই রাত্রি
কাটিয়া গেল। ভোলানাথের ঘরে গিয়াও কিছু কিছু ব্যবস্থা
করিতেছেন। মার অবস্থা দেখিয়া আমার কেমন সন্দেহ
জাগিতেছে হয়ত মা শীঘ্রই একটা কিছু করিবেন।

২১শে বৈশাখ বুধবার :—

আজও মা বিশেষ কিছু খাইলেন না। শুধু জল দিয়া
একটু তরকারী সিদ্ধ আজ দুই দিন যাবত খাইতেছেন। মধ্যে
মধ্যে একটু দুধ রুটীও খান। এই ভাবে চলিতেছে, বলেন
“যখন এই শরীরটা আপনভাবে চলিত খাওয়া দাওয়ার এত
সব বন্দোবস্ত কিছুইত ছিল না কোন দিন খাইতে বসা হইত
কোন দিন হইতও না। নিয়মমত খাওয়ার ত ব্যবস্থাই ছিল
না যখন যাহা হয় একটু খাইয়াই থাকা হইত সেই সময়
শরীর ভাল ছিল এখন তোমরা এত যত্ন ও নিয়ম করিতেছ
অথচ শরীর ভাল হইতেছে না।” যাক এই ভাবেই খাওয়া
চলিতেছে আমরাও বাধা দিতেছি না। আজও দুপুর বেলা
ভাবটা দেখিয়া আমার কেমন মনে হইল? বলিলাম “কি
মা?” মা বলিলেন “কি আর শরীরটা অসুস্থ ছিল তোমরা

আসিয়া শরীরটাকে কত যত্ন করিয়া সুস্থ করিয়াছ এখন আবার সুস্থ শরীরের যাহা করিবার তাহাই করিবে। আমি বলিলাম “আমিও তাহাই বুঝিতেছি” আর কিছু বলিলাম না। মা বলিলেন “মনুকে (শচীদাদার বোন) ডাক তাহার কি বলিবার ছিল।” তিনি আসিয়া মার সঙ্গে দরজা বন্ধ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন বেলা তখন প্রায় তটা। এর মধ্যেই লহমী, গোলা ও তাঁহাদের আত্মীয় আরও দুইটা কাশ্মিরী স্ত্রীলোক আসিয়া মার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বসিয়া আছেন। চারিটার পর ঘরের দরজা খুলিল। শুনিলাম মনুদির যাহা বলিবার ছিল শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি দুপুরে অনেক সময় মা একা থাকিতে চাহিলে মার ঘরের দরজায় বারন্দায় বসিয়া থাকিতাম আজও ঘরের দরজা খুলিলেই লহমী প্রভৃতি মার কাছে গেলেন কিন্তু আমি বারন্দায়ই বসিয়া আছি। বেলা প্রায় পাঁচটা এর মধ্যে মা আমাকে ডাকিলেন মার মুখের হাসিটুকু দেখিয়াই আমার কেমন ভিতরটা দমিয়া গেল মনে হইল মা এখনই কিছু একটা বলিবেন। সত্যিই তাই হইল। মা এদিক ওদিক দুই একটা কথা বলিয়াই আমাকে বলিলেন “দেখ একটা, কথা, হয় তোমরাই আজ যাও নতুবা আমি যাই কোথায়ও একটু ঘুরিয়া আসি।” সকলে দেখিল এ কি মুর্তি, মা যদিও হাসিতেছেন কিন্তু আমরা বেশ জানি এ আদেশ ভঙ্গ করিবার শক্তি কারও নাই। ভোনানথ আজ দুইদিন

যাবত প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। দিন দিনই খারাপ চলিতেছে
 এর মধ্যে কোথায় লোক জনের দরকার বলিয়া আমরা
 মনে করিতেছি কিন্তু মার সেদিকে ভ্রক্ষেপও নাই। আমি
 জিজ্ঞাসা করিলাম “কাহার কাহার যাইতে হইবে? আমরাই
 যাইব তুমি যাইও না।” তখন মা বলিলেন তুমি, বাবা,
 (অখণ্ডানন্দ স্বামী) মনু, তোমার দিদিকেও নিয়া যাও,
 নবতরু ত আজই যাইবে বলিয়াছিল সেও যাইবে, নিধুর
 ইচ্ছা হইলে যাইতেও পারে থাকিতেও পারে।” বলিতেছেন
 “শীঘ্র বন্দোবস্ত করিয়া নেও সময় ত বেশী নাই ৬ টার
 মধ্যেই রওনা হইতে হইবে আমি ভাবিতেছিলাম লছমী
 যদি মোটর নিয়া আসে তবেই হয়। দেখি লছমী আসিয়া
 উপস্থিত। তোমরা বাড়ী যাও (লছমীকে তখনই পাঠাইয়া
 দিলেন) রাস্তা হইতে বাস একখানা পাঠাইয়া দিও। তাই
 হইল। বাবা গিয়া দাঁড়াইলেন “মা এ কি আদেশ যেন হঠাৎ
 মাথায় বাড়ি দেওয়া হইল আমার ত শরীর কাঁপিতেছে
 ভোলানাথের এই অবস্থা তোমার শরীর ভাল নয় এ
 অবস্থায় আমাদের চলিয়া যাইতে হইবে?” মা বলিলেন
 “তুমি ত সন্ন্যাসী তুমি আবার কি সেবা করিবে? তোমারই
 এখন সেবা করা দরকার তুমি বসিয়া যে আত্মচিন্তা করিবে
 তাহাতেই কাজ হইবে।” দিদিমাকে বলিলেন “তুমি বুড়া
 মানুষ কি সেবা করিবে? আর এই দৃশ্য দেখিতে কি
 তোমার ভাল লাগিতেছে? তুমি গিয়া বসিয়া বসিয়া

মঙ্গল চিন্তা কর তাহাতেই মঙ্গল হইবে।” আমাকে বলিতেছেন “দেখ আমি ত এই ভাবেই হঠাৎ চলিয়া যাই, আর তোমাদেরই শুধু এই ভাবে যাইতে আসিতে বলি সকলকে ত বলা হয় না আমি জানি তোমরাও এই ভাবে চলিতে পারিবে।” এই ভাবে সকলকে সব কথা বলিয়া যেন গা ছাড়া দিয়া বসিলেন। সকলেই অবাক, আমি বলিলাম “মা, তোমাকে দেখিবারও ত কেহ রহিল না, ভোলানাতের এই অবস্থা।” মা বলিলেন “সব হইয়া যাইবে যাহা বলিতেছি কর, মঙ্গলের জন্মই বলিতেছি।” আমি বলিলাম “যত কষ্টই হউক তোমার আদেশ ত পালন করিবই।” একটু একান্তে কথা বলিতে চহিলাম মা সকলকে উঠাইয়া দিলেন। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া বলিতেছেন “আমি ত জানি তুমি এখানে থাকিলে এ শরীরটার একটু বিশেষ যত্ন হয়, সব দিকই সুবিধা কিন্তু তাহাও বোধ হয় হওয়ার নয় তাই আমার এরকম খেয়াল হয়” এই বলিয়া আরও দুই চারিটি কথা বলিলেন। তারপর সকলে ঘরে গেলে বলিতেছেন “সকলেই প্রাণের সঙ্গ কর তাহাতেই আমার আনন্দ। মনে রাখিও তাই বেশী সেবা।” আশ্চর্য্য ব্যাপার যখন লোকের দরকার বলিয়া সকলেই চিন্তা করিতেছি তখনই সকলকে সরাইয়া দিলেন এ জন্ম ইহা হইবেন। এ কথা মার কাছে কখনও খাটিবে না আপন মনে চলিয়া যাইতেছেন কিছুতেই তাঁহার বাধা হইতেছে না। সুবন্দোবস্ত

করিয়া সকলে বসিবে এ সুযোগ দিতেছেন না, যখনই কোন সুবন্দোবস্ত হইতেছে তখনই ভাঙ্গিয়া দিতেছেন অথচ যতটুকু সময় থাকে স্কুলশালায় কাজ করিতে বলেন। এক অদ্ভুত ঘটনা কেহ ইহা ধারণাও করিতে পারিতেছেন না। যাক গাড়ী আসিল ঘটা খানেকের মধ্যেই আমরা রওনা হইলাম। মা বারান্দায় বসিয়া বসিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। এইরূপ সব ভাঙ্গিয়া দিতে মার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। ভাঙ্গা গড়া যেন মার হাসি খেলা। আগামী কল্যা ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর কবিরাজ আসিয়া পৌছিবেন।

২২শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার :-

আজ বৈকালে আমরা ৮কালীধাম আসিয়া পৌছিলাম। স্টেশন হইতে ধর্মশালায় আসিতে রাস্তায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় খবর দিবার জন্ম নামিলাম দেখি তথায় স্বামী শঙ্করানন্দ জী, নেপাল দাদাও আছেন। আমাদের দেখিয়া তাঁহারা বিপদ আশঙ্কা করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। সব খবর শুনিলেন। স্বামী শঙ্করানন্দজী আগামী কল্যাই দেহাঙ্গন যাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বসন্ত হইয়া গিয়াছে এবং তিনি আরও বসন্ত রোগীর সেবা করিয়াছেন। মারের আমাদের উপর আদেশ শুনিয়া সকলেই অবাক হইলেন। তবে ইহা ত নূতন নয়। যাক মা আমাদের ঢাকা যাইতে বলিয়াছেন।

২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার :—

আজ স্বামী শঙ্করানন্দজী ও নবতরু দাদা ৩শীতলামার পূজা দিয়াছেন। আশীর্বাদ নিয়া স্বামীজী দেৱাত্ন চলিয়া গেলেন। আমিই শঙ্করানন্দজীকে ৩শীতলামার পূজা দিয়া আশীর্বাদ একটু পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছিলাম। আমরা দুই চারিদিন কাশী থাকিয়া কলিকাতা রওনা হইব স্থির করিয়াছি। মনটা কেমন অস্থির করিতেছে কারণ মার কোন ভাবে এমন ভরসা পাই নাই যে ভোলানাথ ভাল হইবেন বরং মার হাব ভাব দেখিয়া ভয়ই পাইয়াছি এবং আশঙ্কাই জাগিয়াছে। আমরা বলিতেছিলাম “মা, শিবশঙ্কর কবিরাজ ত কাল আসিয়া পৌঁছিবেন দেখা যাক কি বলেন? মা যেন কতকটা উপেক্ষা ভাবে বলিলেন “কবিরাজ আসিয়া কি করিবে? দেখিতেছনা অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতেছে।” আবার আমাদের আসিবার পূর্বদিন রাত্রিতে মা নিজেই আমাকে ভোলানাথের শরীর দেখাইয়া বলিলেন “দেখ, ভোলানাথের শরীর কেমন একটু ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিয়াছে। আমার ত মনে হয় সব খারাপ রকমই উঠিয়াছে। অবস্থা দেখিতেছ ত?” আমাদের আসিবার পূর্বে কি কথার উত্তরে মা বলিলেন “অবস্থা ত দেখিয়াই যাইতেছ, দিন দিনই খারাপ দেখিতেছ ত?” এই সব কথায় আমাদের আশঙ্কা খুবই ছিল। রাত্রিতে দিদিমা হঠাৎ ঘুমের ঘোরে “ভোলানাথ ভোলানাথ”

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই ভাবে দিন রাত্রি কাটিয়া গেল।

২৪শে বৈশাখ, শনিবার :—

আজ দুপুর বেলা প্রাণটা যেন অস্থির অস্থির, মা, মা করিয়া যেন প্রাণটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। দিদিমা ও মেজদিদি, আমি ও স্বামী অখণ্ডানন্দজী হরির বাঙ্গালী ধর্মশালায় আছি। মেজদিদিকে (শচীদাদার বোন) এই কথা বলিলাম। তারপর এই অস্থির অস্থির ভাব নিয়াই বাচ্চুদের বাসায় গেলাম। কিছুক্ষণ পরই নেপালদাদা গিয়া হাজির, ভয়ঙ্কর খবর শুনিলাম। নেপাল দাদা বলিলেন “ভূপতি দাদার টেলিগ্রাম এই মাত্র পাইলাম, কাল রাত্রিতে অর্থাৎ ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার রাত্রিতে ভোলানাথ দেহরক্ষা করিয়াছেন।” এই খবর শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। কি ভয়ঙ্কর ওলট পালট হইয়া গেল। ধারণারও অতীত ব্যাপার চক্ষের পলকে হইয়া যাইতেছে। এখন বুঝিলাম মা কেন ঐ সব কথা বলিয়াছিলেন। অথচ মার উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বার্তার একটুও বোকা যায় নাই যে এত বড় ঘটনা আসিতেছে। স্বাভাবিক, সহজ, সরল ভাবের একটুও পরিবর্তন নাই। মা যে হাসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন “বিপদ আসিতেছে” আমি এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলাম “তোমার যে কেবল বিপদ বিপদ।” মা হাসিয়া বলিলেন “আমি কি করিব, আসিয়া বলিয়া যায়, আমি কি করিব। বলিয়া গেল “বিপদ আসিতেছে” যেমন তোমরা বল ঠিক সেই রকমই। সবই বুঝিতেছেন আভাবে সবই বুঝাইতেছেন

অথচ নিজের ভাবের কোন পরিবর্তন নাই। এখন মনে হইতেছে মা হয়ত দিদিমাকে সরাইয়া দিলেন। আবার দুঃখ হইতেছে মা এই বিপদের সময় আমাদের কাছে রাখিলেন না কেন? মা যখন আমাদের পাঠাইলেন বলিলেন “বাবা করিও না বাহা বলি, করিও মঙ্গলের জন্মই বলিতেছি।” কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই এমনই ভাব। পূর্বেরই বলিয়াছি কখনও কখনও সকলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেন মনে হইত তাহাদের ছাড়া মার বুঝি একদণ্ড চলেনা আবার চক্ষের পলকে সব ভাঙ্গিয়া দেন সব সরাইয়া নিজেও সরিয়া পড়েন তখন মনে হয় কাহাকেও দিয়া মার কিছুই আবশ্যক নাই। মা যেন সর্বদাই মুক্ত, বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এই এক অদ্ভুত চরিত্র। ভাঙ্গিতে গড়িতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। তাই আমরা কাছে থাকিলেও সর্বদাই আশঙ্কায় থাকিতাম কি জানি কখন কি আদেশ হয়। অথচ মার স্নেহ মমতারও কত পরিচয় পাইয়াছি, পাইতেছি তাও অভুলনীয়। তাই কৃষ্ণ চরিত্রের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে হইত। মা যেন সবটার মধ্যেই আছেন, আবার কিছুর মধ্যেই নাই। এই চরিত্রটী পূর্ণভাবে সর্বদাই মার মধ্যে ফুটিয়া থাকে। এক এক সময় মা এমন ভাবের ব্যবহার করেন এমন সব কথা বলেন, নূতন লোক আসিয়া হয়ত মাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়া যাইতে পারে। মাও এক এক সময় হাসিয়া

হাসিয়া বলিতেন “তোমরা সর্দির জন্ত হাতে রুমাল দিয়াছ, পায়ে জুতা দিয়াছ, তোমাদের বিছানা নষ্ট করিব, গায়ে জামা দিয়াছ, কেহ কেহ দেখিয়া বলিবে “তোমাদের আনন্দময়ী মাকে দেখিয়া আসিলাম বেশ বাবুগিরি আছে” এই বলিয়া হাসিয়া লুটাপুটী খাইতেন। শেষে শুনিতাম সত্যিই কাহারও কাহারও মনে ঐ ভাব হইয়াছে। মার ত ত্যাগও নাই ভোগও নাই, এ সব যে মার চরণে পড়িয়া আছে। কিন্তু এ সব ধারণা করা আমাদের মত সাধারণ লোকের যে একবারেই অসম্ভব। যুগপৎ দুইটা বিপরীত ভাব মার মধ্যে খেলিত তাই যে টুকু বুঝিতাম অবাক হইয়া থাকিতাম। আবার মার লীলা খেলায় সব ভুলিয়া যাইতাম। কত অপরাধ করিতাম, কত ভুল করিতাম। এই চরিত্রে স্থির থাকা মানবের সাধ্য কি? মার প্রত্যেক কথায় ও চরিত্রেই গীতার ভাবটী পূর্ণ ভাবে ফুটিয়া উঠিত। যাঁহারা সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা ই আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

ভোলানাথের দেহরক্ষার সংবাদ দিদিমাকে দেওয়া হইলনা। আমরা দেৱাডুন টেলিগ্রাম করিলাম।

২৫শে বৈশাখ, রবিবার :—

আজও কোন খবর পাইলাম না। মনটা বড়ই অস্থির হইয়া আছে। মা কি করিতেছেন, কোথায় যাইবেন, কি করিবেন নানা চিন্তায় মন তোলপাড় করিতে লাগিল।

মার জন্মোৎসবের মধ্যেই আমাদের ঢাকা বাইতে বলিয়া দিয়াছেন কাজেই বেশী দিন অপেক্ষা করিতে পারিব না। ১৯শে বৈশাখ হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১৮ দিন উৎসব চলিবে। শেষ দিন অর্থাৎ কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে সকাল বেলা পূজার পর শ্রীশ্রীকালীমাতার গহ্বরের মন্দির খুলিয়া দেওয়া হইবে। সর্ব সাধারণে সেই দিন ভিতরে বাইয়া দর্শন করিতে পারিবেন তারপর সন্ধ্যার পর সর্ব সাধারণের জন্ম মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া বাইবে, পরে মন্দির পরিষ্কার করিয়া প্রতিমার অভিষেক করিয়া পূজা হইবে। এই ব্যবস্থা মা প্রথম হইতে করিয়াছিলেন পরে আবার রাত্রি তিনটায় মার জন্মের সময়ে পূজা হইবে, সেই পূজা হইতে হইতেই ভোর হইয়া যায়, যজ্ঞাদিও হয়। তিথি পূজা পর দিনও শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা হইয়া গহ্বরের মন্দির বন্ধ করা হইবে। এই নিয়মেই আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই এক বছর ভুল ক্রমে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে। এবার আবার ঠিক মত করা হইবে।

আজ সন্ধ্যার সময় যোগেশ দাদার এক চিঠি পাইলাম তিনি আবার দেয়াড়ন হইতে রওনা হইয়া আসিবার পর দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার লিখিতেছেন “দিদি, তোমরা চলিয়া যাওয়ার পর সেই দিনই রাত্রিতে ভোলানাথ তোমাকে ডাকিয়াছেন তারপর দিন সকালেও তোমার খোঁজ করিয়াছেন, শেষে মা বলিয়াছেন “শুকুনীকে এক যায়গায় পাঠাইয়া

দিয়াছি”, তারপর দিদিমার খোঁজ করিয়াছেন, মাকে বলিয়াছেন, “তোমার মা কই?” মা বলিয়াছেন “তাহাকেও এক যায়গায় পাঠাইয়া দিয়াছি তোমার মঙ্গল কামনা করিবার জন্য।” তার পর দিন রাত্রিতে নবতরু কোথায় জিজ্ঞাসা করায় মা বলিয়াছেন “তাহার বাড়ী হইতে যাওয়ার জন্য চিঠি আসাতে তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি, ভাল করি নাই?” উত্তরে বলিয়াছেন “ভালই করিয়াছ।” আরও লিখিয়াছেন “এখন মাকে মা, মা, সর্বদাই ডাকিতেছেন মা ঘরে গিয়া শুইলেই বলেন কই মাকে ত এতবার ডাকিলাম মা ত আসিলেন না।” আবার মা নিকটে গেলেই মা, মা, বলিয়া ডাকেন মাও জবাব দেন। মাকে দেখিয়া এখন মনে হয় মার কোন অসুখই নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।” কথা হইল আমরা আসিবার সময় মা বলিয়াছিলেন ইহারা যে চলিয়া গেল কেহ ভোলানাথকে বলিও না। আমাদেরও বলিয়া ছিলেন “তোমরা কেহ ভোলানাথকে কিছু বলিও না যদি তোমাদের খোঁজ করেন আমিই যাহা হয় বলিব।” মা কিজন্য কি করেন মাই জানেন। আজ সন্ধ্যায় দিদিমাকে ভোলানাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনান হইল, তিনি মাটিতে লুটাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন আবার আমরাই সান্ত্বনা দিলাম। নিজেদেরও প্রাণে অসহ বেদনা আবার সান্ত্বনা দিতেছি এই বৃদ্ধ বয়সে দিদিমার যে কত বড় আঘাত লাগিল তাই চিন্তা করিতেছি। কোনই উপায় নাই। অবনত মস্তকে বিধির বিধান মানিয়াই বাইতে হইবে।

২৬ শে বৈশাখ, সোমবার :—

আজ আমরা টেলিগ্রামের জবাব পাইলাম। মা ভালই আছেন, ভাবের কোনই পরিবর্তন নাই। মা বাহা বলিয়া দিয়াছেন সেই মতই কাজ করিতে বলিয়াছেন। আমরা আজই সন্ধ্যা ৬ টার গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইলাম।

২৭শে বৈশাখ, মঙ্গলবার :—

আজ বেলা ৮ টায় আমরা কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমে মেজদিকে নামাইয়া দিতে শচীদাদার বাসায় গেলাম তথায় মার এবং ভোলানাথের কথা বলিতে বলিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। দিদিমাকে নিয়া তাঁহার বাসায় গেলাম। আজ একাদশী দিদিমার বাসাতেই জল খাইয়া বেলা প্রায় ১১টায় আমরা দুই তিন বাসার দরজায় বাইয়া দেখা করিয়া করিয়া বিল্লার শিব মন্দিরে পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার পর রামতারণ বাবু, গোপীনাথ বাবু, শচী বাবু এবং যতীশবাবু সপরিবারে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত কথা বার্তা হইল। সবই যেন ছত্রভঙ্গ এই সব কথাই হইল। শচীদাদার কাছে শুনিলাম দেয়াদুন হইতে নরেশবাবুর চিঠি আসিয়াছে তাহাতে জানিয়াছেন ভোলানাথের দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহ হরিদ্বার আনিয়া “সলিল সমাধি” দেওয়া হইয়াছে, মা ভালই আছেন, ভাবের কোন পরিবর্তন নাই। মার বিস্তারিত কোনই খবর নাই। যতীশ দাদার মার মুখে এক

এক ঘটনা শুনিলাম, তিনি বলিলেন “আজ কয়েক দিন হয় তাহার ছোট মেয়ে বুটু স্বপ্নে দেখিতেছে সে যেন ৭কালী মন্দিরে গিয়াছে। গিয়া দেখে ৭কালী মূর্তির ডান দিকে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী হাটু গাড়িয়া বসিয়া আছেন। পাণ্ডা-ঠাকুর কালী পূজার জন্য বুটুর হাতে ফুল দিল সে মন্ত্র পড়িয়া কালীর পায়ে ফুল দিতেছে কিন্তু দেখিল সব ফুলই গিয়া আনন্দময়ীমায়ের পায়ে পড়িতেছে। তখন বুটুর মনে কেমন একটা খটকা লাগিল ভাবিল, এই কি, আমি মন্ত্র পড়িয়া কালী মাতার পায় অঞ্জলী দিতেছি আর সব অঞ্জলী গিয়া পড়িতেছে আনন্দময়ী মার পায়, এ কি রকম হইল? সে তখন মনে মনে খুব ভাল করিয়া মন্ত্র পড়িয়া ভক্তি ভাবে কালীর পায় আরও একবার অঞ্জলী দিল মনে করিল এবার নিশ্চয়ই মা কালী অঞ্জলী নিবেন কিন্তু চাহিয়া দেখে এবারও আনন্দময়ীমার পায়েই গিয়া অঞ্জলী পড়িয়াছে, তখন তাহার সংশয় ভঞ্জন হইল। এই দেখিতেই সে জাগিয়া গেল।

রাত্রিতে শচী খাবু আসিয়া বলিলেন “দেৱাৱন হইতে নৱেশ তাহার ভাই ভূপেশকে পত্র দিয়াছে তাহাতে খবর পাওয়া গেল যে রাত্রি ২টার সময় ভোলানাথের দেহ হরিদ্বার নিয়া “সলিল সমাধি” দেওয়া হইয়াছে। মার ভাবের কোনই পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না।” আর বিশেষ কোন খবর নাই।

আমার মনে হইল হরিদ্বার কুস্তুর সময় এক দিন রাত্রিতে প্রায় ১২টার সময় সকলে ঘুমাইয়াছে, আমি মার কাছে বসিয়া আছি। হঠাৎ মা আমাকে বলিলেন “ভোলানাথকে ডাকিয়া নিয়া আস ত।” আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। মা ভোলানাথকে কি বলিলেন, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম শুনি নাই। কিন্তু তার পর দিন হইতেই ভোলানাথ সকলকে বলিতে লাগিলেন “আমাকে তোমরা আর বেশী দিন পাইবে না। আমি এই সক্রান্তি দিনই কি করি দেখ।” আমি অনুমান করিলাম হয়ত মা কাল রাত্রিতে এই ভাবেরই কিছু কথা বলিয়া থাকিবেন। শঙ্করানন্দ স্বামী মাকে বলিলেন “বাবাজীত এইসব বলিতেছেন।” মা বলিলেন “সাথে কি বলেন? কাল রাত্রিতে এই ভাবের কথা বলা হইয়াছে।” ভোলানাথ যাহাই বলুন কার্য্যতঃ কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তারপর ভোলানাথের অস্থখের মধ্যেও মা একদিন দেৱাছন নিজের ঘরে বসিয়া আছেন, নিকটে কণীবাবু, ভূপতিদাদা এবং আমরা অনেকেই ঐ ঘরে বসিয়াছিলাম, তখন ভোলানাথের কথা উঠিলে মা বলিলেন “যখন বলা হয়, ইহা বার না হইলে তোমাদের দৃষ্টিতে ক্ষতি হইবে। কোন কোন সময় তাহা খেয়াল করেন না, উড়াইয়া দিয়া নিজের ভাবে চলেন। এই দেখ হরিদ্বার কুস্তুর সময় রাত্রি ১২টার সময় ডাকিয়া একটা কথা বলা হইল, বলিলেন দেখা যাইবে।” কিন্তু

কার্যতঃ কিছুই করিলেন না। কথা বলিবার সময়ই আমি জানিতাম কথা রাখিবেন না। তবুও বলা হইল, কারণ আমি দেখি, কথা না রাখিতে পারিলেও ভিতরে একটা ক্রিয়া সকলেরই হইয়া যায়। একটা ছাপ রাখা আর কি। আর কি রকম জান? খেয়াল হইলে বলা চাই-ই। যেমন খুতু মুখে আসিলে ফেলিতেই হইবে। সেই রকম আর কি। উহার ক্রিয়াও ত কিছু হবেই।” তারপর ভোলানাথের বোধ হয় সে কথা মনে হইয়াছিল একদিন দেখিয়াছিলাম, ভোলানাথ রোগের যন্ত্রণায় অস্থির, রাত্রিতে মাকে ডাকিলেন। মা ঘরে বাইতেই বলিলেন “আমাকে ক্ষমা কর।” আর একদিন মা আমাকে একান্তে বলিলেন “দেখিতেছ ত? ভোলানাথের গলায় পৈতা নাই।” তারপর আরও এক কথা মনে পড়িল, মা আমাকে একদিন একান্তে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলিয়া ছিলেন—(কৈলাসের পথের ঘটনা) “পূর্বেই পার্বতীর মনে হইয়াছিল, ভোলানাথের নিকট হইতে দীক্ষা নিবে। ভোলানাথ মানস সরোবরে দাঁড়াইয়া ২ পার্বতীকে একটি মন্ত্র দিতেছিলেন, এই শরীরটাকেও কিছু সময়ের জন্য সামনে রাখিয়া ছিলেন। তখন এই শরীরের মুখ হইতে আবীর দেখ, মন্ত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইল, এবং কেমন খেয়াল হইল, ভোলানাথকে বলা হইল, দেখ, মন্ত্র কেবলই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে, তুমি শুনবে? গেরুয়াও ত ধারণ আছে। তখন ভোলানাথ বলিলেন “যখন উত্তর কাশীতে

ছিলাম, তখন সন্ন্যাস মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আরও অনেক মন্ত্রাদি আমার জানা আছে। ইহা শুনিয়া এই শরীর চূপ করিল। একটু পরেই শরীরটা হাটিতে যাইতেছে, আর মন্ত্র মুখে আসছে, পরক্ষণেই ভোলানাথ বলিয়া উঠিলেন “বল, বল, এত সন্ন্যাস মন্ত্র” বলিয়া তিনি এবার খুব আনন্দ ও মনযোগের সহিত মন্ত্র শুনিয়া নিলেন। ঐ স্থানে এই ভাবে ইহা হইয়া ছিল বলিয়া একত্রঙ্গ দ্বিতীয় নাস্তি এই ভাবের একটি নামও দিয়াছিলেন, উপস্থিত ভোলানাথের সে সন্ন্যাস নাম আছে। পরে হরিদ্বার পূর্ণ কুন্ডের সময় এই শরীরের সঙ্গে ঐ রাত্রি ১২টার এ বিষয় আলাপ হইলে, সন্ন্যাস ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিতে বলা হইল। তিনি নিজে নিজেই কার্যাদি করিয়া আসিয়া বলিলেন “সন্ন্যাস ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছি।” তাঁহাকে আরও বলা হইয়াছিল, “যদি পার ত খানিকটা সময় বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকার চেষ্টা করিলে ভাল।” তাহা তিনি পারিলেন না।

এই সব কথা মনে পড়ায় আমি বুঝিলাম এই কারণেই সলিল সমাধি দেওয়া হইয়াছে। মা আরও বলিয়াছিলেন যে ভোলানাথ তীর্থ সম্প্রদায়ে ‘সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই পরে একবার দেহাধুন হইতে, তাঁহাকে তীর্থ সম্প্রদায় চেষ্টা করিতে পাঠান হইয়াছিল, সুবিধা আর হইল না। ২৮শে বৈশাখ বুধবার।

আজ ভূপতিদাদার বিস্তারিত দুইপত্র আসিয়াছে। একখানা

শচীদাদাকে লিখিয়াছেন, আর একখানা আমাকে লিখিয়াছেন। আমাকে লিখিতেছেন “বাহা হইবার তাহাত হইয়া গেল, ভবিষ্যতে কি হইবে এখনও বলা যায় না। তবে তোমরা যদি কিছু আভাব পাইয়া থাক জানি না। পিতাজীর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্ব হইতেই মা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রায় পিতাজীর ঘরে আসিয়া সেবা শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।” (দুই তিন দিন এই অবস্থা আমরাই দেখিয়া আসিয়াছি) মৃত্যুর সময়ও মা শিয়রে বসিয়া ব্রহ্মতালু হইতে কপাল পর্যন্ত হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া একটা ক্রিয়া করিয়াছেন শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই রূপই করিয়াছেন। মায়ের ভাবের এতটুকুও পরিবর্তন হয় নাই কোনও প্রকার চাঞ্চল্যও প্রকাশ পায় নাই। ভোলানাথের মৃত্যুর পর মা তাঁহার কৈলাস পথে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ও তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়াছেন। তোমাকে মা এ কথা পূর্বেই বলিয়াছেন, বলিলেন। শচী দাদার পত্রে লিখিয়াছেন ‘ভোলানাথ মার নিকট হইতে মানস সরোবরেই সন্ন্যাস মন্ত্র পাইয়াছিলেন। মা তাঁহার নাম তিরবতানন্দতীর্থ রাখিয়াছিলেন। ৬-৫-৩৮ তারিখে রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় বাবার দেহত্যাগ হয়। (ইনি ৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন) ঐ রাত্রেই আমি হরিরাম, যোগেশদাদা, সদানন্দ ও শান্তি বাবার দেহ লইয়া হরিদ্বার গিয়া জল সমাধি দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

মায়ের ভাবের কোনই পরিবর্তন নাই। শাখা, সিন্দুর, কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। পূর্ববৎ হাসিমুখ, কথাবার্তা পূর্ববৎ, খাওয়া দাওয়া, পূর্ববৎ, মোটকথা কোনই পরিবর্তন নাই। অবিকৃত অচল অটল। মা বলেন “সধবাই বা কখন ছিলাম আর বিধবাই বা কখন হইলাম। তবে তোমরা আমাকে যে বেশে সাজাবে আমি প্রস্তুত আছি। আমি ত জানি আমি একভাবেই আছি।” মায়ের জন্ম কোন চিন্তা করিও না। সন্ন্যাসীদের নিয়মানুযায়ী ১৬ দিনে অর্থাৎ ২১-৫-৩৮ তারিখে এখানে ও হরিদ্বার ভাঙরা দেওয়া হইবে। ইত্যাদি

রাত্রিতে শচীদাদা কেটবাবুর নিকট লিখিত যোগেশদাদার এক কার্ড নিয়া আসিলেন তাহাতে লিখিতেছেন ভোলানাথের মৃত্যুর দিনের ঘটনা “বাবা, মৃত্যুর দিন প্রাতে ভাত খাইতে চাহিলেন, মা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নরম ভাত তৈয়ার করিয়া মৃগের জুস দিয়া বাবাকে খাইতে পাঠাইয়া দিলেন, বাবা বলিলেন, “মা খাইয়াছে?” আমরা বলিলাম “না”, তখন বাবা বলিলেন “আগে মাকে খাওয়াইয়া আস” তখন মা গিয়া বলিলেন “আচ্ছা আমার মুখে একটু দাও” মা একটু মুখে দিলে বাবা বলিলেন “এখন আমাকে তুমি একটু খাওয়াইয়া দাও” মা তাহাই দিলেন, তখন মুখটা বেশ উজ্জ্বল দেখাইল মনে হইল হয়ত এইবার ভাল হইয়া উঠিবেন। বাবা এখন মাকে মা, মা, বলিয়াই সর্বদা

ভাবিতেছেন মাও “এই যে মা কেন ?” বলিয়া কাছে যান, সন্ধ্যা বেলাই মা গিয়া মৃত্যুর দিন বাবার শিয়রে বসিলেন। রাত্রি ৯টায় কীর্তন করিতে বলিলেন আমরা কীর্তন করিতে লাগিলাম তারপরই বাবার দেহ ত্যাগ হইল। রাত্রি ৩টায় বাসে বাবার দেহ লইয়া আমরা হরিদ্বার গিয়া নীলধারায় জল সমাধি দিয়া আসিয়াছি” ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৯শে, বৈশাখ বৃহস্পতিবার :—

আজ উল্লেখ যোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা নাই।

৩০শে, বৈশাখ, শুক্রবার :—

আজ যোগেশ দাদার চিঠি আসিয়াছে লিখিয়াছেন “ভোলানাথের মৃত্যুর ২১৩ ঘণ্টা আগে একটু অবসর পাইয়া মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সন্ন্যাস মন্ত্র মনে আছেত ?” বাবা বলিলেন “হাঁ”। আরও লিখিয়াছেন এই ঘটনার যেন তোমাদের সঙ্কলিত কৰ্ম্মাদির কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়। নাম পূজাদি ও যজ্ঞাদি তোমাদের নিয়মিত যাহাই করিয়া থাক। মায়ের বিধান ঈশ্বরের বিধানের মতই অপ্রতিহত। সব সময়তেই ইহা লক্ষ্য করিতেছি দিন দিনই যেন এই চরিত্র আরও ফুটিতেছে। বলেন “যা করিবার করিয়া যাইবে এদিক ওদিক চাহিবেনা।” আজই তাই এই আদেশ পাঠাইয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যু তাঁর কাছে সমানই, সে জন্ম কোন কাজ বাধা হইতে পারে না। ইহা ত সৃষ্টির দৈনন্দিন ঘটনা। অবাক হইয়া শুধু দেখিতেছি মা

ভাগ].

প্রথম অধ্যায়

৬২

বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার দেখি মা কুসুমের চেয়েও কোমল। এই কোমলতা না থাকিলেও যে তিনি অসম্পূর্ণ। আর আমরাই বা বাঁচি কি করিয়া। পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন “তোমাদের জগুই বাহা কিছু এই শরীরটার মধ্য দিয়া হইয়া যাইতেছে নতুবা এরূপ হওয়ার আর কিছুই দরকার ছিল না।” এই মধুর বাণীর সত্যতাই তাঁর চরণে সকলকে নিয়া কেনিতেছে।

৩১শে, বৈশাখ, শনিবার :—

আজ আমরা ঢাকা হইতে রওনা হইলাম। মায়ের আদেশ উৎসবের মধ্যেই ঢাকা পৌছিবে হইবে। ওরা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রিতে তিথি পূজা হইবে।

৩২শা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার :—

আজ আমরা ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। জটু ও কানু আমাদের জগু কেষ্টনে গিয়াছিল। মাকে সর্বদা না পাওয়ার ঢাকার ভক্তেরা এখন আমাদের পাইয়াও কত আনন্দিত হয়। এই আনন্দের ভিতর মায়ের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভালবাসাই ফুটিয়া ওঠে। ৩ভোলানাত্থের দেহরক্ষার সকলেই খুব কষ্ট পাইয়াছেন তাঁহার গতবারের আনন্দ করিয়া যাওয়ার কথা সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। উৎসব নিয়ম মতই চলিতেছে। মেয়েরা বৈকালে একত্র হইয়া অনেকক্ষণ কীর্তন করে। অখণ্ডনাম চলিতেছে অন্ততঃ একজন নাম রক্ষা করিতে হয়। মেয়েরা সন্ধ্যার

পর পর্য্যন্ত খুব সুন্দর কীর্তন করে। নাম ঘর লোকে ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন মেয়েরা করতাল বাজাইয়া বা হাত তালি দিয়া কীর্তন করে তখন অতি সুন্দর দেখায়। কয়েকজন মাঝখানে বসিয়া নাম করেন। চন্দনের ফোটা সকলকেই দেওয়া হয়। পুরুষেরা তখন বাহিরেই থাকেন। মেয়েরা আপন মনে মহানন্দে খোলাভাবে নাম করেন। শ্রী কণ্ঠের সুমিষ্ট নামে সকলেরই প্রাণে আনন্দ দেয়। ঢাকার মেয়েদের মত এমন সুন্দর কীর্তন আর কোন স্থানেই এমন নিয়মিত ভাবে হয় না। ইহাই এখানকার মেয়েদের গৌরব। সপ্তাহে দুই দিন (রবিবার ও বৃহস্পতিবার) তাহারা সংসারের সব বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া আশ্রমে কীর্তনে আসিয়া যোগ দেয়। সেই সময় নাম ঘরে মায়ের আসন স্থাপন করিয়া নেয়। সুন্দর পবিত্র ভাব। মেয়েদের মধ্যে সেই দুই দিন আর বাজে কথা নাই সকলেই কীর্তনের ভাবটুকু নিয়াই যেন আশ্রমে আসেন। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা সকলেই একত্রে বসিয়া নাম করেন। আজ মেয়েরা কীর্তন করিল তাহাদের ভাবটুকু দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে তাই এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টায় শ্রী পুরুষ সকলেই ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। আশ্রমে এক এক জন করিয়া নামরক্ষার ব্যবস্থা আছে সেই নিয়মেই নাম চলিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া রহিলাম।

২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার :—

আজও নিয়মিত রূপে পূজা, বজ্র ও কীর্তনাদি হইল। উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই। আজও মেয়েরা দুই তিন ঘণ্টা কীর্তন করিল। তারপর আরতি হইল পরে কান্না সকলকে নিয়া নাম করিল, বেশ সুন্দর নাম করিল। বড়ই ভাল লাগিল। আজও রাত্রি প্রায় ১১টার আশ্রম হইতে সকলে বিদায় হইলেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার :—

আজই মার তিথি পূজা। শেষ রাত্রিতে কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে হইবে। দৈনন্দিন পূজার পর আজ গহ্বরের ৩কালীমাতার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। মায়ের নির্দেশ মত শ্রীবৃদ্ধ যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া দরজা খুলিলেন। আমরা মন্দিরে ছিলাম না। দরজা খুলিবার পরই আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুলদা দাদা মন্দিরে ছিলেন। আমরা যাওয়া মাত্রই কুলদা দাদা বলিলেন “ভয়ঙ্কর খবর মা কালীর অবস্থা দেখেন।” তখনই আলো নিয়া মায়ের মূর্তি দেখিলাম, মায়ের নীচের বাম হাতখানা সম্পূর্ণ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কি করা কর্তব্য; সকলেই এ বিষয়ে চিন্তিত হইলেন। স্থির হইল মাকে টেলিগ্রাম করা হউক ইতিমধ্যে লোক ডাকাইয়া হাত খানা মেরামত করা হউক। মেরামত হইয়া গেলে সর্ব সাধারণের জন্ম দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। মা একবার বলিয়াছিলেন

৩কালীর শরীরের কিছু কিছু অঙ্গহানি হইলে তাহা মেরামত করিয়াই লওয়া হইবে (যেমন পূর্বের একবার চোরে হাত ভাঙ্গিলে সেই হাত মেরামত করিয়া লওয়া হইয়াছিল)। কিন্তু এমন কোন বিশেষ অঙ্গ হানি যদি হয় (যেমন যে সব অঙ্গহানি হইলে মানুষ বাঁচেনা) তবে তখনই দরজা বন্ধ করিয়া দরজা একেবারে ইট দিয়া গাথিয়া দেওয়া হইবে। আজ এই অবস্থায় কি করা হইবে ইহা নিয়া অনেক আলোচনা চলিল। শেষে পূর্বোক্ত মতই স্থির হইল। হাতখানা কখন পড়িয়া গিয়াছে তার ঠিক নাই। হাতখানা আর পূর্বের মত জোড়া লাগান যাইতে পারে না কারণ একেবারে গোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই মেরামত করাব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। যাক দুপুরে একটা আচার্য্য আনিয়া হাত খানা কোন প্রকারে মেরামত করিয়া দিলেন। শুনিলাম পূর্বের হাতের কব্জা যে মেরামত হইয়াছিল তাহার মধ্যে একটু বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল। তারপর ভোলানাথ নিজে পূজা করেন। তাই এবার কুলদা দাদা মেরামত হইলেও ঐ মূর্তিতে পূজা করিতে সাহসী হইলেন না, যত্নে পূজা করিবেন স্থির করিলেন। মার নিকট এই সব ঘটনা টেলিগ্রামে জানান হইল। বৈকাল ৫টায় সর্বসাধারণের জন্ম দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। আবার সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের ভিতরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ৩কালী মায়ের পূজা

যন্ত্রে করা হইল। অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ রাত্রিতে পূজা দেখিবার জন্য আশ্রমে রহিয়া গেলেন। ৩কালীমায়ের মূর্তি এক বৎসর পর সকলে দেখিতে পায় তাই আজ মায়ের মূর্তি দেখিবার জন্যই সব বসিয়া আছে, রাত্রি আটায় মার প্রকাশ সময়তে আবার পূজা আরম্ভ হইল। ছেলেরা “জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয়” বলিয়া খুব কীর্তন করিতে লাগিল। পূজান্তে আরতি হইল। মন্দিরের বারান্দায় অনেক স্ত্রীলোক বসিয়া ৩কালীমাতা দর্শন করিতেছেন ও পূজা দেখিতেছেন। এক বৎসর পর দরজা খোলা হইয়াছে, সকলেই প্রাণ ভরিয়া এ মায়ের মূর্তি দেখিতেছেন। পূজা ও আরতি হইতে না হইতেই ভোর হইয়া গেল।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার :—

আজ ১৬দিন বাবত অখণ্ড নাম চলিতেছে আজ তাহা সমাপ্ত করা হইবে। সকলে আসিয়া একত্র হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। মন্দির ও মায়ের কুটির ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে নাম করিতেছিল। তারপর ধূপ জ্বলাইয়া লুট দিয়া দেওয়া হইল। এত দিনের নাম বন্ধ হওয়ায় সকলেরই প্রাণে একটা কেমন ভাব। প্রসাদ নিয়া সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিল। এতদিন সকলেরই একটা কাজ ছিল, নিয়ম মত সকলে আশ্রমে নাম করিতে আসিত, আসিলেই মালা, চন্দন দেওয়া হইত এবং (মায়ের কুটিরেই নামের আসন পাতা হইয়াছিল) এক একজনের পর পর এক

এক জন যথা নিয়মে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া বসিয়া মা, মা বলিয়া নাম করিত। দিন রাত এইভাবে নাম চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া নামধরে পদাবলী গাহিয়াছেন। মেয়েরা রোজই বৈকালে আসিয়া কীর্তন করিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের কণ্ঠা পরিমলই এখন এবিষয়ে অগ্রণী। সে খুব সুন্দর কীর্তন করে নাম করে। হিরণ দিদি, কিরণ দিদি, হিরণ দিদির মেয়ে বেলুন প্রভৃতি অনেকেই বেশ নাম করেন মেয়েরা অনেকেই করতাল, ঝাঁজ বাজাইতে শিখিয়াছে। মরণী, কুলদা দাদার মেয়েরা, অমূল্য দাদার মেয়েরা এবং মুক্তা প্রভৃতি অনেকেই সুন্দর করতাল বাজায়। সকলেই মালা চন্দনে সাজিয়া নাম করে। মেয়েরা প্রতি রবিবারে আশ্রমে মিলিত হইয়া কীর্তন করে, গতবার আমি আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমার জন্মবার বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবারেও তোমরা একত্র হইয়া আশ্রমে কীর্তন করিলে ভাল হয়। কীর্তনে ইহাদের এত আনন্দ যে এই কথা বলা মাত্রই সকলে আনন্দে স্বীকার করিল। তারপর হইতেই বৃহস্পতিবারেও কীর্তন আরম্ভ করিল। প্রতি সপ্তাহেই দুই দিন করিয়া স্ত্রীলোকদের কীর্তনে আসায় সংসারের পক্ষে কিছু কিছু অসুবিধা হইতে লাগিল কিন্তু সে দিকে তাহাদের দ্রষ্টব্য নাই। লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপও এজন্য তাহাদের যথেষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে কিন্তু তাহাতে তাহাদের কীর্তনে আসা বন্ধ হইল না বরং

দিন দিনই জীলোকের সংখ্যা কীর্তনে বাড়িতেছে। মা বলেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপন মনে নামের তালে তালে হাত তালি দিতে দিতে কীর্তনাদি করিলে শরীরের জড়তা নষ্ট হয় গ্রন্থি খোলে, একথার সত্যতা ক্রমে ক্রমে সকলেই অনুভব করিতেছেন। এক একজন জীলোকের কীর্তনের সময় এমন আনন্দ হয় যে তাহাদের সর্ব শরীর দিয়াই যেন তাহা ফুটিয়া বাহির হয় দেখিলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। আমি একথারে অনেক সময় দাঁড়াইয়া মুগ্ধ হইয়া দেখি। মার করুণার প্রভাব দেখিয়া আনন্দে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। ভূদেব বাবু (উকিল) অনেক সময় বলেন “জীলোকেরা যে এভাবে একত্র হইয়া কীর্তন করিবে এ কিন্তু আমাদের ধারণারও অতীত ছিল মার ইচ্ছাই ইহা সম্ভব হইয়াছে।” অনেক ভগ্নীদের মুখেই শুনিতেছি তাহারা বলেন সংসারের সমস্ত কাজের মধ্যেও তাহারা আশ্রমে আসিবার জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করেন। বিশেষতঃ কীর্তনের দিন সাংসারিক অনেক বড় বড় বাধা বিঘ্নও আশ্রমে আসিতে তাহাদের বাধা দিতে পারে না। তাহারা আরও বলেন বাসায় স্বামী ও পুত্র কন্যার অসুখ হইলে প্রথমেই তাহাদের চিন্তা হয় আশ্রমে যাওয়ার বুঝি বাধা হয়। ভূদেব বাবুর স্ত্রী কাল বলিতেছিলেন “সকাল বেলা হইতেই চিন্তা হয় কোন প্রকারে সংসারের বাধা ঠেলিয়া নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে

যাইতে পারিলেই হয়, তাহা না হইলেই যেন মনটা কেমন একটা হইয়া যায়।” বাস্তবিকই আমি দেখিতেছি রোদ্দ নাই রুষ্টি নাই প্রতিদিন আমাদের দেখিতে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। ইহার মধ্যে যে আমাদের কোনই গুণ নাই, মার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাই মূল কারণ তাহার বলেই ইহারা এমন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত বরদা চরণ সেন মহাশয়ের স্ত্রী বৃদ্ধা চোখেও ভাল দেখেন না কিন্তু প্রতিদিন আশ্রমে আসিয়া কীর্তনে যোগ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত মনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্ত্রীরও শরীর অসুস্থ, বয়সও হইয়াছে কিন্তু আশ্রমে আসা ও কীর্তনে যোগ দেওয়ার বাধা হইতেছে না। এই রকম সকলের ভিতরই একটা তীব্র ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোপীনীদেব কথাই মনে হয়। কাহারও কাহারও শ্বশুর শ্বাশুরীও আছেন তাঁহারা নিজেদের বাড়ীতে অপরভদ্র মহিলাকে ঢুকিতে দেখিলেই ভয় পান এই জন্ম যে এখনই ঘরের বধূটাকে নিয়া ঐ ভদ্র মহিলা আশ্রমে রওনা হইবেন। কেহ কেহ ইহা প্রকাশও করিয়া ফেলেন। সত্যিই তাই, কেহ কাহারও বাড়ীতে এখন বড় সাংসারিক আলাপ করিতে যান না আশ্রমে আসিবার সময়ই একজন আর একজনের বাড়ী গিয়া তাহাকে নিয়া আশ্রমে আসেন। আশ্রমে আসিয়াও তাহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতি স্নানভ বাক্যানাপাদি বড় হয় না সকলে মিলিয়া মায়ের ছবি সাজাইয়া নিয়া

কীর্তন করিতে বসিয়া যান। আমার দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে তাই ঢাকার মেয়েদের এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম। মার বিশেষ কৃপা ছাড়া এসব সম্ভবপর হইত না ইহাই আমার বিশ্বাস।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার :—

কালই মার নিকট হইতে টেলীগ্রামের জবাব আসিয়াছে লিখিয়াছেন “এই ৬ কালীমূর্তির এদেহরূপটি চিরসমাধি দেওয়া হউক, সেই কালীর উপর আর পূজা করার প্রয়োজন নাই।” আজ মার আদেশ মত গহবরের ৬কালীর মন্দিরের দরজা ইট দিয়া গাথিয়া দেওয়া হইল। আজ ১৩ বৎসরের কালীর পূজা বন্ধ হইল। ১৯২৬ সনে পূজা আরম্ভ হইয়াছিল আর আজ ১৯৩৮ সনে পূজা করিয়া দরজা বন্ধ হইল। সকলেরই প্রাণে একটা জীবন্ত জ্বলন্ত ভাবের আঘাত লাগিল।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার :—

মেয়েরা রোজই আসিয়া কীর্তনাদি করিতেছে কাজেই উৎসব এখনও যেন চলিতেছে। আজ ভূপতি দাদার চিঠিও আসিয়াছে লিখিতেছেন “আপনাদের টেলীগ্রাম পাইবার পূর্বেই মা আমাদের নিকট কালীর ঘটনা অনেক বলিতেছিলেন, তারপর টেলীগ্রাম পাইয়াই হাসিয়া বলিলেন “আমি ত তোমাদের কাছে পূর্বেই বলিতেছিলাম। যাক এখন এই কালীমূর্তিটির চিরসমাধি দেওয়া হউক খুকুনীকে আমি অনেক পূর্বেই এ কথা বলিয়াছি।”

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার :—

আজ ভোলানাথের দেহরক্ষা উপলক্ষ্যে সাধুদের ভাঙরা দেওয়া হইল এবং উদযান্ত কীর্তন হইল। সন্ধ্যা বেলায় মেয়েরা কীর্তন করিতেছে ভূপতি দাদার চিঠি আসিল মার গত কল্য হইতে আবার জ্বর আসিয়াছে। মা এ কয়দিন খুব কথাবার্তা বলিতেছিলেন শরীরও ভালই দেখা যাইতেছিল এর মধ্যে আবার জ্বর ও বমির ভাব হইয়াছে, জ্বর ১০২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতেছে। ১৫ই মে মার জ্বর হইয়াছে। এই খবরে সকলেই মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলাম। দুর্বল শরীর পুনঃ পুনঃ এইরূপ অসুখ হইতেছে কি করিবেন মাই জানেন। সকলের প্রাণেই একটা বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার :—

আজ বিকালে অনেক মেয়েরা কীর্তনে আসিয়াছেন। খুব কীর্তন হইল। দিন দিনই কীর্তনে মেয়েদের আনন্দ বাড়িতেছে। কোন কোন ভাগ্যবতী কীর্তনে মায়ের আবির্ভাবও অনুভব করিতেছেন। এখনও যেন উৎসবের জের যাইতেছে না অনেকেই প্রত্যহ আশ্রমে আসা যাওয়া করিতেছেন। মেয়েদের কীর্তনও প্রত্যহই চলিতেছে। ভূপতি বাবু আরও একটা বিশেষ কথা কুলদা দাদাকে লিখিয়াছেন এই যে পিতাজীর স্থানে স্বামিজী (অখণ্ডানন্দ) দীক্ষা প্রার্থীদেরই দীক্ষা দিবেন এই মায়ের কথা। স্বামিজী দীক্ষা দানে নিজেকে খুবই অনুপযুক্ত মনে করিয়া দীক্ষা

দিতে বড়ই নারাজ কিন্তু মায়ের ঐ কথায় দীক্ষা প্রার্থীদের দীক্ষা দিতে রাজি হইলেন। কয়েকজন মাত্র দীক্ষা প্রার্থী ছিলেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার :—

মার আর কোন খবর নাই। আমরা সকলেই মার জন্ম চিন্তিত। ভূপতিবাবু লিখিয়াছেন “শনিবার হরিদ্বার ভাঙার হইবে, রবিবার দেৱাত্ন ভাঙার হইবে তারপর মা কি করেন জানি না।” কাজেই মা কি করেন: জানিবার জন্ম সকলেই ব্যস্ত কিন্তু এখনও কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার :—

আজ কলিকাতা হইতে রামতারনবাবুর পত্রে জানিলাম শচীবাবু গত বুধবার মার কাছে দেৱাত্ন চলিয়া গিয়াছেন এবং সোমবারই ফিরিয়া আসিবার কথা। চার পাঁচ দিনের ছুটিতে গিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন কলিকাতায় বিল্লার মন্দিরে গত শনিবার ৩ভোলানাথের ভাঙার দেওয়া হইয়াছে। আজও মার কোনই খবর নাই।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার :—

আজ শচীবাবুর পত্র পাইলাম তিনি সোমবার কলিকাতা ফিরিয়া লিখিতেছেন। “মার কাছে দুই দিনের জন্ম গিয়াছিলাম কিন্তু এই দুই দিনের মধ্যেই খুব আনন্দ পাইয়াও নইয়া আসিয়াছি। মার জ্বর হইয়াছিল এখন ভালই আছেন।” আজ স্বামিজী দুই একজনকে দীক্ষা দিলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার :—

ভূপতিদাদা এক পত্রে লিখিয়াছিলেন “ঢাকার আশ্রমে ভোলানাথের একটা স্মৃতিরক্ষা করিতে হইবে। মাকে বিশেষ ভাবে পীড়া পীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আজ যোগেশদাদার পত্রে জানিলাম মা ভালই আছেন। হাতের ব্যথা অল্প অল্প আছে। ভাণ্ডারা শনিবারই ভাল মত হইয়া গিয়াছে। মা শীঘ্রই হয়ত স্থানান্তরে বাইবেন। আজ আর বিশেষ কোন খবর নাই।

কাল হইতেই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি চলিতেছে কিন্তু এর মধ্যেও মেয়েদের আশ্রমে আসা বাধা হইতেছে না। আজও তাহারা আসিয়া কীর্তন করিল। খুকির (নগেনদাদার মেয়ে) কোন কীর্তনেই আসিতে বাধা হয় না তাহার কীর্তনে মহা আনন্দ। খুকি, বেলুন (প্রফুল্ল বাবুর মেয়ে) এবং বেলুনের মা এরা ভাল গান করিতে পারে তাই তাহারা হারমোনিয়ম বাজাইয়া একজনের পর একজন নাম করে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নাম করেন। মার ছবিখানাকে ফুলে ফুলে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া নিয়া মেয়েরা নাম করিতে বসে। কানু ব্রহ্মচারীও শনিবার ছেলেদের নিয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি শনিবার ২৪ ঘণ্টা মা, মা নাম রক্ষা হইতেছে। কুলদা দাদা ভোর বেলা হইতে মন্দিরের পূজাদি এবং পাঠ হোম ইত্যাদি করিয়া বেলা ১১টায় অবসর হইয়াই অফিসে চলিয়া যান। তিনি এখন

ফল ও চরু খাইয়াই থাকেন। কান্দু শিব পূজা করে ও নিজের পড়াশুনা করে, অতুল ব্রহ্মচারীও ভোর বেনা হইতেই কাজে লাগিয়া যায়, ভোগরান্না, পাদপীঠ পূজা, সিদ্ধেশ্বরীতে শিব পূজা ইত্যাদি সেই করে। আশ্রমের কাজ সব নিয়ম মতই চলিতেছে। কালচাঁদ দাদা ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতাও আজ প্রায় ছয় মাস যাবত এই আশ্রমে আসিয়াছেন। কালচাঁদ দাদা তাঁর গর্ভধারিণীর সেবা, শ্রীশ্রীমায়ের কুটির পরিষ্কার ও আশ্রমের হিসাব পত্র সব রাখেন। ব্রহ্মচারীদের টাকা পয়সা ছোঁয়াও নিষেধ। গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকেই বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়াই আশ্রমে আসেন এবং হাত মুখ ধুইয়া মায়ের কুঠীতে কিংবা মন্দিরের ছোট ছোট খোপের মধ্যে ধ্যান জপাদি করিতে বসিয়া যান। অনেকেই সন্ধ্যারতির পর কীর্তন শেষ হইলে বাড়ী ফিরেন। সকলে চলিয়া গেলে আশ্রমে একটা শুদ্ধ গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতে থাকে। একেত স্থান মাহাত্ম্য তার মধ্যে প্রকাণ্ড ময়দানের নিস্তব্ধতা।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার :—

ঝড় বৃষ্টি অনবরত চলিতেছে। মনে হয় সব বুঝি ভাসাইয়া নিয়া যাইবে। এর মধ্যেও দুই একজন দেখা করিতে আসিয়াছে। আজ মার আর কোন খবর নাই।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার :—

আজ অমাবস্তা। পূর্বের নিয়ম মত আজ নিশা রাত্রিতে

মন্দিরে কুল দাদা মায়ের পূজা করিলেন। ঝড় ঝুপুটি সন্ধ্যার পর একটু কমিয়াছে দুই চার জন প্রসাদ নিতে আসিয়াছেন। হেমচন্দ্র নাগ মহাশয়ের স্ত্রী ও ধীরেন বাবুর মা এই রাত্রিতেও পূজা দিতে আসিয়াছেন, মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া তাঁহারা পূজা দেখিতেছেন ও জপ করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১২॥ টায় সকলে প্রসাদ নিয়া বাড়ী ফিরিলেন। আজ সন্ধ্যা বেলার দেয়াত্ন হইতে মানিকের পত্র পাইলাম সে ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার চিঠি লিখিতেছে আমরা আজ পাইলাম লিখিতেছে—“খুব সম্ভব মা আগামী কল্য বুধবার মুর্সোরী যাইতেছেন। আর্ঘ্য সমাজের ধর্মশালায় গিয়া থাকিবার কথা। মার সঙ্গে বীরেন দাদা, ভূপতিদাদা, অভয়, দাসু ও রুমা দেবী যাইতেছেন আমিও যাইতে পারি। মা নিশিবাবু ও মাসীমাকে সোলন পাঠাইয়াছেন এবং গোদাবরীকে হরিদ্বার সেবাশ্রমে পাঠাইয়াছেন।” সেই চিঠির ভিতরেই শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর কবিরাজ লিখিতেছেন “দিদি, আমি ও নিধু আজ ঢাকা রওনা হইতেছি রাস্তায় দুই একদিন দেবী হইতে পারে।” আর কোন খবর নাই।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার :—

আজ শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পৌঁছিবেন আশা করিয়া ছিলাম কিন্তু তিনি আসিলেন না। আমরা আগামী কল্য কলিকাতা রওনা হইব স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া মার খবর

সব শুনিয়া যাইব ভাবিয়া আগামী কল্য যাওয়া স্থগিত রাখিলাম।

১৬ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার :—

আজও সকালেই অমূল্য দাদা ও চারুবাবু (উকিল) আসিয়াছেন। মার গল্প অনেক হইল। তারপর ভগ্নীরা ও অনেকে আসিলেন। দুপুর বেলা হিরণ দিদি আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার প্রাণেও একটা জ্বালা হইয়াছে। সংসার তাঁহার ভাল লাগে না। মার সঙ্গ পাইবার জন্য প্রাণটা তাঁহার অনেক সময়ই হাহাকার করে। আহা! বিহার সম্বন্ধেও তিনি অনেক সংযমী হইয়াছেন। মার প্রতি আকর্ষণই তাহার কারণ। বলেন, দেখ, দিদি! মধ্যে মধ্যে মার সঙ্গ করিতে না পারিলে আমি আর সংসার করিতে পারিব না। এরপর আমি জোর করিয়াই চলিয়া যাইব সংসারের বাধা মানিব না। প্রাণটা ইহার বড়ই সরল।

বৈকাল হইতে না হইতেই যতীনবাবুর স্ত্রী, মনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্ত্রী, ভূপতি দাদার স্ত্রী, নগেন দাদার স্ত্রী, বরদা সেন মহাশয়ের স্ত্রী, অমূল্য দাদার স্ত্রী, অখিল বাবুর স্ত্রী, হেম বাবুর স্ত্রী, ধীরেন বাবুর মা কুলদা দাদার স্ত্রী প্রভৃতি অনেক ভগ্নীরাই মেয়েদের নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যহই ইহারা আসিতেছেন। আমাকে পাইয়াও যেন কত আনন্দ। মার কথা শোনেন, কীর্তনাদি করেন। আমরা সকলে নাম ধরে বসিলাম। ভাতারাও অনেকে আসিয়াছেন।

তঁাহারা স্বামী অথগোবিন্দজীর কাছে বসিলেন। ভূপতি দাদার
 স্ত্রীর শরীর খুবই খারাপ। কিন্তু তিনি এই অবস্থায়ও আসিতে
 বাধা করিতেছেন না। সকলকে নিয়ে বসিয়া মার গল্প করিতেছি।
 অমূল্য দাদার স্ত্রী একটা কথা বলিলেন, যাহা আমার বড়ই স্নন্দর
 লাগিয়াছে তাহা না লিখিয়া পারিলাম না। কথায় কথায়
 বলিতেছেন, “মাকে বেশী ভালবাসা যায় তঁাহার উপরই
 রাগ অভিমান আসে। তঁাহাকে কত গালি মন্দ দেওয়া
 হয়। তাইত দেখেন পূজার ঘরে গিয়া আজ মাকে কত
 বকিয়াছি। বলিয়াছি, মা, যদি দেখা না দিবে তবে প্রাণে
 এত হাহাকার দাও কেন? আর হাহাকারই যদি দিলে তবে
 দেখা দাও তোমার সঙ্গে যেন অনুভব করিতে পারি।
 সত্যিই দিদি, প্রাণে এমন একটা হাহাকার মার জন্য
 ওঠে যে কন্যাদের কথা স্বামীর কথা কিছুই মনে থাকে
 না। শুধু মার জন্যই একটা কেমন যেন ভাব জাগিয়া
 ওঠে যেন অস্থির হইয়া যায়। তাহার এই কথাগুলি বলার
 সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবটুকু দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।
 সত্য ও সরলতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অনেকের
 মুখে শুনি “মা কি করিলেন?” আমরা ত কিছুই বুঝি না।
 তাহাদের এইসব কথা শুনাইতে ইচ্ছা হয়। অনেকের
 প্রাণেই এই রকম একটা ভাব জাগিতেছে। অবশ্য কাহারও
 বেশী কাহারও কম। অনেক ভগ্নীদের মুখেই এখন এই
 ভাবের কথা অল্প বিস্তর শুনিতে পাইতেছি। অনেকেই

এখন নিজেদের বাড়াতেই শুদ্ধ ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে কৃতকার্যও হইয়াছেন।

আজও শিবশঙ্করবাবু আসিলেন না। আমাদের আগামী কল্যাণাও স্থগিত হইল। কারণ, তাঁহার মুখে মার বিস্তারিত খবর না জানিয়া যাইতে পারিতেছি না।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার :—

আজ সকালে শিব শঙ্কর কবিরাজ মাণিকগঞ্জ হইয়া আসিয়া উপস্থিত। তাঁর মুখে মার খবর পাইলাম। মাণিকের চিঠিতে জানিলাম মা মূর্সোরী গিয়াছেন। হাতের বেদনা বেশ আছে। আগামী পরশ্ব ১৯শে জ্যৈষ্ঠ স্ত্রীলোকেরা সকলে মিলিয়ে মায়ের ঢাকা ছাড়িবার স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া মাকে আলুনা ভোগ দিবে। প্রতি বৎসরই ইহা হইয়া আসিতেছে। বেবীদিদিই এই বিষয় প্রধান উদ্যোগী। এই ভোগের দিন উপস্থিত থাকিবার জন্য সকলেই আমাদের অনুরোধ করায় আমরা আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কলিকাতা রওনা হইব স্থির করিলাম।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার :—

আজ বিশেষ কোনও ঘটনা নাই।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার :—

আজ সকালেই স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ স্নানাদি করিয়া আসিলেন। এই ভোগটা কায়স্থ ও বৈষ্ঠরাই দেন। কারণ, তাঁহারা মাকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া খাওয়াইতে পারেন

না। সেই জন্য আজিকার দিনে লুটি ও আলুনী তরকারী তাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিয়া দেন। সর্বদা পারেন না বলিয়াই হটক বা যে কারণেই হটক আজ তাঁহাদের এই কাজে যথেষ্ট ঐকান্তিকতা দেখা যায়। তাঁহাদের আজ কত আনন্দ। সকলে মিলিয়া ভোগ পাক করিয়া বেলা প্রায় ১টার মায়ের কুটীরে মায়ের প্রতিমূর্তির কাছেই ভোগ দিলেন। আমিই ভোগ নিবেদন করিয়া দিলাম। তারপর সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। রাত্রিতেও প্রসাদ বিতরণ করা হইল। প্রায় ১০০।১৫০ শত লোক প্রসাদ পাইল। বৈকালে মেয়েদের কীর্তন হইল।

আমরা আগামী কল্য চলিয়া যাইব বলিয়া সকলেই প্রায় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মার চরণে সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটা আকর্ষণ সকলেই অনুভব করিতেন। এই আকর্ষণ অনেক সময়েই জন্ম সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাই মা বলেন “জন্ম সম্বন্ধ হইতে ধর্ম সম্বন্ধই বড়।” বাস্তবিকই তাই দেখিতেছি আমাদের পাইয়া এখানকার মায়ের ভক্তেরা যেরূপ আদর যত্ন করিতেছেন, দেখা করিবার জন্য প্রত্যহ যে কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রত্যহ আশ্রমে আসিতেছেন, আত্মীয়দের নিকট হইতে এইরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাওয়া সুলভ নয়। ধর্মের বন্ধনই শুধু এইরূপ সুন্দর হয়। মা যে এই বন্ধনের মূল, কাজেই

সবই সুন্দর। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে আমাদের জন্য আশ্রমে রহিলেন। অল্পবয়স্কা মেয়েরা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া কত ভাবে তাহাদের ব্যথা জানাইতে লাগিল। কুলদা দাদার ছোট্ট মেয়েটি বাড়ী যাইবার সময় বলিতেছে, “খুকুনী দিদি আমাদের কিন্তু ভুলিবেন না। আবার শীঘ্র আসিবেন ত?” মার করুণা এই সব ঘটনার মধ্যেই, লক্ষ্য করিয়া আমি অবাক ও মুগ্ধ হইতেছি। কত ভাবে তিনি করুণা ছড়াইয়া যাইতেছেন। আমরা অন্ধ তাই দেখি না বুঝি না। আগামী কাল ষষ্টি পূজা, তাই অনেকেই কাল আমাদের রওনা হইবার সময় আসিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ সকালেই হিরণ দিদি আসিয়া উপস্থিত। কাল রাত্রিতে তাহার ঘুমই হয় নাই। সব কাজ ফেলিয়া ভোরেই চলিয়া আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে নগেন দাদা মেয়েকে নিয়া আসিলেন। গণেশবাবুর স্ত্রী কোন প্রকার পূজাদি দিয়া আসিয়া উপস্থিত। মনমোহনবাবুর স্ত্রীর শরীর ভাল নয় তিনি রোদ্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়াছেন। অমূল্য দাদা, শিবশঙ্কর কবিরাজ সকলেই আসিলেন। আরও অনেকে আসিয়াছেন। যতীনবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি কেহ কেহ আসিতে না পারায় দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা রওনা হইলাম। কানু, জটু, মাধন (চিন্তাহরণ

বাবুর ছেলে) প্রভৃতি কয়েকটা ছেলে আমাদের নিয়া ফেশনে উঠাইয়া দিতে চলিল। হিরণ দিদি আমরা রওনা হইবার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন। ফেশনে যাইয়া দেখি অতুলবাবু (ভ্রমরের পিতা) চারুবাবু (ভ্রমরের কাকা) আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন সেই সঙ্গে হিরণ দিদি ও মেয়ে বেলুনকে নিয়া আবার আসিয়াছেন। দেখিতেছি মাকে না পাইয়া ইহাদের ব্যকুলতা কত বাড়িয়া গিয়াছে। আমাকে পর্য্যন্ত ছাড়িতে চায় না। মায়ের করুণা কি ভাবে কাজ করিবে কেহ বলিতে পারে না। স্ত্রীদিদি (বেবীদিদির ভ্রাতৃবধু) আমাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিলেন। আমি এবার লক্ষ্য করিলাম ঢাকায় অনেক স্ত্রীলোকই সাংসারিক কাজের মধ্যেও আত্মনোতির একটা কামনা বেশ জাগিয়াছে। তাঁহারা অনেকেই গোপনে বেশ কাজ করিতেছেন। মনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্ত্রী এক কন্যার মৃত্যুতে বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়েতে মা একবার ঢাকা যান। তাহাকে অনেক কষ্টে মার নিকট উঠাইয়া আনা হয়। মার কাছে সেইদিন যাওয়ার পর হইতেই তিনি ভিতরে ভিতরে একটা শক্তি অনুভব করেন। এতদিন শয্যাগত অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এর পর হইতে রোজই মার কাছে যাইতে থাকেন। মা চলিয়া আসিবার সময় বলেন “মা, আপনি ত চলিয়া যাইতেছেন এখন আমি কি ভাবে থাকিব? আবার ত কন্যার শোক

আমাকে অধীর করিয়া তুলিবে। এ কয়দিন ত আমি বেশ ছিলাম।”

মা একান্তে তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন “না আর হইবে না, তুমি ভগবানের নাম কর।” বাস্তবিকই এরপর হইতেই তাঁর একটা খুব পরিবর্তন আসিয়াছে। তিনি এখন সংসার দেখেন না বলিলেই হয়। পূজা জপ ইত্যাদিতে বেশী সময় অতিবাহিত হয়। আশ্রমে প্রতি কীর্তনে যোগ দেওয়া আমরা ঢাকা গেলে রোজ আশ্রমে আসা চাই-ই। আর শুধু এই প্রার্থনা “ভগবানের প্রতি যেন ভক্তি হয়।” ইনি বাজিতপুরেই মার সজ্জলাভ করিয়াছেন। মার মুখে শুনিয়াছি ইনি খুব পাকা গৃহিনী। কিন্তু এখন আর সাংসারিক কাজ ইহার ভাল লাগে না। বলেন, “চিরকালই কি সংসারের চাকুরীই করিতে হইবে?” মার করুণায় অনেকের প্রাণেই একটা ধর্মের ভাব জাগিয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাগিতেছে। আমরা অসিবার পূর্বেই মানিকের পত্র পাইয়া আসিলাম সে লিখিতেছে, “মা হয়ত আজ কালের মধ্যেই রায়পুর গিয়া থাকিবেন। আমাকে লক্ষ্যে ফিরিয়া বাইতে আদেশ করিয়াছেন।”

২১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ আমরা কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম, শচীদাদার মোটরেই বিরলার মন্দিরে আসিলাম। অসিবার পথে শচীদাদার বাসা হইয়া তাঁহার মুখে মার কথা কিছু শুনিয়া আসিলাম।

আজ সন্ধ্যার খবর পাইলাম, শচীদাদার কাছে ভূপতিদাদার চিঠি আসিয়াছে না গত মঙ্গলবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রায়পুর আসিয়াছেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজ বিশেষ কোন খবর নাই।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজও বিশেষ কোন খবর নাই।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

আজ বীরেন দাদা রায়পুর হইতে লিখিতেছেন, “মা রায়পুরেই আছেন। মার শরীর খুবই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু হাসিমাখা মুখ ও তাহার মধুরতা একভাবেই আছে। লিখিতেছেন, “কিন্তু মাকে দেখিয়া কেমন একটা আশঙ্কা জাগে যাহা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছি না।”

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

গত দুই দিনের আর বিশেষ কোনই ঘটনা নাই। আজ প্রাতে ভূপতিদাদা মার নিকট হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাহার নিকট শুনিলাম মার শরীর একটু ভাল বোধ হইতেছে। মা রায়পুরই হয়ত কয়েক দিন থাকিতে পারেন। আরও বলিয়া দিয়াছেন, “খুকুনীর একটু দুঃখ ও অভিমান হইয়াছে কারণ আমার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছি, তাহাকে বলিও সে যেন দুঃখ না করে। তাহাদের মঙ্গলের জন্তই ইহা করা। ইত্যাদি

ইত্যাদি। মার এই কথাটুকুর ভিতরেও কত মিষ্টতা পাইয়া দুঃখ মিশ্রিত আনন্দে চোখে জল আসিল।

মা বাহা করেন মঙ্গলের জন্মই সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাণ তাহা মানে না। ব্যথা অভিমান তথায় পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে। আবার বিচারে তাহা শান্ত হয়।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজও সকালে ভূপতি দাদা আসিয়া মার কথা কিছু কিছু বলিলেন। কথায় কথায় বলিলেন, “আমি ও বীরেন দাদা মাকে ধরিয়াছিলাম তোমার শরীরটা ভাল করিতে হইবে। মা একদিন কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন, “দেখ তোমরা যেমন এই শরীরটা ভাল হউক এই কামনা করিতেছ আবার কেহ কেহ এই শরীরটা পঙ্গু হইয়া থাকুক একবারে শেব হইয়া যাক ইত্যাদি অনেক কামনা করিতেছে। সে সব ভাবও এই শরীর গ্রহণ করে। সেই তীব্র বিদেব ভাব কোন কোন সময় তোমাদের ভাব হইতেও যেন প্রবল হইয়া ওঠে। তাহাদেরও যে এ শরীরটা!”

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

আজ মার একটা ভক্ত সঙ্গীক আসিয়া আমাকে রামকমল ভট্টাচার্য্যের কীর্তন শুনাইতে এক বাড়ীতে নিয়া গেল। মানভঞ্জন গান হইল। কীর্তনের মধ্যে একটা কথা বড়ই সুন্দর লাগিল। মায়ের কথার সঙ্গে বেশ

মিলিয়া গেল তাই লিখিতেছি। গায়ক বলিতেছেন, “সখীরা রাধিকাকে বলিতেছেন “তুমি রাজার ঝিয়ারী বয়সে কুমারী।” এই কুমারী শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন। “কুমারী তিন রকমের হয়; এক যাহার বিবাহ হয় নাই; দ্বিতীয় বিবাহ হওয়ার পরও যিনি রজস্বলা হন নাই, তৃতীয়তঃ যাহার বয়সোচিত কুভাব কখনও জাগে নাই। ‘কু’ যাহার মরিয়া গিয়াছে তিনিই কুমারী, রাধিকা এই শেষোক্ত প্রকারের কুমারী।” তখন আমার মনে হইল মাও অনেক সময় কথাগুলো ভক্তদের নিজকে দেখাইয়া বলেন, “তোমাদের এই মেয়েটা যে কুমারী তা বুঝি তোমরা জান না?” আবার ভোলানাথের মৃত্যুর পরও নাকি কি কথায় বলিয়াছেন, “আমি প্রথমেও কুমারীই ছিলাম এখনও কুমারীই আছি তবে, দেখিতেছ শরীরটার বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবিক কুমারীই আছি। কুমারীরাও ত শাঁখা সিন্দুর পরে তাই, তোমরা পরাইয়া দিয়াছ—পরিতেছি।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার।

আজ রায়পুর হইতে বীরেনদাদার এক পত্র পাইলাম, লিখিয়াছেন “মা বেশ হাসিখুসি আছেন। সকালে একটু দুধ খান, দুপুরে দুধরুটি ও একটু তরকারী খান, বৈকালে কখনও কখনও একটু ফল এবং রাত্রিতে জলে নুন-ছাড়া তরকারী সিদ্ধ ও একটু দুধ খান। মধ্যে মধ্যে পুরাণ কথা শোনান

শুনি জিজ্ঞাসার পাঠ আমার উঠিয়া গিয়াছে। আমি শুধু মার কথা শুনিয়া যাই” ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্তনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী কাল মার কাছে চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া আসিবেন। শিশির আজ তিন দিন হয় বলিতে গেলে একবস্ত্রে তারাপীঠ চলিয়া গেল। তাহার ভিতর কেমন একটা ভাব আসিয়াছে। ছেলোটী বাহিরে দুর্ফামী ইত্যাদি করিলেও ভিতরে বেশ একটা সুন্দর ভাব আছে। অনেক সময় একভাবে বেশ বসিয়া থাকিতে পারে। কবে ফিরিবে কিছুই বলিতে পারিল না।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার :—

আজ কোন বিশেষ ঘটনা নাই।

৩রা আষাঢ়, শনিবার :—

আজ বীরেন দাদার পত্রে জানিলাম, যা ১০।১২ দিন মাত্র রায়পুরে থাকিয়াই দেৱাছন আশ্রমে চলিয়া আসিয়াছেন। মনুখ বাবু মার আদেশে সংসার ছাড়িয়া দেৱাছন আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মায়ের ডান দিকের হাতের গ্লান্তু ফুলিয়া ছিল সেই দিকের পায়েও ২দিন যাবত বেদনা অনুভব করিতেছেন।

৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার :—

আজ কয়েকদিন যাবত মায়ের আর কোন খবরই পাইতেছি না। আমরা বইয়ের কাজের জন্ত কলিকাতাতেই অপেক্ষা করিতেছি।

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জী মহাশয়ের
শ্রী মায়ের কাছে যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।

আজ বেবীদিদির কথা মনে হইতেছে তাঁহার জীবনের
ঘটনাবলীও উল্লেখ যোগ্য বিষয়। পূর্বেই লিখা হইয়াছে
হয়ত তিনি মায়ের আদেশ যথা সাধ্য পালন করিতে চেষ্টা
করেন। ঢাকাতে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আশ্রমে যাইয়া
মায়ের নির্দেশ মত জপাদি করিয়াছেন। রবিবারের মেয়েদের
কীর্তনে তিনিই প্রধান উদ্যোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।
অনেক মেয়েকে তিনি নিজে গাড়ী করিয়া আশ্রমে নিয়ে
আসিয়া কীর্তন করাইয়াছেন। ধর্মের দিকে তাঁহার যথেষ্ট
অনুরাগ দেখিয়াছি। ৬ জ্যোতীষ দাদার মৃত্যুর কয়েক দিন
পরই কলিকাতা হইতে বেবীদিদি মায়ের কাছে দেৱাভূন
যাইবার জন্য প্রস্তুত রওনা হইবার জন্য হইতেছিলেন এর
মধ্যে ঢাকা হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন নলিনী বাবু (বেবীদিদির
স্বামী) হঠাৎ মারা গিয়াছেন। বেবীদিদির আর দেৱাভূন যাওয়া
হইল না। কলিকাতাই রহিয়া গেলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন
পর বেবী দিদির বড় ছেলে সুকুমার বাবু (ইনি I. C. S.
পাশ করিয়া মধ্য প্রদেশে জজ সাহেবের পদে নিযুক্ত
হইয়াছিলেন) যথারীতি পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করিয়া মাকে নিয়ে
কার্য্যস্থলে চলিয়া যান। বেবীদিদির প্রতি তাঁহার এই পুত্রের
যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা, কুস্ত
স্নানের পর দেৱাভূন পৌঁছিবার পর দিন আমরা মার সহিত

মুসৌরী বেড়াইতে গিয়া শুনিলাম খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে ১লা বৈশাখ স্কুমার বাবু মোটর উল্টয়া পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছেন। এই ঘটনা শুনিয়া বেবীদিদির জন্ম আমরা বড়ই ব্যস্ত হইলাম। প্রায় ৬মাসের মধ্যে স্বামী পুত্র হারা হইয়া না জানি তাঁহার কি ভয়ানক অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার এক পত্র মায়ের কাছে আসিল। প্রথমেই লিখিয়াছেন “মা, খোকাকেও নিলে। যাক এখন কোথায় থাকিব কি করিব সব লিখিয়া জানাও” ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার এই পত্র পাইয়া আমরা মনে করিলাম অধিক শোকে হয়ত মাথাটা ঠিক নাই। কিন্তু তারপর আরও এক পত্র আসিল। অস্থিরতা নাই শান্তভাবে মায়ের উপদেশ চাহিয়াছেন। মাও আমাদের দিয়া বাহা বলিবার লিখাইয়া দিলেন। তারপর শুনিলাম বেবীদিদি ছেলের মৃত্যুর পর এমন ধীর স্থির যে সকলে দেখিয়া অবাক হইতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার মস্তিষ্কে এত বড় ব্যাধাটা ধারণা করিবার মত হয়ত শক্তিই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন তিনি আত্মাত্মিক জীবনে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এবার কলিকাতা আসিয়া আমি বেবীদিদিকে দেখিতে গেলাম। আমাদের দেখিয়াই হাসিয়া দোড়াইয়া আসিলেন ও আমাদের জড়াইয়া ধরিলেন। আমিও অবাক। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে একটা ঘরে গিয়া বসিয়া অনেক কথা বলিলেন। ছেলের

মৃত্যুর সব ঘটনা বলিলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চোখে এক ফোটা জল দেখিলাম না। বলিতেছেন “প্রথম দিন মৃতদেহ বাসায় আনিলে খুব কাঁদিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর হইতে আর কান্না আসে নাই, কেহ বলে আমার মাথা ধরাপ হইয়া গিয়াছে, কেহ বলে আমি আধ্যাত্মিক জীবনে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছি কিন্তু আমি জানি মায়ের অসীম রূপায়ই আমার এই অবস্থা। দেখুন দিদি, ব্যথা আমার বুকে ভরিয়া আসিলেই কেমন যেন পাংলা হইয়া যায়। আমি বেশ বুঝি মা আমাকে এতবড় সব শোকের ভিতর দিয়া নিতেছেন সত্য, কিন্তু আমাকে যেন ধরিয়া রাখিয়াছেন। শোকে আমাকে কিছুই করিতে পারিতেছে না। বাস্তবিকই আমি বেশ শান্ত আছি।” এমন ছেলের মৃত্যুর পর মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া মার করুণা যে ইনি পাইয়াছেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। বেবী দিদির শান্ত, সৌম্য মূর্তিটি দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। এই দেখা হওয়ার পর দিনই আবার শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাসায় কীর্তনে বেবীদিদি আসিলেন। আমরাও গেলাম। মায়ের এই করুণা পাইয়া তাঁহার রূপ যেন কত বাড়িয়া গিয়াছে, পবিত্র ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি যখন কীর্তনে স্থির ভাবে বসিয়াছেন, সেই পবিত্র মূর্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি এখান হইতে পুরী গিয়াছেন। মায়ের কাছে যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মা

তখন যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবার ভূপতি দাদার নিকট মা বেবী দিদিকে যাইবার অনুমতি পাঠাইয়াছেন। মায়ের করুণা এই ভাবে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়ুক এই মায়ের চরণে প্রার্থনা। বেবীদিদি মায়ের করুণা পাইয়াই শয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই। মায়ের এত করুণার যিনি অধিকারী হইয়াছেন তাঁহার কথাটা উল্লেখ যোগ্য মনে করিয়াই আজ এসব লিখিলাম। নিত্য নিয়মিত কাজে বেবীদিদির বড়ই নির্ভা সর্বদাই দেখিয়াছি। সেই নির্ভাই হয়ত আজ তাঁহাকে এই অবস্থায় আনিয়াছে।

১০ই আষাঢ় শনিবার :—

স্বামী শঙ্করানন্দ জীর খুব অস্থখ হওয়ায়, যোগেশদাদাকে দিয়া তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কারণ কাশী আসিতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাশী হইতে যোগেশদাদা কলিকাতা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় ৩৪ ঘণ্টা মায়ের আলাপ হইল। তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীর সহিত দেখা করিতে দেশে (খুলনা) চলিয়া গেলেন। তথায় দুই এক দিন থাকিয়া কলিকাতা হইয়া দেৱাছন চলিয়া যাওয়ার কথা। তাঁহার মুখে শুনিলাম, মা রায়পুর হইতে দেৱাছনে আসিবার সময় কমলা কান্ত ও রুমা দেবীকে রায়পুরই থাকিতে বলেন। বলিলেন “আমারত ঠিক নাই হয়ত আবার এখানেই আসিব তোমরা থাক যদি অত্নত যাওয়া হয় তোমাদের নেওয়াইব।” কমলাকান্ত মাকে

ছাড়িয়া থাকিতে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকায় মা বলিলেন—
 “আচ্ছা চল সকলেই যাই।” এই বলিয়া সকলকে নিয়াই
 দেৱাতুলনে আসিলেন। এই ঘটনার পর যোগেশদাদাকে নাকি
 বলিয়াছেন “এই যে কমলা কান্ত কথা রাখিলনা ইহারও একটা
 ধাক্কা আসিবে কিন্তু তাহা কমলাকান্তর সহ করা দায় তাই
 এই শরীরটার (নিজের শরীর দেখাইয়া) উপর দিয়াই
 যাইবে।” মার এই ভাবের কথা আরও লিখা হয়ত
 হইয়াছে। শুধু কমলাকান্ত বলিয়া নয় আমরা এই ভাবের
 অপরাধ সকলেই করিতেছি আর দয়াময়ী মা সব ধাক্কা
 নিজের উপর নিয়া নিতেছেন—মায়ের শরীর স্তম্ভ থাকিবার
 আশা আমরা করিব কি করিয়া? মা ত সব সময়ই বলেন
 “তোমাদের ভাবেই আমার শরীর পুষ্টি হইতেছে আবার
 তোমাদের ভাবেই শরীর এইরূপ হইতেছে। তোমার এ
 শরীর রাখিলে থাকিবে না হয় যাইবে আমারত ইচ্ছা অনিচ্ছা
 কিছুই নাই।”

১১ই আষাঢ়, সোমবার :—

আজ নরেন দাদা (চৌধুরী) আমাদের সহিত দেখা
 করিতে আসিয়াছেন, তিনি কোনও কার্যোপলক্ষে কলিকাতা
 আসিয়াছেন। তাহার মুখে শুনিলাম তিনি ৪।৫ দিন হয়
 দেৱাতুলন হইতে সাধনের পত্র পাইয়াছেন তাহাতে জানিয়াছেন
 মা রায়পুরে যাইতেছেন। তাহার মুখে আরও একটি উল্লেখ
 যোগ্য ঘটনা শুনিলাম, তাহা লিখিতেছি। তিনি বলিতেছেন

“কৈলাস যাওয়ার সময় এই মন্দিরেই শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় যখন মাকে গান শুনাইয়া বলিলেন “মা, আর কবে আপনাকে গান শুনাইব ? মা তখন বলিলেন “তুমি যখনই এই মেয়েটার কথা মনে করিয়া গান করিবে তখনই আমি তোমার গান শুনিব ।” মায়ের এই কথা কয়েকটি আমার প্রাণে বাজিল । আমার ইচ্ছা হইল গান শিখিব তবেইত মা কাছে আসিবেন । কয়েক দিন চেষ্টা করিলাম । কিন্তু বৃদ্ধকালে আর কি ঐ সব শিখা হয় ? ছাড়িয়া দিলাম । মাকে কৈলাস রওনা করিয়া দিয়া কিরিবার পথে হরিরামের সঙ্গে গাড়ীতে বসিয়া মা মা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিতেছি, হঠাৎ আমার মনে হইল মা শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কে বলিয়াছিলেন মাকে মনে করিয়া গান করিলেই মা কোলের কাছে থেকে গান শুনিবেন । তবে আমি মনে করিলেও মা আসিয়া গান শুনিবেন, এই ভাব মনে হইল যেন মা কোলে আসিয়া বসিয়াছেন এর মধ্যেই সত্য সত্যই দেখি ঠিক কৃষ্ণ মূর্তির মত একটি ছোট ছেলে আমার কোলে বসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার গান শুনিতেছেন আমার চোখে খোলা পরিষ্কার দেখিতেছি, আমার তখন কেমন একটা ভাব হইয়া গেল । খানিক সময় এই মূর্তি রহিল তারপর গানও বন্ধ হইল মূর্তিও মিলাইয়া গেল ।” এই কথাটি বলিয়া বলিলেন “আমি এ কথাটি এখনও সকলকে বলি নাই আজ বলিলাম ।” পূর্বেই লিখা হইয়াছে ইহারা মাকে দর্শন করিবার পর হইতেই স্বামী স্ত্রী

সংসার ফেলিয়া অনেক সময় মার সঙ্গ করিয়াছেন। কথায় কথায় কৈলাস যাওয়ার সময় ইঁহারা স্বামী স্ত্রী যে আলমোড়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন সেই সময়কার কথা বলিতেছেন “দেখ দিদি” সেবার এমন অবস্থা হইল যে মাকে ছাড়িয়া আমরা থাকিতে পারিব না, অথচ ছেলে মেয়ে গুলিকে কাহার কাছে রাখিয়া যাই? শেষে ঘরে মার ছবি টাঙ্গান ছিল সেই দিকে চাহিয়া বলিলাম, “মা তুমি রহিলে ছেলে মেয়েদের দেখো আমরা তোমারই উদ্দেশে চলেছি” এই বলে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে গিয়ে মাকে পেলাম। বড়ই প্রাণের আবেগের সহিত নরেনদাদা এই কথাগুলি বলিলেন, আমারও বুকে বাজিল তাই লিখিতে বসিয়াছি।

১৩ই আষাঢ় মঙ্গলবার :—

আজ ঢাকা হইতে হিরণদিদির পত্রে জানিলাম তিনিও আশ্রমে শুনিয়া আসিয়াছেন যে মা পুনরায় রায়পুর গিয়াছেন। এখনও আমরা কোন চিঠি পত্র পাই নাই। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মার কাছে যাইবার জন্য এখানে আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়া মার কাছে রওনা হইয়া গেলেন।

২৩শে আষাঢ় শুক্রবার :—

মা রায়পুরেই আছেন খবর পাইতেছি। বীরেনদাদা ও নরেশদাদা মার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। নরেশদাদা গত পরশু আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম মার

শরীর দিন দিনই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। হাতের ব্যথাটাও Palpitation খুবই আছে। আভাষে প্রকাশ পাইয়াছে কোনও ভক্তের ইচ্ছায়ই মার এই রোগ। মা বলেন, “বাহার এই শরীরটার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ভাব তাহার ভাব গুলি কোন সময় আবার তোমাদের চেয়েও বেশী এই শরীরটার উপর কাজ করে কারণ তাহাদের ভাবের তীব্রতা বেশী হয়। এমনও আছে প্রতি মুহূর্তে তীব্র বিদ্বেষ ভাবের মধ্য দিয়া সে এই শরীরটার বিষয় চিন্তা করিতেছে। কাজেই তোমরা যে ভক্ত ভক্ত বল ভাবের তীব্রতাও অনবরত এক চিন্তার খারায় সেই বড় ভক্ত। কাজেই তাহার বিদ্বেষ ভাবের ইচ্ছা গুলিও এই শরীরটার মধ্যে কাজ করিবেই। সবই যে আনন্দ। এক তাঁরই ত সব মূর্তি। তোমাদের ভাষায় বলিতেছি “বিদ্বেষ ভাব” কিন্তু আমার কাছে সবই এক ভাব। এক তাঁর ভিতর হইতেই সব ভাবই ত আসিতেছে, সেই গ্রহণ করিতেছে। আবার ইহাও জানিও কাহারও কোন ভাবই এই শরীরকে কিছু করিতে পারেনা। আমরা মার এই ভাবের কথায় ভয় পাইতেছি, কারণ এই ভাবে সকলের ভাব গ্রহণ করিলে শরীর থাকিবে কি করিয়া? জানিনা মার কি ইচ্ছা। ভক্তেরা সকলেই মার জন্ম চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন।

কাল রাত্রিতে শচীদাদা ও যতীশদাদা আসিয়াছিলেন। মার কথা অনেক হইল। কথায় কথায় শচীদাদা বলিতেছেন “দেখুন দিদি! মার ইচ্ছা যে অপ্রতিহত, তাহার অনেক

প্রমাণ আমার জীবনেও আমি পাইয়াছি।” তারপর কথা হইল “হয়ত অনেক সময় মা আমাদের সঙ্গে ব্যবহারিক ভাবের কথা বলেন, তাহা না বলিলে আমাদের মাকে ধরা ছোয়া অসম্ভব হইত, কিন্তু বাস্তবিক মা যখন নিজের ভাবে কোন কথা বলেন তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হইবেই। তাহা অন্যথা হইবার নয়।” শচীদাদা আরও বলিতেছিলেন “মায়ের আরও একটা দিক দেখিলে দেখা যায় তাঁহার ভিতরে কোন তারই বাজিতেছেন। অর্থাৎ তাঁর কোনই সঙ্কল্প বিকল্প নাই কিন্তু আবার তাঁর ভিতরই সব আছে, যে যেখান হইতে যে ভাবের আঘাত করিতেছে তাঁর ভিতরে তাহা বাজিয়া উঠিতেছে। তাই ত বিদ্বেষীর বিদ্বেষ ভাবও সেখানে গিয়া বাজিতেছে, আনন্দে তাহাও গ্রহণ করিতেছেন, শরীরে তাই ফুটাইতেছেন।” ভাবের আবেগে শচীদাদা শিব মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া এ সব বলিতেছেন আমরাও মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছি। তিনি বলিতেছেন “যে কোন সাধুর স্থানে যাই তাঁহাদের একটা সুর আছে দেখিতে পাই, কেহ গিয়া সেই সুরে যোগ দিলে তাঁহাদের আনন্দ কিন্তু আমার মায়ের কাছে দেখিতে পাই সব সুরই আছে, আবার কিছুই নাই, যে কোন সুর বাজাও তাই তাঁহার মধ্যে আছে তাহাতেই তাঁর আনন্দ। এমন জিনিষের কি আর তুলনা আছে, মার তুলনা যে শুধু মাই।” জ্যোৎস্না রাত্রি নির্জজন শিব মন্দির, ভক্তের প্রাণের কথা বড়ই চিত্তাকর্ষক হইতেছিল। মার সান্নিধ্য যিনি যত

বেশী লাভ করিবেন তিনিই ততটা এ সব কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

এখন কিরণ দিদি, কমলাকান্ত, রুমাদেবী ও অভয় মার কাছে আছে। নরেশদাদা খুব আনন্দ পাইয়া আসিয়াছেন বলিলেন। যিনি যত মার সঙ্গে মিশিতেছেন তিনিই তত বেশী গাঢ় একটা আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার :—

মার খবর মন্মথবাবু ও কমলাকান্তের চিঠিতে বাহা পাই তাহাতে শুনি মার হাতের ব্যথা আছেই শরীরও যথেষ্ট দুর্বল। রায়পুরেই আছেন। মার ভক্তদের মধ্যে প্রায় সকলেই একথা বলেন যে “খুকুনীদিদি মার কাছে গেলে আমরা খুব আনন্দিত হই এবং মার শরীরের জন্ত অনেকটা চিন্তিত থাকি” কিন্তু জানি না কেন আমাকে দূরে রাখিয়াছেন। নরেশদাদা এবারও গিয়া মাকে বিশেষ অনুরোধ নাকি জানাইয়াছিলেন যে “মা তুমি খুকুনীদিদিকে আনিয়া নেও” মা নাকি জবাব দিয়াছেন “আমি কি জানি না সে আসিলে শরীরটার সব রকম বড়ই হয়, কিন্তু তাহাদের মঙ্গলের জন্তই তাহাদের দূরে রাখিতে হইয়াছে।” মার কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি বা যুক্তি কাহারও নাই। সকলের নিকট হইতেই এই সম্ভাবটুকু পাইয়াও আমি মার বিশেষ কৃপাই অনুভব করি। মার কাছে প্রার্থনা করি মা যেন তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যাইবার শক্তি দান করেন। দূরে থাকিবার ব্যথায়

যেন তাঁর আদেশ কখনও লঙ্ঘন না করি। তিনি যে সব সময়ই বলেন আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থাকেন। আমরা যেন তাহা অনুভব করিতে পারি এই প্রার্থনা।

১লা শ্রাবণ রবিবার :-

রায়পুর হইতে কমলাকান্তের এক পত্র আসিয়াছে। আমাকে লিখিয়াছে। তাহাতে জানিলাম মা ইতি মধ্যে দেৱাত্মন গিয়াছিলেন। আশ্রমে ৩৪ দিন ছিলেন, বীরেন দাদার ও নরসিংহ ভাইয়ের সঙ্কল্প ক্রমে আশ্রমে মায়ের আরোগ্য কামনায় শ্রীযুক্ত মন্থবাবু হোম করিয়াছেন, কীৰ্ত্তনাদিও হইয়াছে। আবার মা রায়পুর ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন সঙ্গে অভয়, রুমাদেবী, সাধন, কমলাকান্ত ও নিগমানন্দ স্বামীরা একটি শিষ্য আছেন। অভয়েরও এক পত্র কয়েক দিন যাবত আসিয়াছে সে লিখিয়াছে “মায়ের শরীর অসুস্থই আছে মা। এখনও বলেন তোমরা নাম করিলেই আমার শরীর সুস্থ হইবে” তাই আমার মনে উঠিয়াছে আমরা প্রত্যেকে মায়ের আরোগ্য কামনায় লক্ষ জপ করিব। শ্রীযুক্ত মন্থবাবু বলিয়াছেন “মা নাম জপই ভাল প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া যে কয় দিনে লক্ষ জপ শেষ হয় তাহাই করিবে”। মায়ের নিকট এ কথা বলিয়াছিলাম মা বলিয়াছেন “তোমরা যখন মনে কথাটা উঠিয়াছে লিখিয়া দে যাঁহার ইচ্ছা হয় করিবে।” অভয়ের এই পত্র পাইয়া সকলেই লক্ষ জপ আরম্ভ করিবেন স্থির হইয়াছে। সর্বত্র ভক্তদের মধ্যে খবর দেওয়া হইতেছে। জপে চিত্তশুদ্ধ হইলে

মায়ের কাছেই প্রার্থনা করা “মা তুমি আরোগ্য হইয়া ওঠ
ভক্তদের প্রাণের কথা এই”।

৫ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার :—

আজ দুপুরে কিরণ দিদি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি দুই দিন হয় কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। মাকে তিনি কিষণপুর আশ্রমে দেখিয়া আসিয়াছেন মা সেই দিনই রায়পুর চলিয়া যাইবেন স্থির হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময় কিরণদিদি উপস্থিত ছিলেন। শুনলাম মার শরীর এখন একটু ভাল।

১১ই শ্রাবণ বুধবার :—

কয়েক দিন হয় অভয়ের টিঠি পাইয়াছি মা সোলন গিয়াছেন। আজ সিমলা হইতে পঞ্চদাদার টেলিগ্রাম পাইলাম লিখিয়াছেন মা সিমলা আছেন আমাদের অত্ন রাত্রিতেই সিমলা রওনা হইতে আদেশ দিয়াছেন। আমরা আজই রওনা হইতেছি।

১৪ই শ্রাবণ শুক্রবার :—

আজ গাড়ীর কিছু গোলমাল হওয়ায় আমরা বেলা ৩টার মার চরণে আসিয়া পৌছিলাম, প্রায় ২৥ ঘণ্টা দেরী হইয়াছে। আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা হাসিয়া বলিলেন “আজ তোমরা আস আস বলিয়া শুই নাই, ১টা হইতে বসিয়া আছি।” মায়ের এই স্নেহে কথায় এতদিন দূরে রাখার দুঃখ, ব্যথা, অভিমান যেন মুহূর্তে কোথায় চলিয়া গেল। মায়ের

ভক্ত অনেক ভাই বোনও আমাদের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আমরা আসিতেই খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শুনিলাম ভক্তেরা মাকে বলেন “মা, দিদিকে আনাও দিদি না আসাতে ভাল লাগিতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।” মা অনুমতি দিতেই তাঁহারা আমাদের টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। আমি আসলে মা তাঁহাদের উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন “দিদি দিদি করিয়া সকলে অস্থির এই নেও তোমাদের দিদিকে আনিয়া দিলাম।” এই সব কথা নিয়া অনেকক্ষণ আনন্দ করিলেন। বুকের ব্যথা কমিয়া গেল। মায়ের শরীর একরকমই আছে দেখিলাম। মায়ের সিমলা আগমন উপলক্ষে ভক্তেরা নাম যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী কল্য নাম যজ্ঞ হইবে। আজ ৮দিন মা সিমলা আসিয়াছেন, সোলন মাত্র ৩দিন ছিলেন। সন্ধ্যা বেলায় অধিবাস হইল। তারপর সকলে মাকে নিয়া বসিলেন। একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিতেছেন “মা, মনত স্থির হয় না, কি করি?” মা হাসিয়া জবাব দিলেন “আমিত দেখিতেছি মন অস্থিরই হইতেছেন।” এই বলিয়া আবার বলিতেছেন “তাঁর জন্ম মন অস্থির হয় কৈ? অস্থির হইলে ত স্থির হইবে।” রাত্রি ১০টায় মার শরীর অসুস্থ বেশী রাত থাকা ঠিক নয় আমি একথা বুঝাইয়া বলায় সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

১৫ই শ্রাবণ, শনিবার :—

আজ সকাল ৬টা হইতে নাম আরম্ভ হইয়াছে মালা
চন্দনে মাকে সাজাইয়া নিজেরা সাজিয়া সকলে গাহিতেছেন

“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ

হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ।”

আজও এখানকার ভক্তদের কীর্তনে মায়ের ভাবের একটু
পরিবর্তন হইতে লাগিল, কিন্তু মা সামলাইয়া গেলেন। কিন্তু
শরীরটা যেন কেমন একটু হইয়া গেল। মা কথায় কথায়
বলিয়াছেন “ইহারা (এখানকার ভক্তেরা) যে সময়টুকু কীর্তন
করে বেশ একটু ভাব দিয়াই করে।” আজও রাত্রি ১০টার
সকলে বিদায় নিলেন।

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার :—

আজ মেয়েরা মাকে নিয়া বেলা ১২টা হইতে প্রায়
৪টা পর্য্যন্ত কীর্তন করিলেন আজও মায়ের ভাবের বেশ
একটু পরিবর্তন প্রকাশ পাইল। মা যখন মেয়েদের মধ্যে
হাতখানি দোলাইয়া দোলাইয়া ঘুরিতে লাগিলেন তখন
মেয়েদের উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া গেল। মহানন্দে নাচিতে
নাচিতে মেয়েরা গাহিতে লাগিল।

“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ

হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ ।”

মা আজও অনেকটা ভাবে সম্বরণ করিয়া নিলেন। কীর্তনান্তে
মেয়েরা মাকে নিয়া বসিল। পরে ধীরে ধীরে একে একে
বিদায় নিলেন। মেয়েরা যাবার পরই আবার বাবুয়া আসিয়া

বসিলেন। ভোলানাথের মৃত্যু কালীন ঘটনা জানিবার জন্ম সকলেই উৎসুক, কিন্তু জাগতিক ভাবে ভাবান্বিত ভক্তেরা কেহই মার নিকট এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতে পরিতোছেন না। আমি কাল সন্ধ্যা বেলায় একটু সে সব ঘটনা আরম্ভ করিতেই সকলে খুব আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন মাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। মা হাসিতে হাসিতে সব বলিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন “আমাদের এসব ঘটনা শুনিবার জন্ম খুবই একটা আগ্রহ ছিল কিন্তু মাকে জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ আসিয়াছে। মা হাসিয়া বলিলেন “এখন মাকে হাসিতে হাসিতে সব ঘটনা বলিতে শুনিয়া তোমাদের হয়ত মনে হইতেছে “আমি কি ভোলানাথের শত্রু ছিলাম?” সকলে বলিয়া উঠিল “না মা, আমাদের এত ভুল হয় নাই।” মা তখন একধারে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন “মা কাহারও কাহারও এভাব মনে আসে না?” তিনি তখন হাত ঘোড় করিয়া বলিলেন “মা, আমার কিন্তু মনে হইতেছিল এ ভাব কি সম্ভব? আমরা জাগতিক ভাবের মধ্যে আছি আমরা তোমার এই ভাবটা ধারণাই করিতে পারি না।” তখন সকলে বুঝিলেন এই মহিলাটির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই মা ঐ কথা বলিয়াছিলেন। অজ্ঞও মা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিতেছেন “কোনও স্থানে একটু গোলমাল হইতেছে” সকলেই বুঝিলেন কোথায়ও

একটি বিপদ আসিতেছে। তারপর কৈলাসের ঘটনা দেবেন্দ্রবাবু শুনিতেন। চাহিলেন। আমাকে বলিতে বলিলেন, আমি বলিতে লাগিলাম মাও মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেছেন।

৩কালীবাড়ীতে প্রতি রবিবারে কীর্তন ও পাঠ হয়। আজ সন্ধ্যার পর কয়েকজন রবিবারের কার্যাদি আরম্ভ করিলেন, মাকে তথায় নিয়া গিয়া বসাইলেন। খানিক পরেই কীর্তন আরম্ভ হইল। মনোজবাবু মাকে অনুরোধ করিলেন “মা, একবার আমাদের কীর্তনে একটু নামিয়া এস।” মা উপরে ৩কালীর মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন মনোজবাবুর প্রার্থনায় মা কীর্তনের ভিতর নামিয়া ধীরে ধীরে হাতখানি তালে তালে দোলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া ভুলিলেন। কাল উদয়াস্ত কীর্তন গিয়াছে আজও দুপুরে মেয়েরা কীর্তন করিয়াছে, মায়ের ভাবটা অল্প রকমই চলিতেছিল। যদিও মা সামলাইয়া যাইতেছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় ভাবটা অল্প রকম। এই অবস্থায় আবার কীর্তনে মাকে নামাইয়া দেওয়া এখনও একটু ভাবের পরিবর্তন প্রকাশ পাইল। খানিক পরেই মা বসিয়া পড়িলেন। কীর্তন চলিতেছে। মায়ের মুখের অপূর্ব শোভা। ভক্তগণ মুগ্ধনেত্রে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখন আর বেশী সময় কীর্তন হইল না। মাও উঠিয়া নিজের বিছানায় আসিয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই আসিয়া বসিয়াছেন। মা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই চুপ

বসিলেন। ভোলানাথের মৃত্যু কালীন ঘটনা জানিবার জন্ম সকলেই উৎসুক, কিন্তু জাগতিক ভাবে ভাবায়িত ভক্তেরা কেহই মার নিকট এসব কথা জিজ্ঞাসা করিতে পরিতোছেন না। আমি কাল সন্ধ্যা বেলায় একটু সে সব ঘটনা আরম্ভ করিতেই সকলে খুব আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন মাও আমার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। মা হাসিতে হাসিতে সব বলিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন “আমাদের এসব ঘটনা শুনিবার জন্ম খুবই একটা আগ্রহ ছিল কিন্তু মাকে জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ আসিয়াছে। মা হাসিয়া বলিলেন “এখন মাকে হাসিতে হাসিতে সব ঘটনা বলিতে শুনিয়া তোমাদের হয়ত মনে হইতেছে “আমি কি ভোলানাথের শত্রু ছিলাম?” সকলে বলিয়া উঠিল “না মা, আমাদের এত ভুল হয় নাই।” মা তখন একধারে একটি বুদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়াছিলেন তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন “মা কাহারও কাহারও অভাব মনে আসে না?” তিনি তখন হাত ষোড় করিয়া বলিলেন “মা, আমার কিন্তু মনে হইতেছিল এ ভাব কি সম্ভব? আমরা জাগতিক ভাবের মধ্যে আছি আমরা তোমার এই ভাবটা ধারণাই করিতে পারি না।” তখন সকলে বুঝিলেন এই মহিলাটির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই মা ঐ কথা বলিয়াছিলেন। অজ্ঞও মা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিতেছেন “কোনও স্থানে একটু গোলমাল হইতেছে” সকলেই বুঝিলেন কোথায়ও

একটি বিপদ আসিতেছে। তারপর কৈলাসের ঘটনা দেবেন্দ্রবাবু শুনিতেন। চাহিলেন। আমাকে বলিতে বলিলেন, আমি বলিতে লাগিলাম মাও মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেছেন।

৬কালীবাড়ীতে প্রতি রবিবারে কীর্তন ও পাঠ হয়। আজ সন্ধ্যার পর কয়েকজন রবিবারের কার্যাদি আরম্ভ করিলেন, মাকে তথায় নিয়া গিয়া বসাইলেন। খানিক পরেই কীর্তন আরম্ভ হইল। মনোজবাবু মাকে অনুরোধ করিলেন “মা, একবার আমাদের কীর্তনে একটু নামিয়া এস।” মা উপরে ৬কালীর মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন মনোজবাবুর প্রার্থনায় মা কীর্তনের ভিতর নামিয়া ধীরে ধীরে হাতখানি তালে তালে দোলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। কাল উদয়াস্ত কীর্তন গিয়াছে আজও দুপুরে মেয়েরা কীর্তন করিয়াছে, মায়ের ভাবটা অল্প রকমই চলিতেছিল। যদিও মা সামলাইয়া যাইতেছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় ভাবটা অল্প রকম। এই অবস্থায় আবার কীর্তনে মাকে নামাইয়া দেওয়ায় এখনও একটু ভাবের পরিবর্তন প্রকাশ পাইল। খানিক পরেই মা বসিয়া পড়িলেন। কীর্তন চলিতেছে। মায়ের মুখের অপূর্ব শোভা। ভক্তগণ মুগ্ধনেত্রে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এখন আর বেশী সময় কীর্তন হইল না। মাও উঠিয়া নিজের বিছানায় আসিয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই আসিয়া বসিয়াছেন। মা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই চুপ

হইয়া গিয়াছেন ঘর নীরব নিস্তব্ধ। খানিক পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দুই একজন মাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মাও উত্তর দিতেছেন কিন্তু জিহ্বা অনেকটা আড়ষ্টের মত হইয়া যাওয়ায় কথা তেমন স্পষ্ট হইতেছে না। রাত হইয়া যাইতেছে, রুষ্টি অনবরতই প্রায় চলিতেছে পাহাড় ভাঙ্গিয়া সকলেরই বাসায় ফিরিতে হইবে, কিন্তু সেদিকে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য নাই। মাকে ছাড়িয়া যাইতে কাহারও প্রাণ চায় না। কাল স্ত্রীলোকদের কাছে ভোলানাথের শেষ সময়ের কথা উঠিয়াছিল, আজ ছেলেরা তাহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আবার সেই সব কথা উঠিল। আমরা চলিয়া আসিবার পূর্ব হইতেই ভোলানাথ মাকে “মা, মা” বলিয়া ছেলেমানুষের মত ডাকিতেছিলেন, শুনিলাম আমরা চলিয়া আসিবার পর হইতেই ভোলানাথের এই ভাবটা আরও বাড়িয়া যায়। একেবারে শিশুর মত মাকে সর্বদা ডাকিতেন মাও সেই ডাক শোনামাত্রই সেই ঘরে উপস্থিত হইতেন। মৃত্যুর পূর্বদিন হইতে অর্থাৎ আমরা চলিয়া আসিবার পরদিন হইতেই মা ভোলানাথের ঘরেই প্রায় সময় থাকিতেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ভাবই গিয়াছে। মা বলিতেছেন “দেখ বতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোলানাথের এই ভাবটা বাহিরে ভিতরে না ফুটিয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরটা ভোলানাথের কাছে সব সময় থাকে নাই। যেই শিশুর মত ভাবটা জাগিল, সরলভাবে “মা, মা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল তখন ঐ ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই এ

শরীরটাও তাহার কাছে উপস্থিত হইত। মৃত্যুর পূর্ব দিন রাত্রিতে বলিল ভাত খাইতে ইচ্ছা করে। রাত্রি তাই তখন দেওয়া গেল না। পরদিন ভোর বেলাতেই ভাতের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু যখন যোগেশ সেই ভাত ও মুগের জুস মিলাইয়া সরবতের মত করিয়া খাওয়াইতে গিয়াছে তখন ‘মা, খাইয়াছে? আমি মার প্রসাদ ছাড়া খাইব না।’ তখন যোগেশ আমার মুখে একটু দিয়া দিতেই কাতরভাবে ভোলানাথ আমাকে বলিল “তুমি আমাকে এই প্রসাদ খাওয়াইয়া দিবে?” আমি বলিলাম আমার ত হাত ঠিক থাকে না আচ্ছা দিতেছি” এই বলিয়া আমিই তাহাকে খাওয়াইয়া দিলাম, খুব তৃপ্তির সহিত সবটা খাইল। তারপর বলিতেছে “আমি তোমাকে একটু স্পর্শ করিব” এ ভাবটাও দেখিলাম শিশু যেমন মাকে ধরিতে চায়, একেবারে সেই ভাব। আমি হাত বাড়াইয়া দিতেই দুই হাত দিয়া আমার হাত ধরিল কিন্তু তখনই কাঁপিতে কাঁপিতে হাত পড়িয়া গেল। তারপর একবার বলিলেন “তোমাকে দেখিব।” প্রথমে পরিষ্কার দেখেন নাই পরে পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। বলিলেন “দেখিয়াছি।” এই বাসনা জাগিবে আমি জানিতাম তাই কবিরাজকে পূর্ব হইতেই বলিতেছিলাম “চোখটায় মাখন দিও, সাবধানমত সর্বদা লক্ষ্য রাখিও।” একবার জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার কি খুব কষ্ট হইতেছে?” বলিল “হঁা হইতেছে তবে কোথায় হইতেছে কিছু বুঝি না।” আমি

ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না কাত হইয়া ভোলানাথ
 শুইয়াছিল আমার হাত দিয়া দুই তিন বার মাথা হইতে
 সর্ব শরীর হাত বুলাইবার মত হইয়া গেল। এর পূর্বের ত
 আর অসুখ অবস্থায় ধরা ছোয়াও বড় হয় নাই, সকলকে দিয়া
 সেবা করাইয়া নেওয়া হইতেছিল মাত্র। কিন্তু এখন এইভাবে
 একটা ক্রিয়া হইয়া যাওয়ার পর দেখিলাম ভাবটা বেশ
 আনন্দপূর্ণ আর যেন কোন যজ্ঞা নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল,
 “এখন কোন কষ্ট আছে কি?” হাসিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন
 “আনন্দ” মধ্যে একবার বলিয়াছিল “আমি যাই” আমি
 বলিলাম “আসা যাওয়া কি আছে? ও কথা বলিতে নাই”।
 তখন বলিল “তুমি ত চিরদিনই আমাকে এ আশা দিয়া
 আসিতেছ।” সন্ধ্যার পূর্বেরই গোলা আমাকে একছড়া মালা
 দিয়া গিয়াছিল, রোজই দিত, আজ আমি মালা ছড়া নিয়া
 ভোলানাথের ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। কারণ জানিতাম
 রাত্রিতেই মালার দরকার হইবে, তখন মালা পাওয়া যাইবে
 না। শান্তি বলিয়াছিল সে মালাটা ছুঁইতে গিয়া চমকিয়া
 উঠিয়াছিল, তাহার নাকি মনে হইতেছিল মালাটা জীবন্ত।
 ভোলানাথের শরীর ত একেবারে উলঙ্গ ছিল। সন্ধ্যাবেলা
 বলি “আমার শীত করিতেছে” আমি তাহারই একটা গেরুয়া
 রংয়ের নূতন কাপড় দিয়া শরীর ঢাকিয়া দিলাম। কিছুদিন
 পূর্বের যখন সন্ধ্যাস নেওয়ার কথা হয়, তখন ভোলানাথ একবার
 আমাকে বলিয়াছিল “তোমার উপর ত আমার মাতৃভাব

আছেই, কিন্তু তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না। যদি সন্ন্যাস নেই তবে প্রথম তোমাকে সকলের সম্মুখেই মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হাত হইতেই প্রথম ভিক্ষা নিব।” আমি দেখিতেছিলাম ঘটনাচক্রে তাহার সে কথা পূর্ণ হইয়া গেল। অন্ন ও বস্ত্র শেষ এই হাত দিয়াই নিল। আমি সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি ত কীর্তন ভালবাস একটু কীর্তন করিবে?” বলিল “আচ্ছা”। আমি যোগেশকে ডাকিয়া কীর্তন করিতে বলিলাম, খানিক সময় কীর্তন হইল তারপর কীর্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “তোমার কি সন্ন্যাসের মন্ত্র মনে আছে?” বলিল “আছে।” আমি দেখিতেছিলাম প্রণব ও মন্ত্র বাহিরে উচ্চারণ না হইলেও ভিতরে যে হইতেছিল তাহা বোঝা বাইতেছিল। সন্ন্যাস মন্ত্র যদিও সে মানস সরোবরের তীরে শুনিয়াছিল কিন্তু সন্ন্যাসের ক্রিয়াদি তাহাকে কুস্ত্র স্নানের দিন করিতে বলা হইয়াছিল। সেই অনুসারে সে নিজে নিজেই সেইদিন ক্রিয়াদি সব করিয়াছিল। জ্যোতিষের এবং ভোলানাথের দুই জনেরই দেখিলাম সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর বেশী দিন শরীর রহিল না। দেহত্যাগের কিছু পূর্বেই তাহার মাথায় (ব্রহ্ম তালুতে) হাত দিয়া বসিয়াছি, ঐ ভাবেই হাত থাকিতে লাগিল, আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছুই করি না, যাহা হইয়া বাইতেছে। নির্মলবাবুর মৃত্যুর সময়ও তাহার ব্রহ্ম তালু স্পর্শ হইয়া গেল সকলে তাহা লক্ষ্য করিল না। শেষ নিঃশ্বাস পড়িলে আমি

কবিরাজকে বলিলাম “কি তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত ?” সে সন্তুষ্টভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভোলা-নাথের দিকে চাহিল ও বলিল “হাঁ মা, এইভাবে নিঃশব্দে সব হইয়া গেল। ঘর নিস্তরূ উপস্থিত কেহই যেন বিশেষ বুঝিতে পারিল না। তোমাদিগকে দিয়া তোমাদের দিদিমাকে এই জগুই সরাইয়া দিলাম। তোমার দিদিমা থাকিলে এই সময়েতে এইরূপ শাস্ত রাখা যাইত না”। এইভাবে নানা কথাবার্তার পর সকলে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন।

১৭ই শ্রাবণ, সোমবার :—

আজও সকালবেলা হইতেই সকলে আসিয়া মাকে নিয়া বসিয়াছেন। বেলা প্রায় ১১টায় মাকে ভোগে বসাইতে নিয়া গিয়াছি মা বলিতেছেন “খুকুনী! আজ সিমলা ছাড়িবার খেলালটা হইতেছে। তোমরা তৈয়ার হইও। ৪টা, ৫টার সময় রওনা হইলেই হইবে।” তখন ভক্তেরা দুই একটা মাত্র কালীবাড়ী উপস্থিত ছিলেন অগ্ন্যান্ত সকলেই অফিসে চলিয়া গিয়াছিল। ভোগের পরই মায়ের খেলার কথা উপস্থিত দুই একটা ভক্ত জানিতে পারিয়া ভয়ানকভাবে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু শেষে মার মিষ্ট অথচ দৃঢ়ভাব দেখিয়া বুঝিলেন মার কথা ফিরিবে না। তাঁহারা তখন সকলকে ফোনে জানানহিতে চলিয়া গেলেন। অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার হইয়াই আছে; এর মধ্যেই ফোনে খবর পাইয়া অফিস হইতে একে একে সকলেই আসিয়া

উপস্থিত, আমাকে সকলেই বলিতেছেন “দিদি আপনাকে আনাইলাম ভাবিলাম আপনারা এখানেই এখন মাকে নিয়া কিছুদিন থাকিবেন, এই কি হইল?” আমি বলিলাম, “কি করি বলুন মায়ের খেয়ালে বাধা দেওয়া ঠিক নয় তাই কিছু বলিতেছিলাম মাকে আপন ভাবে চলিতে দেওয়াই কি ঠিক নয়?” “অনেক সময় দেখিয়াছি মা হয়ত অপরের কথা রক্ষা করিলেন কিন্তু তাহাতে কল ভাল হয় না। অবশ্য কোন কোন সময় রূপা করিয়া ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন সে ভিন্ন কথা।” আমার এই কথায় এবং মার কথাবার্তা শুনিয়া আর কেহ বাধা দিতে সাহস পাইলেন না। খবর পাইয়া ব্যস্ত হইয়া সকলে চলিয়া আসিয়াছেন। মাকে সকলে প্রার্থনা জানাইলেন “মা, যদি যাইবেই রূপা করিয়া এইটুকু কর যে আমরা অফিস হইতে ফিরিবার পূর্বেই রওনা হইয়া যাইওনা। আমরা ৪১টার মধ্যেই সকলে আসিতেছি।” মা বলিলেন “তোমরা ঠিক সময়তে আমাকে রওনা করাইয়া দিও।” ছেলেরা প্রায় সকলেই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। মেয়েরাও এই খবর পাইয়া খাবার জিনিষ ফুলের মালা চন্দনাদি নিয়া একে একে আসিয়া মার চরণে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই কাতর ভাবে মাকে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন। মা সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছেন, যাওয়াই স্থির। বত শীঘ্র সম্ভব সকলে অফিস হইতে

আসিয়া কালীবাড়ী মিলিত হইলেন। যাওয়ার বন্দোবস্ত সব হইয়া গেল। ৫টার আমরা রওনা হইলাম। সকলেই মাকে মোটরে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছেন। মোটর ছাড়িয়া দিল সকলেই বিমর্ষ বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পথের মাঝে মাঝে ভক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী থামাইয়া মালা চন্দনে মাকে পূজা করিতেছেন। এই ভাবে সিমলার আনন্দ ভাঙ্গিয়া দিয়া সন্ধ্যার পরই মা আমাদের নিয়া সোলন আসিয়া পৌঁছিলেন।

একটু পরেই রাজারানী মার দর্শনে অসিলেন। রাজ কৰ্মচারীরা সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা শোগীবাবার নির্ম্মিত ঘর গুলিতেই আসিয়া উঠিলাম। মার আদেশে নিবারণ বাবু (ইনি কয়েকদিন হয় সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন) এখানেই আছেন। রাজা মায়ের জন্মই এই বাড়ীটি রাখিয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের গায় বাংলাটি বেশ সুন্দর।

১৮ই শ্রাবণ মঙ্গলবার :—

ভোর বেলা ৬টার সময় সিমলাতে জীতেন বাবু, ধীরেন বাবু, পঙ্কজবাবু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া মার কাছে কীৰ্ত্তন করিতেন। অভয় নাম করিত ইহারা সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতেন সেই নিয়মটী এখানেও চলিতেছে। অভয় ভোর ৬টার নাম আরম্ভ করে আমরা সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেই। অভয় সুন্দর গান করে। ছেলে মানুষ ভাবটিও চমৎকার

গান তাই আরও মিষ্টি লাগে। ভিতরে বেশ একটা ত্যাগ ও বিচারের ভাব আছে।

কথায় কথায় উঠিল মার দীক্ষা আপনা আপনি হইয়া যাওয়ার পর প্রথম মন্ত্র ও স্তোত্রাদি বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এ কথায় মা হাসিয়া বলিতেছেন “দেখ খুকুণী! ছোট বেলায় এক ঘরে বসিয়া হয়ত খেলা করিতেছি আর দেখ গিয়া বুরবুর করিয়া এই সব কত কি বাহির হইতেছে, একা ঘরে বসিয়া বসিয়া এইসব হইত যেই কাহারও অসিবার আভাষ পাওয়া যাইত, অমনি বন্ধ হইয়া যাইত, সব ব্যাপারই এই ভাবে তখন গুপ্ত হইয়া যাইত। তাইত বলি যখন যাহা দরকার হইয়া যাইতেছে।”

আবার শুনিলাম রায়পুর ও দেৱাতুন মার অনেক সময় মন্ত্র ও স্তোত্রাদি বাহির হইয়াছে। রায়পুর নাকি গানের সুরে এই সব নানা স্তোত্রাদি দুই দিন হইয়াছে। রায়পুর কথায় কথায় মা একটি গান রচনা করিয়া নিজেই সুর দিয়া গাহিতে লাগিলেন সেই কথা শুনিলাম। গানটি এই—

আমি কারে বা এখন ডরি।

(আমি) বাহিয়া চলেছি তরি ॥

হোক না কেন তুফান ভারি।

ডুববে না হয় তরি ॥

যাঁর যাত্রি তাঁরই তরি।

আমি তাঁর ভরসাই করি ॥

(আমি কারে বা এখন ডরি)

মায়ের কয়েক দিন যাবতই কেমন একটা ভাব যেন চলিতেছে। আজ দুপুরে অভয় বিছানায় একটু গড়াগড়ি দিতেই বলিতেছেন “সব ঘরটায় গড়াগড়ি দিতে পারিস?” এই কথা বলিতে বলিতেই হাসিয়া কেমন একটা ভাবে বলিতেছেন “আমি দিব?” “আমি দিব?” এই বলিয়াই গা ছাড়িয়া দিয়া একপাশ হইতে অন্য পাশে গড়াগড়ি দিয়া গিয়াই একটু কেমন হইয়া পড়িলেন। চোক বুজিয়া সব শরীর যেন ছাড়িয়া দিলেন। আমি ও অভয় মা মা বলিয়া ডাকিতেছি জবাব নাই। অনেকক্ষণ পর ভাবের পরিবর্তন হইল কিন্তু কেমন যেন কিম্ব কিম্ব ভাব।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি মঙ্গলবার রাত্রিতেই অর্থাৎ কাল রাত্রিতে (প্রায় ১২টায়) আমি অভয় ও মাসীমা মার ঘরে শুইয়াছি মা তখন বসিয়াই আছেন। আমরাও বসিয়া আছি হঠাৎ মা বলিতেছেন “হরির নাম করিবে? আমি যতটুকু পারি করিব আর তোমরা তিনজনে কর।” আমরা নাম করিতে লাগিলাম মা বসিয়া বসিয়া চলিতেছেন চোখের দৃষ্টি, মুখের হাসি একটু কেমন যেন পরিবর্তিত হইল, মা যুঁহু হাসিয়া বলিতেছেন “আমি শরীরটা নিয়া একটু খেলা করি?” আমরা বলিলাম “আচ্ছা” মা বলিলেন “বাতিটা নিবাইয়া দাও” তাই দেওয়া হইল ঘর অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না। আমরা অনেকক্ষণ নাম করিলাম তারপর মা শুইলেন নামও বন্ধ করিতে বলিলেন।

‘কি হইল জানি না। পনের দিন আবার এই গড়াগড়ি। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন “বলিয়াছিলাম শরীরটা নিয়া একটু খেলা করিব। এইও এক খেলা হইয়া গেল। কালও রাত্ৰিতে একটু হইয়াছিল তোমরা ধরিতে পার নাহি। বৈকালে রাজা রাণী ও রাজমাতার আসিলেন। সন্ধ্যায় অভয় কীর্তন করিল। আজও রাত্ৰি প্রায় ১১টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন।

১৯শে শ্রাবণ, বুধবার :—

আজ দুপুরে একটু বিশ্রাম করিবার পর বেলা প্রায় ৩ টায় রাজপণ্ডিত, রাজা এবং আরও কয়েকজন আসিয়াছেন। পণ্ডিতজী মার মুখ নিঃসৃত শ্লোকের (এহি ভাবনারভারং) ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মার কাছে পড়িলেন। কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি মার ভাবের কেমন একটা পরিবর্তন চলিতেছিল আজও যেন চোক খুলিতে পারিতেছেন না। ধীরে ধীরে শরীর যেন একেবারে স্থির হইয়া গেল। প্রায় ঘণ্টা দুই এই ভাবে চলিল। রাণী, রাজমাতা সকলেই আসিয়াছেন সন্ধ্যার সময় মা উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্থির হইয়াই যাইতেছে। ধীরে ধীরে এই ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন “সব সময়ইত ভিতরটা একভাবেই আছে তবে শরীরটা তোমাদের সঙ্গে খেলে মধ্যে মধ্যে শরীরটাও ঐরূপ দেখায়।

এই বলিয়া শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় মা শুইলেন। হাতের ব্যথার জন্ত একটা তৈল মাণিশ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, আজ মাণিশ করিতে গিয়া দেখি গায় আর তৈল শুকাইতেছেন। আমি মাকে বলিলাম “মা, আজ শরীরটা কেমন হইয়াছে তৈল শরীরে শুষিতেছেন”। মা বলিলেন “দেখ কি তামাসা, শরীরটা তৈল নিতেছেন। ইহা সকলে লক্ষ্য করিতে পারে না। এই রকমই অনেক সময় হয় শরীরটা নেয় না ফিরাইয়া দেয়।” আমি বলিলাম “মা এইরূপ হইলে আর শরীরে ঔষধের ক্রিয়াই বা কি করিয়া করিবে? এই জন্তই তুমি যে বল” আমি ত কিছুই ত্যাগ করি নাই। মা বলিলেন ভোলানাথকে বলিতাম “শরীরটাত তোমাদের কাছেই ফেলিয়া দিয়াছি, তোমরা যাহা পার করাইয়া লও কিন্তু তাহারা দেখিতে শরীর নিতেছেন ফিরাইয়া দিতেছে। তাহার ভাবের কোন পরিবর্তন হইলেই এ শরীরটার ভিতর এমন একটা অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে যে দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া যাইত। কিসে ঠিক করিবে সে জন্ত মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িত।” এ সব কথা বলিয়া বলিতেছেন “দেখ এ সব কেহ বড় ধারণাও করিতে পারিবেনা, তবে তোমরা বলাইতেছ তাই হয়ত মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।”

২০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার :—

আজও ভোরে কীৰ্ত্তনাদির পর মা অনেকক্ষণ পড়িয়াই

আছেন। বেলা প্রায় ৭টা টায় মা উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রায় ১০টার মার ভোগ হইল। একজন শিখ সাধুসিং অনেক দিন যাবত মার কাছে যাওয়া আসা করেন, তিনি তাঁহাদের “গ্রন্থ সাহেব” নিয়া আসিয়াছেন মার কাছে একটু পাঠ করিবার জন্ত। বলিতেছেন “মা, আমি দেখি আমাদের গ্রন্থের ভিতর যাহা লিখা আছে আপনার মুখ হইতে আমি সেই সেই ভাবের কথাই শুনিতে পাই, আমার ইচ্ছা আপনার কাছে একটু গ্রন্থ সাহেব পাঠ করি।” আরও অনেকে আসিয়াছেন মা বলিলেন “বেশত তোমার ইচ্ছা হইয়াছে পড়, সকলেই শুনিয়া আনন্দ পাইবে।” কখনও মা কাহারও ভাবে বাধা দিতেন না। যে যেইভাবে নিয়া আসিতেছেন মা সেই ভাবেই যোগ দিতেছেন তাই সকলেই মার কাছে আসিয়া শান্তি পাইতেছেন। বেলা প্রায় ১১টার মার বিশ্রামের জন্ত ঘরের দরজা একটু বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বৈকালে মা উঠিয়াছেন পায়চারি করিতেছেন। কথায় কথায় উঠিল বিধবা কাহাকে বলে, মা বলিতেছেন “বি+য়া—ইয়া+বি অর্থাৎ কিনা (নিজের শরীর অঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া) ইয়া—বিয়োগ, আগে পিতা মাতার সঙ্গে যোগ অর্থাৎ জন্ম তারপর ইয়া—বি অর্থাৎ বিয়োগ তাই হইল বি—য়া” হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন “যোগ অর্থাৎ যোগ হইলে ত বিয়োগ হইবে?” নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন’ এটার যোগই নাই তাই আবার বিয়োগ

হইবে কি? বি-য়াই হইল না, তা বিধবা কি করিয়া হইবে? আবার বলি খবের সঙ্গে যোগ হইয়াই আছে তা আবার বিয়োগ হইবে কি করিয়া?” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রায় ষ্টায় রাজা মাকে নিজ বাড়ীতে মোটরে নিয়া গেলেন। মা গিয়া বাহিরে একটু ঘুরিয়া চলিয়া আসিলেন। তারপর রাজা, রাণী, রাজ মাতাদ্বয় এবং পরিচারিকারা অনেকে আসিয়া মার কাছে বসিলেন। রাত্রি ৮টা অবধি ইহারা মার কাছে থাকেন। অভয় সকলকে নিয়া নাম করে, কারণ রাজমাতা কীর্তন শুনিতে খুব ভালবাসেন তাঁহার ইচ্ছাতেই নাম করা হয়। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে নাম করেন। ৮টার পর ইহারা চলিয়া যান। কারণ কিছুদিন যাবত রাজ বাড়ীতে ঝুলন আরম্ভ হইয়াছে। ৮ টায় ঠাকুর কোলায় ওঠেন, কীর্তনাদি হয় তাই ঐ সময়েতে সকলে মার নিকট বিদায় নিয়া চলিয়া যান। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর স্বামিজী নিশিবাবু যোগেশদাদা প্রভৃতি সকলেই আসিয়া মার কাছে বসিলেন কথা-বার্তায় রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। আমরা যে কয়জন মার ঘরে শুইব সকলে কখন বিছাইয়া লইলাম। মা বলিলেন “এঘরে শুইলে খাজনা দিতে হইবে, খাজনা হইল নাম, আস আমরা কীর্তন করি তারপর শুইব। এখনই শুইয়া কি করিবে?” তাই হইল মা নাম বলিয়া দিতে লাগিলেন হরিবল, হরিবল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে

করিতে লাগিলাম। প্রায় ১১৥ টায় আমরা শুইয়া পড়িলাম। আজ কল্প বাজার হইতে দেবেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহাদের আরও একজন আত্মীয় আসিয়াছেন। মার দর্শনের জন্ত ইহারা দেয়াহন গিয়াছিলেন তথা হইতে খবর নিয়া এখানে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর কথা (যাহার বহু সন্তান মারা গিয়াছে এবং ভয়ানক অস্থির অবস্থায় ছিলেন, মাকে পাইয়া একটু শান্তি পাইয়াছিলেন) পূর্বেই লিখা হইয়াছে।

২১শে শ্রাবণ শুক্রবার :—

আগামী ২৩শে শ্রাবণ রবিবার জ্যোতিষদাদার সাম্বৎসরিক তিথি, সেইদিন নানাস্থানে কীর্তন, যজ্ঞাদি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে ও উদয়ান্ত কীর্তন হইবে। কথা হইয়াছে আগামীকাল্য শনিবার সিমলা হইতে ২০।২৫ জন ভক্ত আসিবেন। তাঁহারা আসিয়া কীর্তন করিবেন। রাজা খুব আনন্দের সহিত কীর্তনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। রাজার ইচ্ছানুসারেই এই সব বন্দোবস্ত হইতেছে। আজ ভোরে কীর্তনের পরে মা একটু ঘুরিতে বাহির হইলেন। পরে আসিয়া হাত মুখ ধুইলেন।

মা শোবার ঘরে পায়েচারি করিতেছেন, কথায় কথায় আমি উঠাইলাম মার মুখ হইতে যে বাজিতপুর “পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ” শব্দ বাহির হইয়াছিল, এ কথায় মা বলিলেন” দেখ মুখ হইতে প্রথম “পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ” বাহির হইয়াছিল, কিন্তু যাহার যে ভাব সে

সেই রকম আলোচনা করিতে লাগিল। স্ত্রী শরীর দেখে বলিয়া। পরে জিজ্ঞাসায় ও নানারূপ আলোচনায়, নারায়ণী, মহাদেব, মহাদেবী ইত্যাদিও বাহির হইয়া গেল।” আবার আমি কথায় কথায় উঠাইলাম বাজিতপুর কালীপূজার সময়ের ঘটনা একটি শুভ্রবর্ণ (লাল আভাযুক্ত) ব্রাহ্মণ মার ডানদিক দিয়া যাইয়া ঘরে ঢুকিল, এই কথায় মা বলিলেন “কি হইয়াছিল জান? ডান দিক দিয়া যাইয়া ঘরে ঢুকিল, একথাও শেষ নয় সব কথাই ত কেমন সম্পূর্ণভাবে সব সময় বাহির হয় না। কিছু কিছু থাকিয়া যায়, ঘটনা কি হইয়াছিল জান? এ শরীরটারই ডান দিক হইতেই ঐ ব্রাহ্মণের মূর্তিরূপে শূণ্যে প্রকাশিত হইল পরিষ্কার দেখিতেছি।” আমি আজ এই আরও একটা নূতন তথ্য অবগত হইলাম। এই কথাটা পূর্বের আর বাহির হয় নাই। মার অনেক কথাই অনেক সময় এইরূপ অসম্পূর্ণ থাকে কারণ বোধ হয় প্রকাশ করিবার সময় হয় নাই। আজও আমি ও মা শুধু ঘরে ছিলাম “এই সময়তে উপরোক্ত কথাগুলি বাহির হইতেছিল। আমি বলিলাম মা সন্ন্যাসীদের মুখেও নারায়ণ শব্দই শুধু শুনিতে পাওয়া যায়। এই “নারায়ণ” শব্দটি কোন মূর্তি বিশেষ কে লক্ষ্য করিয়া ত বলা হয় না, তোমার মুখ হইতে তাই বাহির হইল “পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ।” মা বলিলেন দেখ, যখনকার কথা বলা হইতেছে তখন এই শরীরটা গ্রাম্য বধুরূপে ছিল বাহিরের দিক হইতে “ব্রহ্ম” ইত্যাদি শব্দ

শুনিবার কোনও উপায়ই ছিলনা কিন্তু মুখ দিয়া ঐ কথা বাহির হইয়া গেল। যাহারা শুনি তাহারাও এই কথা আর কখনও শোনে নাই তাই বলাবলি করিতেছিল পূর্ণ-ব্রহ্ম-নারায়ণ নারায়ণী মহাদেবী আবার কে হইল? আমি বলিলাম “মা, তোমার সবইত এই রকম। তুমি ত গ্রাম্য গৃহস্থ ঘরের বউ হইয়াছিলে যাহারা বৃদ্ধকালেও ঘোমটা টানিতেছে এই অবস্থায় এখনকার এই রকম লজ্জা শূন্যতাও ত কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যদি প্রথম হইতেই লজ্জা না থাকিত তবে বলা যাইত নিল্লজ্জই ছিল ইহাই স্বভাব ছিল, কিন্তু তাও ত নয় বরং লজ্জা সর্ববসাধারণের চেয়ে এক কাঠি উপরেই ছিল। সেই অবস্থা হইতেই এত শীঘ্র এই অবস্থায় আসা ইহা কি সহজ কথা হইল।”

মা বলিতেছেন তখন “এ সব কথা শুনিব কাহার কাছে? চারিদিকে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যেই যে এ সব কথা আলাচনা ছিল না। শুধু ঘোমটা টানিয়া সাংসারিক কাজে শরীরটা খাটিয়া যাইত।”

ঢাকার আশ্রমের ৩কালীর সমাধির কথা উঠিল। মা বলিলেন “দেখ, যাহা হইবার ঠিকই হইয়াছে শরীরের কোন অঙ্গহানি হইলে ত চিকিৎসা করাই দরকার তাই মেরামত হইয়াছে, এখনও জীবন আছে কিন্তু আগামী জন্মোৎসবের মধ্যে ৩কালী ভূমিস্থাৎ হইয়া যাইতে পারে। যাহা হইবার তাহা ঠিক ঠিক হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রেও ত তাহারই পূজা

হইয়াছে। টেলিগ্রামের জবাব সেইদিন পাইলে ত এ সব হইত না। যখন এ সব কাজ হইয়া গিয়াছে, তার পর বাহা করিবার দরকার তাহাই টেলিগ্রামে গিয়াছে ঠিক সময়েতেই ত টেলিগ্রাম পাইয়াছিলে আগামী বছর ত আর পূজা হইতে পারিবে না। এ সব ত জানা কথাই সব ঠিক ঠিক হইয়া যাইবেই।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভোগাদির পর মাকে একটু বিশ্রাম করিবার জগ্ন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ৩টা হইতে আবার সকলে আসিতেছেন। প্রতিদিনের মত আজও বৈকালে রাজা, রানী, রাজমাতাদ্বয়, পরিচারিকাগণ এবং অগ্ৰ্য্য অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া মার ঘরে বসিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বে অভয় নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিল সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যোগ দিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সকলে বিদায় নিলেন। মাকে অভয় গান করিতে বলিল মা গান করিতে লাগিলেন—

“হৃদয় দুয়ারে আজি কে ডাকিল

কাহার মধুর বাণী শুনিলাম (৩)

ওকি শুনিলাম, শুনিলাম, শুনিলাম (৩)

শুনিয়া সে বাণী তাঁর, আমি রহিতে না পারি আর

হৃদয় আকুল আজি হইল, হইল হইল (৩)

মোহ মদিরা পিয়ে, আমি অচেতনে ছিনু শুয়ে

কে আজি আসিয়া মোরে জাগাল, জাগাল, জাগাল (৩)

ভাটিয়ালি সুরে অতি সুন্দর ভাবে মা এই গানটি করিলেন।

জ্যোতিষদাদাকে গান করিতে বলিলে এই গানটি তিনি প্রায় করিতেন। তাঁহার ভাবে তাঁহার মুখেও এই গানটি বড়ই মিষ্টি লাগিত। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা শুইয়া পড়িলাম।

২২শে শ্রাবণ রবিবার :—

আজ সন্ধ্যায় সিমলা হইতে সকলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজার দরবার হলে কীর্তন হইবে। বীরেন প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে আসিয়াই মঞ্চ প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ১০টায় মঞ্চ তৈয়ার ইত্যাদি হইয়া গেলে মাকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। মা সেখানে গেলে পর নিয়মিতরূপে অধিবাস করিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ২টায় সকলে বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। আগামী কল্যা ভোর ৬টায় কীর্তন আরম্ভ হইয়া উদয়াস্ত কীর্তন হইবে। আগামী কল্যা ৭ই আগষ্ট ৬জ্যোতিষ দাদার তিরোধান তিথি সেই উপলক্ষ্যেই কীর্তন। দেৱাছন, ঢাকা, জামসেদপুর প্রভৃতি সর্বত্রই এই উপলক্ষ্যে কীর্তন হইবে স্থির হইয়াছে। দেৱাছন হোম এবং ভাণ্ডারও হইবে। কীর্তনের ঘরে মঞ্চের মধ্যে মায়ের ও রাধাকৃষ্ণের ছবির নীচে ৬জ্যোতিষদাদার একখানা ছবি দেওয়া হইয়াছে।

২৩শে শ্রাবণ, সোমবার :—

আজ ভোর ৬টায় “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নাম আরম্ভ হইল। লোক সমাগম যথেষ্ট হইল। মালা চন্দনে সাজিয়া রাজা, প্রজা সকলেই মিলিয়া কীর্তন করিতেছেন। এদিকে সিমলার

নাম যজ্ঞের মত মন্দিরের এক কোঠায় ভোগের ব্যবস্থা
 হইয়াছে। পাঁচখানি আসন পাতিয়া নিমাই নিতাই,
 অবৈতাচার্য্য, শ্রীনিবাস ত গদাধরের ভোগ দেওয়া হইয়াছে।
 একজন বৈষ্ণব (ব্রাহ্মণ) পূজাদি করিলেন। পরে আরতির
 সময় সকলে মিলিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভোগের গান
 করিলেন। মাকেও সেখানে নিয়া যাওয়া হইল। বেশ সুন্দর
 নিয়ম। মাকেও উপরোক্ত পাঁচজনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়মেই
 ভোগ দেওয়া হইয়াছে। মাকে আসনে বসান হইয়াছে। মাকে
 এবং অন্যান্য সকলকে (উদ্দেশে) আরতি করা হইল।
 ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল দেবতা যেন উপস্থিত।
 কীর্তন খুব জমিয়া উঠিলে মাকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল।
 দুপুরে মাকে আবার যোগীবাবার নির্ম্মিত ধর্ম্মশালার নিয়া
 আসা হইল। মাকে ভোগে বসাইলাম কিন্তু আজ আবার মার
 ভাবের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। তবে সামলাইয়া
 যাইতেছেন। বৈকাল প্রায় ৪টায়া মাকে আবার কীর্তনের
 ঘরে নিয়া যাওয়া হইল। ৬টার পর সকলে মাকে অগ্রে
 রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। একটু দূরেই মন্দির ও মা
 যে ধর্ম্মশালায় থাকেন সেই ধর্ম্মশালা। কীর্তনের দল মাকে
 অগ্রে নিয়া মন্দিরে আসিলেন ও বাহিরের অঙ্গনে অনেকক্ষণ
 দাঁড়াইয়া কীর্তন করিলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে
 কীর্তনের দল মন্দির হইতে কীর্তনের ঘরের দিকেই চলিলেন।
 সেই ঘরে গিয়া এবার কীর্তন শেষের গানগুলি আরম্ভ হইল—

গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে
 ধেয়ে এসে শচীমাতা গৌর কোলে করে
 (আর) লক্ষ লক্ষ চুষ দিল বদন কমলে

ইত্যাদি—

তারপর “জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়

জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়”

বোরেন এই নাম ধরিল সন্ধ্যার সময় এই নামটি খুব জমিয়া উঠিল। মার এবার ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইতে লাগিল। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কীর্তনের দল মাকে মাঝখানে রাখিয়া মঞ্চের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন কীর্তন হইতে লাগিল। পরে মা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। দাঁড়ান অবস্থা হইতে একেবারে পড়িয়া গেলেন। আমি পিছন হইতে ধরিতে গিয়া আমিও প্রায় পড়িয়া গেলাম। অল্প সময় হইলেও এই ভাবের একটু আভাষ পাইয়াই সকলে প্রাণপণে নাম করিতে লাগিলেন, নামের ধ্বনিতে পার্বত্য রাজধানী যেন কম কম করিতে লাগিল। দুপুরেই মা ধর্ম্মশালার রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, “নামের ধ্বনি এখান পর্য্যন্ত আসিতেছে, ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা জ্যোতি ও তাপ আসিয়াছে।” সত্যিই তাই মনে হইতেছিল। রাজাসাহেব কীর্তনে সারাদিন ঘুরিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে উজিরসাহেবও তাঁহার ছেলে এবং অন্যান্য অনেক প্রজাবর্গও কর্ম্মচারীবৃন্দ যোগ দিয়াছেন, রাজ্যময় একটা যেন

কিসের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। রাজায় প্রজায় আজ আর বিশেষ ভেদ নাই, রাজার পরিচ্ছদ আজ সাধারণের মতই সাদাসিধা; নাম করিতে করিতে চেহারাও আজ বদলাইয়া গিয়াছে। একেই রাজাসাহেব ধর্মপ্রাণ তার মধ্যে মার কাছে এই নামে সকলেই যেন কি একভাবে বিভোর। মার এই ভাবে রাজাসাহেব বা অগ্ন্যাগ্ন অনেকেরই আর দেখেন নাই; তাই সকলেই আনন্দে বিস্ময়ে যেন কতকটা অভিভূত। মা মাটিতে পড়িয়া রহিলেন পরে উঠিয়া বসিলেন। দৃষ্টি স্থির চক্ষু লাল ও জলে ভরা। সেই অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া সকলেই হাত যোড় করিয়া আছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। মাকে ধরিয়া বারান্দায় আনা হইল এবং মোটরে বসাইয়া ধর্মশালায় নিয়া আসা হইল। রাজাসাহেব এবং অগ্ন্যাগ্ন ভক্তবৃন্দ মাকে ঘেরিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বেশী সময় বসিবার কাহারও উপায় নাই আজই রাত্রি ৮টায় সকলের সিমলা কিরিতে হইবে। রাজা সাহেবই মোটর পাঠাইয়া সকলকে আনিয়াছিলেন আবার তিনিই এখন মোটরে সকলকে পাঠাইতেছেন। মাকে ডাকা হইল মা আবেশ জড়িত ভাবেই উঠিয়া বসিলেন। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। মা অস্পষ্ট ভাবে দুই একটি কথাও বলিলেন। এই ভাবটা একটু নূতন দেখিতেছি, এই রকম ভাব হইলে এত শীঘ্র মা উঠিতে পারিতেন না, কিন্তু আজ এত অল্প সময়ের মধ্যেই উঠিয়া বসিলেন দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য

হইলাম। মনে হইল মা একবার অনেক দিন হয় এই কীৰ্ত্তনে ভাবাবস্থায় কথা হওয়াতে বলিয়াছিলেন দেখ এই শরীরটার গতি কখন কি হয় বলা যায় না। এমন কিন্তু নয় যে একটা স্তর পার হইয়া গিয়াছে আর সেই স্তরে বাইতে পারিবে না। সব সময়তেই সব অবস্থায় এই শরীরটা খেলিতে পারে।” আজ এই অবস্থাটা দেখিয়া আমার মনে হইল পূর্বে এইরূপ ভাবাবস্থায় স্তরেই শরীরটা কিছুদিন খেলা করিয়াছে, তাই তাহা পূর্ণ মাত্রায় হইত। সাধারণভাবে আনিতেও কষ্টকর হইত ; কারণ তখন যে সেই ভাবেরই খেলা হইতেছিল। আর এখন যেন অগ্নি স্তর হইতে আসিয়া এই সব ভাবাবস্থায় স্তরে শরীরটা খানিক সময় খেলিয়া গেল তাই এত অল্প সময়তেই এই ভাবের পরিবর্তন দেখা বাইতেছে ; মাও ভাবে আমার কথার সমর্থন করিলেন। যাহা অনুমান করিয়াছি তাহাই লিখিলাম মাত্র। অপার সমুদ্রের পার নির্ণয় করিতে যাওয়া আমার মত লোকের বাতুলতা মাত্র। সকলে চলিয়া গেলে মাকে আবার শোয়াইয়া দিলাম। সারারাত আর সাড়াশব্দ নাই।

২৪শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার :—

আজ ভোরে উঠিয়া মা একটু হাঁটিতে বাহির হইলেন। অভয় সঙ্গে গেল। খানিক সময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া মা আবার ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন। মাকে ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের পর মা একটু শুইয়া পড়িলেন। প্রায় ৩টা

বাজে, আমাকে একটু বজ্র ও পূজাদির কাজে মন্দিরে পাঠাইয়াছেন। সেখান হইতেই শুনি মার খেয়াল জাগিয়াছে আজই দেৱাছন রওনা হইবেন। তখন আমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হয় নাই। মার শরীরটা কাল এইভাবে গেল আজই রওনা হইবেন কেহ ধারণা করেন নাই। কিন্তু প্রথম হইতেই দেখিতেছি কোন বিষয়েতেই মায়ের খেয়ালের বাধা জন্মাইতে পারে না। যাহা করিবেন বলিবেন যে কোন সুবিধা অসুবিধাই উপস্থিত হউক না কেন মার তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই আমরা কিছু বলিলেও বলেন চিন্তা কর কেন, এক রকমে হইয়াই যাইবে। প্রথমে এ কথাও চিন্তা যাইত না এখন দেখিতে দেখিতে বুঝিয়াছি বাস্তবিকই মার সবটাতেই কেমন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটয়া সব ঠিক ঠিক হইয়াই যায়।

এই খবর রাজাসাহেবের কাণে গেল এবং অগ্ৰাণু বাহার কাণে যাইতেছে সেই ছুটিয়া আসিতেছে। নূতন বাঁহারা তাঁহারা অবাক হইতেছেন, কিন্তু রাজাসাহেব দুঃখিত হইলেন বটে আশ্চর্য্য হইলেন না। মার এইরূপ যাতায়াত তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন। এতদেশীয়া একদল স্ত্রীলোক আসিয়াছে। মা তাহাদের বলিতেছেন “নাম কর খালি মনে ও মুখে শুধু শুধু বসিয়া থাকিতে নাই।” একটি মহিলা মাাকে বলিলেন “মা, সংসারের কাজ, কি করিয়া নাম করিব ?” মা হাসিতে হাসিতে হাততালি দিতে দিতে নিজে নিজেই মিলাইয়া বলিতেছেন—

“মনমে হরিকা নাম
হাতমে দুনিয়াকা কাম
ইস্‌সেই মিলেগি পরমাত্মা রাম।”

আমি হাসিয়া বলিলাম “তোমার দেখিতেছি কথায় কথায় কবিতা হইতে আরম্ভ হইল।” মা ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিলেন।

কাল দুপুরে মা যখন কীৰ্ত্তনে বসিয়াছিলেন তখন খানিক সময় মার মুখের ভাব দেখিয়া দুর্বলতার জন্য ভক্তেরা অনেকেই গুপ্ত পাইয়াছিলেন। অখণ্ডানন্দজীর কথায় পঞ্চদাদা মনোজদাদা মাকে উঠাইয়া নিয়া আসিলেন। স্বর্ণশালায় আসিয়া তাঁহারা মাকে বলিলেন “মা, তোমার দুর্বল শরীর তার মধ্যে কীৰ্ত্তনে আরও যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল, আমাদের ভয় করে তোমার শরীর না সারিলে আমরা আর নাম করিব না।” মা বলিলেন “নাম করিবনা একথা বলিতে নাই। তোমরা নাম করিয়াই ত এই শরীরটাকে সুস্থ করিতেছ। তোমরা যে জপ কর তাহা হইল ঔষধের ডোজ (Dose) আর যে কীৰ্ত্তন কর তাহা হইল ইন্‌জেক্‌সন্। ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়ার সময় প্রথম প্রথম একটু উঃ আঃ করে ত কিন্তু তারপর ফল দেখা যায় এও তাই।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মা চলিয়া যাইতেছেন রাজাসাহেব মাকে একটু রাজবাড়ীতে নিয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। আমরা মাকে

নিয়া রাজ বাড়িতে গেলাম। তথায় ঘণ্টাখানেক থাকিয়া ফিরিয়া আসা হইল। রাজাসাহেব মার কটো উঠাইয়া রাখিলেন। রাত্রি ৮টায় আমরা রাজাসাহেবের দুইখানা মোটরে সকলে কাল্কা রওনা হইলাম। প্রায় ২৩-২৭ মাইল পার্বত্য পথ। যাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিবে। মা এবার অভয়কে সোলন রাখিয়া চলিলেন। বলিলেন “খেয়াল হইয়াছে এখন থাকুক” বলিয়া আসিলেন যখন ইচ্ছা হইবে তখন যেন অভয় চলিয়া আসে। কাহার উপর যে কখন কি আদেশ হইবে বলা যায় না। এই দেখিতেছি কাছে রাখিয়া হয়ত কত ভালবাসা দেখাইতেছেন। অভয়ের সুন্দর ভাব দেখিয়া মা তাহাকে বেশ আদর করিতেছেন; ১৬-১৭ বছরের ছেলে এই রকম ত্যাগের ভাব সকলে মনে করিল অভয়ই এখন সর্বদা মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু পর মূলর্ত্তে মা যাহা করিবেন তাহা হয়ত কেহ পূর্বের ধারণাও করিতে পারে নাই। অভয় আমাদের সঙ্গে কাল্কা পর্যন্ত আসিল। রাস্তায় অনেকেরই বমির ভাব হইল কেহ কেহ বমিও করিল। পাহাড়ের পথে অনেক সময়েই মোটরে বমি হয়। আমরা রাত্রি ১০টায় কাল্কা পৌঁছিলাম। নিবারণবাবু (ইনিও কিছুদিন হইয়া মার আশ্রয়ে আসিয়াছেন। মা ইহাকেও সাধন ভজনের জগু সোলন রাখিয়াছেন। মার জগু যে ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে তাহাতেই ইনি আছেন। ইনি (একাউন্টেন্ট ছিলেন এখন পেন্সন পান) ও আমাদের সঙ্গে

কাল্কা পর্যন্ত আসিয়াছেন। রাত্রি ১১টায় আমাদের গাড়ী ছাড়িল। অভয় ও নিবারণবাবু রাজার মোটরেই সোলন ফিরিয়া গেলেন। মার সহিত আমি, অখণ্ডানন্দজী ও রুমা দেবী চলিলাম। কল্পবাজারের দেবেন্দ্রবাবুও সপরিবারে মার সঙ্গে আসিলেন। মাসীমা ও নিশিবাবুও সোলন বহিয়া গেলেন।

২৫শে শ্রাবণ, বুধবার :—

আজ বেলা প্রায় ৭টায় আমরা দেহাছন আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজাসাহেবের ফোনে মার আগমন বার্তা জানিয়া হরিরাম যোশী, কাশীবাবুর স্ত্রী লক্ষ্মী রাণী, সারদা প্রভৃতি কয়েক জন ফৈশনে মার জগ্ন অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাকে লইয়া সকলে কিম্বণপুর আশ্রমে আসিলেন। আশ্রমে শ্রীবুদ্ধ মন্মথ বাবু, যোগেশদাদা ও কমলাকান্ত আছেন। মার আগমনে সকলেরই আনন্দ। প্রায় ১টায় মার ভোগ হইল। ভোগের পর মাকে একটু বিশ্রাম করিবার জগ্ন মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বৈকালে অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় নাম ধরে কীর্তনাদি হইল। সাধন ব্রহ্মচারী রায়পুর হইতে হঠাৎ আসিয়াই দেখে মা আসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২৬শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার :—

ভোরে কীর্তন হইল। মা প্রায় বেলা ৮টায় উঠিয়া

বসিয়াছেন। প্রত্যহই বহু চিঠিপত্র আসে, মাকে সময়মত পড়িয়া শোনান হয়। মার খেয়াল হইলে জবাব দিবার সময় দুই একটি কথা আমাদের বলিয়া দেন। আশ্চর্যের বিষয় সেই দুই চারিটি কথায়ই দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠির মূল জবাবটুকু বেশ সুন্দর হইয়া যায়। সকলেই চাহেন চিঠির জবাবে মার মুখের দুই চারিটি বাণী থাকে কিন্তু মুস্কিল এই যে খেয়াল না হইলে একটি কথাও পাওয়া যাইবে না। আবার খেয়াল হইলে চিঠি পড়িয়া শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ১০-১৫ খানা চিঠির জবাবেই কিছু না কিছু বলিয়া যাইতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি সেই দুই চারিটি কথাতেই সমস্ত চিঠিখানির সুন্দর জবাব হইয়া যাইতেছে। দুই তিন দিন হয় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক অর্থাৎ শ্রীবুত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাচল হইতে মাকে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই “মা, বিদ্যাচল অথবা কাশী কোথায় মৃত্যু ভাল? আপনার ব্যক্তিগত মত জানিতে পারিলে অনুগ্রহিত হইব। আমার কিন্তু বিদ্যাচলই ভাল লাগে কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন ৬কাশীর তুল্য স্থান নাই।” ইনি আর কখনও মার কাছে চিঠিপত্র লিখেন নাই, এই প্রথম। মার কাছে ইহার আসা যাওয়াও বিশেষ নাই, কিন্তু একটা দেখা যাইত সময় মত মধ্যে মধ্যে মার সঙ্গে ইহার দেখাশুনা হইয়া যাইত এবং দুই একটি কথা মা ইহাকে যাহা বলিয়াছেন ইনি মার আদেশ শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়াছেন এইমাত্র বাহিরের দিক হইতে মার সঙ্গে ইহার পরিচয়। ইনি নিজের চেষ্টায়

অত্যন্ত গরীব অবস্থা হইতে এখন লক্ষপতি হইয়াছেন। বাহিরের দিক হইতে ইনি একজন বিষয়ী লোক দেখা গেলেও মা বলেন “ইহার ভিতরে জিনিষ আছে।” মার সঙ্গে ইহার বিশেষ মেলামেশা বাহিরের দিক হইতে না থাকিলেও, আজ এই ভাবের পত্র পাইয়া তাঁহার মার প্রতি ভিতরের শ্রদ্ধার ভাবটা যেন পরিষ্কার বোঝা বাইতেছে। এই চিঠির উত্তর আমি দিতে বসিয়াছি কারণ মা কাহাকেও পত্র দেন না তবে বিশেষ কথা থাকিলে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার জবাব কিছু বলিয়া দেন। আজ এই কথার জবাব জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন “লিখিয়া দাও, বাবা! সকলের পক্ষে এক কথা নয়। আসল কথা কি জান? কাশী ত তোমার অন্তরে। তোমার পক্ষে কাশী ও বিদ্যাচল একই। ইহা মনে রাখিয়া যেখানে শান্তভাবে সেই একের স্মৃতি জাগ্রতের চেষ্টা থাকে সেই স্থানেই থাকিও। যে স্থানে ধনী হইলে প্রকৃত ধনবান, সেই ধনে যে তুমি ধনবান (তুমি যে তোমার অন্তঃপুরের খবর জাননা) তবে উপস্থিত তোমার কাছে তাহা প্রকাশ নাই মাত্র। এইজন্যই তোমার কাছে কাশী ও বিদ্যাচল সমান বলা হইল। এক নিঃশ্বাসের ত বিশ্বাস নাই। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে সেই একের স্মৃতি বাহাতে জাগ্রত থাকে তাহার চেষ্টা করাই আমাদের দরকার নয় কি বাবা?” কাহার ভিতরে কি আছে অন্তর্দ্রষ্টা যিনি তিনিই বলিতে পারেন। সব সময় অবশ্য এ ভাবে স্পষ্ট কথা বাহির হয় না। সবই কস্মাকস্ম বলিতেই হইবে।

এবার আসিয়া শুনিলাম এলাহাবাদের একজন এডভোকেট শিবপ্রসাদসিংহ মাকে এখানে আসিয়া দেখিয়া মার প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি প্রতি দিনই চিঠি লিখিতেছেন। , মার ঘরের জন্ত টেলিগ্রামেরও ক্রটি হইতেছে না।

ভোগের পর ১২টায় মার ঘরের দরজা একটু বন্ধ করিয়া মাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইয়াছিল। আবার ৪টায় দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। হরিরাম এবং একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক (ইনি পাঞ্জাব হইতে মার নাম শুনিয়া দেয়াত্ন মার দর্শনে আসিয়া মাকে না পাইয়া সোলন গিয়া মার দর্শন পান, এখন আবার মার সঙ্গে দেয়াত্ন আসিয়া বাড়ীভাড়া করিয়া আছেন) ও আরও কয়েকটি এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক, পুরুষ আসিয়াছেন। মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। যোগেশদাদা নাম ঘরে বসিয়া নাম ধরিলেন মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা সঙ্গে সঙ্গে কমলাকান্ত, মন্থবাবু, সাধন এবং আরও কয়েকজন যোগ দিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক নাম হইল। পরে সকলে মার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

৩ভোলানাথের মৃত্যুর কথা উঠিল শুনিলাম মৃত্যুর পর মা সকলকে বলিলেন “মালা, চন্দন, ইত্যাদি যাহা লাগে ঠিক কর।” আবার বলিলেন “রামকৃষ্ণ মিশন হইতে ঠিক ভাবে জানিয়া আস এই অবস্থায় কি কি করা আবশ্যিক।” মার ভাবের এক বিন্দু পরিবর্তন হইলনা। মা হাসিয়া বলিতেছেন “বাঃ শরীরের একটা

অবস্থার পরিবর্তন মাত্র হইল, ইহাতে ভাবের পরিবর্তন হইবার কারণ কি? যেন একটা জিনিষ এঘর হইতে ও ঘরে রাখা হইল তোদের দৃষ্টিতে, আজ্ঞার আবার যাওয়া আসা আছে না কি?” ৩ভোলানাথকে সংস্কার করিবার জন্য নিয়া গেলে পর লছমী রানী মাঝে না কি বলিলেন “মা, হাত মুখ ধুইয়া নেও।” মাঝে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিল পরে এক গ্লাস জল খাইতে দিল মা খাইলেন পরে শুইয়া কথা বার্তা বলিতে লাগিলেন। মাও এই সব কথায় যোগ দিতেছেন। বেশ পরিবর্তন করার কথায় মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন “দেখ জাগতিক নিয়ম এই যে এই ঘটনা হইলে পাড়া প্রতিবেশী বা আজীয়ারা আসিয়া নূতন বেশে সাজাইয়া দেয় অথবা মনের দুঃখে “আমি আর কাহার জন্য সাজ করিব” এই ভাবে নিজেরাই সব খুলিয়া ফেলে পরে ইহাই একটা নিয়ম হইয়া গিয়াছে যে অপর কেহ আসিয়াও তাহাকে সেই নূতন বেশে সাজাইয়া দেয়। এখানে কেহই তাহা আসিয়া করিলও না, নিজের ভিতর হইতেও কিছু একটা হইয়াছে বলিয়াই জাগিল না তাই যেমন তেমনই আছে।” আমি বলিলাম “মা, তুমি যদি প্রথম হইতে ৩ভোলানাথকে কোন রকম অবজ্ঞা করিয়া আসিতে তবে লোকে বলিতে পারিত সেই জন্মই তাঁহার মৃত্যুতে তোমার এই ভাব, তুমি সে সুযোগও দিলে না। তোমার মত পতি ভক্তি জগতে দুর্লভ, সেই ভাবের পর এই সময়তে এই ভাব দেখিয়া

সকলে অবাক। বিশেষতঃ শত্রু হইলেও যে এই সময়েতে প্রাণ কাহারও স্থির রাখা কত দুষ্কর, তাহা জগতে সকলেই জানে। কত খেলাই মা তুমি দেখাইলে।” এই বলিয়া আমি চূপ করিলাম। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন “কেন ইহা কি একটা বিশেষ কিছু ঘটনা নাকি? ইহাত অতি সাধারণ কথা। ভয়ানক কথা তোমরা মনে করিতেছ কেন?” আমি আর কিছু জবাব দিলাম না। ৩ভোলানাথের সহিত মার ব্যবহার দেখিয়া অনেকেই হয়ত মার এই ভাব ধারণাই করিতে পারিতেছেন না। শুধু এই ঘটনা বলিয়া নয় মা হয়ত এক জনকে নিয়া বেশ আদর করিতেছেন কিন্তু পরক্ষণেই জাগতিক ভাবে দেখিলে মা তাহাকে এমন ব্যথা দিলেন যে কাহারও ধারণায় তাহা আসিবে না। ভাজিতে বা গড়িতে মার মুহূর্ত্ত সময়ও লাগে না। এমন হাসিতে হাসিতে এই ভাজা গড়ার লীলা করেন দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া যায়। আর জগতে এই ভাব ধারণা করাও যে কত কঠিন। মার তুলনা একমাত্র মাই।

রাত্রিতে মা শুইয়া আছেন, আমি কাছে বসিয়া আছি, কথায় কথায় মা বলিতেছেন “দেখ এই শরীরটার (নিজ শরীর দেখাইয়া) গতি কি রকম জান? যেমন শিশু ছেলে মেয়েদের পড়াইতে গিয়া তাহাদের ক, খয়ের বইখানা নিজ হাতে নিয়া নিজেও শিশুদের মত করিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেয়। ক, খ লিখা শিখাইতে গিয়া প্লেট পেন্সিল

নিজ হাতে লইয়া শিশুদের মত করিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিল, সে কি আর লিখিতে বা পড়িতে জানে না? তবুও দরকার মত ইহা করিতেছে, এই শরীরটারও সেই রকম দরকার মত সব হইয়া যায়। আর একটা কথা যাহার জন্মই হউক যে সম্প্রদায়েরই সাধক হউক (এখানে ত সম্প্রদায় বলিয়া কোন কথা নাই) সাধকের এই পথের সহায়ক বস্তুকু দরকার এই শরীরটা দিয়া তাহা হইয়া যাইতেছে। সহায়ক কর্ম অর্থাৎ তাহাদের সেবা আর কি? দয়া করিয়া করাইয়া নিতেছে। অনেক রাত্রি হইল মা ও আমি শয়ন করিলাম।

২৭শে আশ্বিন, শুক্রবার :—

আজও ভোরে যোগেশদাদা সকলকে নিয়া কীর্তন করিলেন। মা প্রায় ৮টার উঠিয়া বসিলেন। আজ মাকে বেলা ১০টার স্নান করাইয়া দিলাম। কাল মা বৈকালে উঠিয়াই বলিয়াছিলেন “খুকুনি, আমি তোমাকে কিছু বলি নাই? আমি যেন বলিতেছিলাম ‘একটা খারাপ টেলিগ্রাম আসিয়াছে’। আমি বলিলাম “আবার খারাপ টেলিগ্রাম কোথা হইতে আসিতেছে?” মা কিছু বলিলেন না। আজ কথায় কথায় বলিলেন “দেখ, এই যে কথা হয় তাহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব সময়ের কথাই হইয়া যাইতেছে তোমরা তাহা ধরিতে পার না সব কথাই ভবিষ্যৎ বা বর্তমানের বলিয়া মনে কর।” আজও বেলা প্রায় ১১টার মার ভোগ হইল। ভোগের পর সকলে ডাকের চিঠি নিয়া আসিয়া মাকে

কিছু কিছু শুনাইতেছেন কোন কোনটার জবাব অতি সজ্ঞেপে শুনা মাত্র হইয়া গেল। আবার সব চিঠি শুনিলেনও না। ১২টা বাজিয়া গেল ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মাঝে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইল। সব সময় সব কথা বলিতে ত দূরে থাকুক শুনিতে পর্য্যন্ত পারেন না। এই জন্য চিঠি পত্র গুলি সময় মত দুই চার খানা করিয়া শোনান হয়।

আজ মা ৪টায় উঠিবার পূর্বেই করজাবাদ হইতে গোলার বাবা পণ্ডিত মনকেশ্বর রয়নার এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে গোলার হিষ্টিরিয়ার মত হইতেছে। কালই মা খারাপ টেলিগ্রাম আগিতেছে বলিয়াছিলেন।

আজ মা বৈকালে জল খাইতে বসিয়া আমাকে বলিতেছেন “ঠিক দেখিতেছিলাম জান? দেখিতেছিলাম একটি লোক যেন অপমৃত্যু মরিতেছিল ঠিক সেই সময়তে এই শরীরটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) গিয়া তথায় হাজির হইল এবং খেয়াল হইল অপমৃত্যু মরিতে দেওয়া হইবে না। এই খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গেই সেই লোকটির ভিতরে একটা আনন্দের ভাব আসিল অপমৃত্যুর ভাবটা তাহার ভিতর একেবারেই রহিল না।” আমি বলিলাম “মা, তাহা হইলে বাহির হইতে যদিও দেখা গেল সেই লোকটা অপমৃত্যু মরিতে যাইতেছে বাস্তবিক তাহার অপমৃত্যু মরার সঙ্কল্পে পাপ হইল না, গতি তাহার ভাল হইয়া গেল।” মা বলিলেন “ঠিক তাই, তবে সব সময়ই যে ইহা হয় তাহা কিন্তু নয়।” আমি বলিলাম

“মা, তাই ত বলা হয় বাহির হইতে বাহা দেখা যায় তাহা সব সময় প্রকৃত দেখা নয়।” মা বলিলেন “ইহা কিন্তু ভিতরের অবস্থা বুঝিয়া।”

রাত্রিতে মা বাহিরে একটু পায়চারি করিতেছেন ভোলানাথের কথা উঠিল আমি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছি মা উত্তরে বলিতেছেন “দেখ ভোলানাথের যে ভাবে প্রাণ-বায়ু বাহির হইল কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। এমনও হইতে পারিত আমি হয়ত অপর যায়গায় বসিয়া আছি এর মধ্যে প্রাণ-বায়ু ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। কারণ বাহির হইতে কেহ বুঝিতেই পারে নাই যে এখনই প্রাণ বাহির হইবে। আমি যে কীর্তন করিতে বলিতেছি এটা ওটা ঠিক করিতে বলিতেছি সকলে মনে করিতেছে এমনই করিতেছি। ভোলানাথ সে দিন অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়াই সকলের বিশ্বাস ছিল। কথা বার্তা বলিতে বলিতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তারপর দেখা যায় প্রাণত্যাগের পূর্বে পা টান হইয়া যায়, কত কি, কিন্তু এ কিছুই নয়, কাত হইয়া, পা গুটাইয়া, শুইয়া ছিলেন দেহত্যাগের কিছুক্ষণ আগেই চিৎ হইয়া শুইলেন, সহজ ভাবে। তারপর প্রাণত্যাগ হইল। একবার উঠাইয়া বসাইতে বলিয়াছিল, যদি বসান হইত বসিয়া বসিয়াই প্রাণত্যাগ হইত।” এই বলিয়া আবার বলিতেছেন “দেখ বাহা হইবার তাহা হইবেই। ভোলানাথ ত কত সময় আমার সঙ্গে থাকেও নাই কিন্তু মৃত্যু সময় কাছেই রহিল। সম্ভাব্য মৃত্যু সময় আমার কাছে,

নির্মলবাবু কোথা হইতে মৃত্যু সময় গিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতিষও কত বায়গায় থাকিত কিন্তু মৃত্যু সময় কাছেই রহিল। যাহা হইবার এমনিই হইয়া যায়।” রাত্রি প্রায় ১০টায় মা শুইলেন।

২৮শে শ্রাবণ শনিবার :—

আজ প্রতি দিনের মতই মা বৈকালে উঠিয়া বসিয়াছেন। বেবীদিদি ও টুনুর মা (৩অতুলদত্ত মহাশয়ের স্ত্রী) আজ মার দর্শনে কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রায়পুর হইতে বিশু ব্রহ্মচারী, শচী এবং তথাকার আরও দুই তিনটি লোক মার দর্শনে আসিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের একটি শিষ্য ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক মার আশ্রয়েই কয়েক মাস যাবত আছেন, মা তাহাকে রায়পুরে রাখিয়াছেন। তিনিও দুই দিন যাবত মার দর্শনে আসিয়াছেন সকলে বৈকালে মার কাছে বসিয়াছেন। শচী ব্রহ্মচারী মৌন আছে। মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন “মৌন থাকিয়া কি ফল হইল? মৌন থাকিয়া মনে মনে নাম না চলিলে গাছে ফুল ফল হয় না। আমরা ত ফুল ফল সবই চাই। বীজটি শুধু মাটিতে পুতিয়া রাখিলেই কি আর ভাল গাছ হয়। তাহার বত্ত চাই।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আর্য্য সমাজের সরস্বতী দেবী দুই চারটি স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। সরস্বতী দেবী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহারা এবং বেবীদিদি প্রভৃতি সকলেই মাঝে নিয়া পূর্বদিকের

বারান্দায় বসিয়াছেন। বেবীদিদি স্বামী পুত্র হারাইয়া এই প্রথম মার কাছে আসিয়াছেন। চোখে জল তবুও শান্ত ভাবে আছেন। মা সকলের কাছে বেবীদিদির কথা বলিয়া বলিতেছেন “যোগিনী করিয়া দিয়া গিয়াছে তাঁহার সঙ্গে যোগবৃদ্ধ হইবার জন্ম। এ হৃদয় হইল তাঁর আসন তিনি এই আসনে আছেনই এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে অনুভব করিবার জন্মই সাধন ভজন করিতে হয়। তিনি নিত্য তাঁর আসনে অনিত্য অর্থাৎ বে জিনিবের আসা যাওয়া আছে তাহাদিগকে বসাইলে তাঁর আসনের সম্মান রক্ষা হইবে কেন? সেই অনিত্য জিনিবের আসা যাওয়া আছেই, কাজেই ব্যথা পাইতে হয়। ঝাঁর আসন তাঁকে না বসাইয়া অপরকে বসাইলেই কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে।” এই সব নানা কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল মা সরস্বতী দেবীকে একটা গান করিতে বলিলেন। তিনি নিজেদের ভাষায় একটি গান করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া অনিচ্ছায়ও সকলে বিদায় নিলেন। রাত্রিতেও কীর্তনাদির পর কল্পবাজারের দেবেন্দ্র বাবুরা মার কাছে বসিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। রাত্রি ১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

২৯শে শ্রাবণ রবিবার :—

আজ মা সকালে উঠিয়া বসিতেই যোগেশদাদা কয়েক খানা চিঠি নিয়া মার কাছে গেলেন। মা দরকারী কথার উত্তরে দুই একটি কথা বলিতেছেন। সব সময় ইহাও বলা হয় না। আজ দুপুরে কথায় কথায় ভোগ ত্যাগের কথা উঠিল। আমি

বলিলাম “মা তোমার মত ভোগও ত কেহ করিতে পারিবে না। যখন ঢাকাতে তোমাকে বেনারসী ও কত গহনা দিয়া সাজাইয়া দিত তাহা নিয়াই তুমি কয় দিন রহিয়া গেলে। চার পাঁচটি হার গলায় জড়াজড়ি হইয়া রহিল তাহাতে গলা কাটিয়া রক্তও বাহির হইল তাহাতেও তোমার ভ্রক্ষেপ নাই হার পরিয়াই আছ। মা হাসিতে লাগিলেন।

আবার কথা উঠিল শাহবাগে যে পাঠাটি ছিল (মা বাহার বলি বন্ধ করিয়াছিলেন) তাহার কথায় মা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে বলিতেছেন “তোমরা দেখিয়াছত কীর্তনের সময় আমি গিয়া বসিলেই কেমন এক হাটুর উপর পাঠাটি এবং অন্য হাটুর উপর কুকুরটি মাখা রাখিয়া শুইত; আবার লুটের সময় দুই পা উঠাইয়া কি ভাবে নাচিয়া নাচিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত।” আমি বলিলাম “মা তুমি ত কথায় কথায় বলিয়াছিলে পূর্ববজনে পাঠাটি সন্ন্যাসী ছিল।” মা বলিলেন “হাঁ, সন্ন্যাস বেশধারী ছিল, প্রকৃত সন্ন্যাস হইলেত হইয়াই গেল।”

আজ দুপুরে মা শুইয়া আছেন একটি ছেলে কবিতায় মাকে নিজের দুঃখ ইত্যাদি জানাইয়া চিঠি দিয়াছে। লিখিয়াছে “মা আমাকে কোটি কোটি লোকের দুঃখ দূর করিতে শক্তি দাও, জগতটাকে ওলট পালট করিবার শক্তি দাও,” এই সব কথার উত্তরে মা বলিতেছেন “লিখিয়া দাও প্রথম, তোমার জগৎবুদ্ধিটা এবং তোমার নিজের দুঃখটা দূর করিবার চেষ্টা কর। সেই সব ভাবের সহায়ক চেষ্টা ও কর্মাদি সঙ্গে সঙ্গে রাখিও।”

হেনোটি সাধন ভজনের জন্ত কিছু দিন তারাপীঠে ছিল তারপর চাকুরীর একটা খবর পাইয়া চলিয়া আসিয়াছে তাই মা নিখিলেন “অন্য যে কোন কর্মই কর এই ভাবের সহায়ক কর্ম। সঙ্গে সঙ্গে রাখিও।” অত্যাণ্ড অনেক ভাবে জীবনের ব্যর্থতার জন্ত দুঃখ করিয়া কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইয়াছে। মা শুইয়া শুইয়া সে সব শুনিয়া হাসিতে হাসিতে ছেলে মানুষের মত কবিতা মিলাইয়া মিলাইয়া বলিতেছেন আবার নিজেই ছেলেমানুষের মত মহাআনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কখনও এই ভাবে উঠিয়া বসিতেছেন কখনও শুইতেছেন। কবিতাগুলি যথা :—

“মাকে নিয়ে তারাপীঠে বসেছিলে
(তাকে) কৈলে কেন গেলে ?
(একটু আশার আলোক পেয়ে)

কি আশায় যুর্ছ ফির্ছ নাইকো তথায় সুখ
যতই ঘোর যতই ফির, পাবে কেবল দুঃখ
(ক্ষণিক সুখে ভুলনা ভুলনা)
(ঘরের ছেলে ঘরে চল)

যদিও উপস্থিত তোমার লাগছে ভাল
স্মরণে রাখিও সদা, নাই যে সেখায় আলো

আসিতে দিও না নামের ধরা

(তবেই জানতে পারবে)

তিনি আছেন যে তোমার ধরা

যেখানে সেখানে থাকনা কেন দাঁড়ায়ে

(মনে রেখো) তিনি যে আছেন সদা তোমার পানে চেয়ে

ছেলেটি আরও লিখিয়াছিল কতকটা এই ভাবের, জগতে
এত সব ভোগ্য বস্তু এত সৌন্দর্য কেন দিলে যদি তাহা
ভোগ করাই অন্য় হয়। তুমিইত এত সুন্দর করে সব
গড়েছ তা ত্যাগ করাই যদি তোমার বিধান হয়, তবে শক্তি
দাও, মনে বল দাও—কবিতাটি এই—

“কে করেছে ভোগ সৃষ্টি

নানান ভাবেতে

কে গড়েছে তার মূর্তি

রূপের আভাতে

ছেড়ে থাকা সে সবই যদি

তোমার বিধান

সে বিধি পালনে তবে

দাও দৃঢ় প্রাণ।”

মা উত্তরে বলিলেন—“জগতে যত কিছু সুন্দর দেখনা
কেন, মনে করিও তাঁরই নানা ভাবে স্মরণ।” মার অমুস্থ
শরীর এই সংবাদ শুনিয়া ছেলেটি লিখিয়া ছিল “মা! তোমার
সব রোগ, শোক, তাপ, জ্বালা আমায় দাও” এই কথার উত্তরে
মা বলিতেছেন “বাবাকে লিখে দাও এখান থেকে দেবার মত

রোগ, শোক, তাপ, জ্বালা কিছুই যে দেখা দেয় না কি করে তোমায় পাঠাব বল দেখি ?”

বৈকালে মা উঠিবার পূর্বেই অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। মা উঠিতেই সকলে মাকে ঘেরিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার পর পর্যন্ত সকলেই বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সকলেই বিদায় নিলেন।

৩০শে শ্রাবণ. সোমবার :—

সোলন হইতে অভয় আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মার হাতের ব্যথা এখন নাই বলিলেই হয়। কাল রাত্রিতে হাত খানায় একটু হাত বুলাইয়া দিতেছি, ঘরে আর কেহ নাই; চোখ বুজিয়া মা শুইয়া আছেন বলিতেছেন “তোমরা শরীরটা রাখিতে চাহিতেছ, বেশ দেখিবার জন্য রাখিতে চাও রাখ, কিন্তু কেমন যেন ভিতর হইতে একটু “চূপ” ভাব আসিতেছে, দেখিতেছ না কথা বেশী হইতেছেনা”। আমি বলিলাম “মা কথা বেশী হইতেছেনা তাহাও দেখিতেছি কিন্তু এ সব কথা কেন বলিতেছ মা? তুমি স্তম্ভ শরীরে থাক যখন যাহা দরকার তাহা সকলকে বলিয়া দেও, ইহা ও কি আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা। এই রকম ভাবের দুই চারিটি কথা হইল।

৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার—

আজ উল্লেখ যোগ্য কিছু ঘটনা নাই। আজ বৈকালে অভয় অনেকক্ষণ কীর্তন করিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যোগ দিলেন।

৩২শে শ্রাবণ বুধবার—

আজ এলাহাবাদ হইতে এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ সিংহ ১২ ঘণ্টার জন্ত সময় পাইয়া মার দর্শনে আসিয়াছেন। বেলা প্রায় ৯টায় তিনি মাঝে নিয়া রায়পুর বেড়াইতে গেলেন। বেবী দ্বিদিও দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী রায়পুর দেখেন নাই তাই তাহারাও সঙ্গে গেলেন। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিলেন মার ভোগ হইল। ভোগের পর বিশ্রাম করিবার জন্ত মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বেলা ৪টায় মা উঠিলেন। সকলে দর্শনে আসিয়াছেন।

আজ অভয় ও কমলাকান্তের নিকট শুনিলাম ইতিমধ্যে চার দিন (রায়পুর দুই দিন এবং কিষণপুর দুইদিন) মার মুখ হইতে পূর্বের মত স্তোত্রাদি বাহির হইয়াছিল। প্রথম দিন রায়পুর রাত্রি প্রায় ১১টায় হঠাৎ মার মুখ হইতে এই নিম্নলিখিত গানটি বাহির হইল, অভয় যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছে বলাই বাহুল্য অনেক শব্দই লিখিতে পারে নাই। কোনটাই কেহ ঠিকমত লিখিতে পারে নাই তবুও যথাসাধ্য লেখা হইয়াছে।

১। যথা রথে পরং অন্তাবিভ...পরোনিজ্

রূপপমুখ জনো

সিস্ত...প্রমালতং...বিততালকং সতো...

সালেপপা শতোপশ... ..সমাসত

নরভিব নম পরোপিত

... ... সংজ্ঞায়
 প্রমোদিত বৃত্তস্বা ... প্রপেতনং ... বিধাবতম্
 ববেশতু ... প্রসম্বল ... বিসরোপব ...
 করোত্তম্ ... সম্ভ্রা ... প্রসান্দিত ... আন্দেসূত্র
 তমানিব ... প্রসাদৃশ্য
 বিবস্বতো
 স্বতোশতো ... বিভবৎ
 অনুপপাৎ ... স্তাসিত ... লস্তাদৃশ্য
 অঃ প্রিত, উঃ প্রেত ... অ, এ, ওঃ
 ও ব্রহ্ম ই প্রে বারি

দ্বিতীয়টি কিশগপুর আশ্রমে রাত্রি প্রায় চটায় পশ্চিম
 দিকের বারান্দায় বসিয়া নিম্নলিখিত গান করিতে ছিলেন পরে
 বলিয়াছেন ইহা ভগবানের বর্ণনা ও ভজন—

২। জন্মবাপি ভজামি ... লোকা ...
 যামস্ব ভবানং বিশালং বিস্তাবে
 হারকং। ... সতত ভ ... ।
 যে সন্তয় রা কলতয়ে
 যে যা ... পাদবহাং ... করোমি যে ...
 নিরালোকস্তাং ।
 যা দা ত্বং শিখণং ।
 মি যা রাং হা—শুভাশুভ ।
 প্রপানং দে দাসং স্তুভাং বে ভবাদিনং ।

সৈয়া...তিলে ভবানি হু হানং
 ভবানী হাল...লভে । স্মরতি...মাধব ।
 মনোবেশং শামং প্রসং দিব
 নিপ্রভাদি দানং প্রভমহ্যং নম মম ।
 হা ও... । অহং ভবং হা হা ।
 অহং সংশ্রী । বেদং ভবকারণাসিদ ।
 সরূপ বিভবানভং কৃতোদৃপি সম্ভবা পদং ।
 প্রভাকরং ।
 মহারুদ্র ... । ভাললং ... ।
 হসামি...যানম্ । তম্ আন...নমামি... ।
 শুভাপদং... । লোক বা ।
 শিবাণ প্রণমে... । নমস্তে যত্র জনার্দনং
 ... সগায়ত্রী । হৃদারণং... । শুভাশুভ
 ভাবরুদ্র... । ক্রণোবিষ্ণুং । সংসার... ।
 যস্মানং প্রশমে সংস্তানা... । মায় ।
 কৃ বা তব ॥ সংসারশ্চ...প্রণবাব... ।
 সংশবা সবম্ । প্রবাতব । শেবা প্রবা
 তমম্ নিশানতি । যদুবেতি হ প্রবায়তু ।
 শিবাহ ততো । পিবাবেব মমাবহম্ ।
 তৎকালো শাসিত কলাপং । ভবতি বো
 ভবাপহং । প্রবাসে ত... । প্রবা নিসেব ।
 প্রবাতি যে... । বাসৎসা প্রবাসমম্ ।

ভবায়ত্র সর্বস্বব । সমাসে তথে তবা তবে... ।
 নিস্তারস্ত প্রীতি... । যস্মা জনো বেশা... ।
 তত্র হা তব । করোহপি সং... ।
 ময়াহি...স্বাদ্ধ করোতি বঃ । নস্মামি... ।
 তত্রে ত সা হর সার ত্রি...হতো । করোতে
 ত । জননী ত্ব ত্ববে ত্বয়োক্ । যা নিত্য দ্যুতিত্ব ।
 হা হর নঃ বুনোহস্মি । যস্মাহং...স্বামী... ।
 কনকেত বিল্লোজা... । যো...সো... প্রবাতঃ,
 প্রবাল ভবতে । ঋ ঋ বেব বিবদে... । আহানঃ
 বা হা প্রবোদেব... । সক্রোহপি...বিভয় ।
 শক্রবং ক্ষু...দায়বং ; যো বঃ ক্রিধা
 হা হ অপবারয়, শাসি হো স্ত্রুবম্ ।

কিছু পরে এইরূপ বাহির হইল—

“জনা গাওত চলত খড়ীমে”

এই কথাতে হয়ত, তব উপদেশ স্থলে, সেইদন মাতৃ
 সকলাৎ নিষ্ক্রান্ত (নিরোজ বাবুর পরিবার) রোরুদ্যমান
 পথিকদের উপদেশ দিলেন—সংসারে লোকেরা কখনও গানে
 আনন্দে কখনও সংসার চক্রের আবর্তনে খুড়িয়া কষ্ট
 পাইতেছ—আশ্রয় করানার্থে এই উক্তি ।

বৃহস্পতিবার রাত্র ১টা রায়পুর স্তোত্রান্তে যা বাহিরে
 বেড়াইতে লাগিলেন—

৩। যে জাল...। নিত্য ... নমস্তে যন্ত নমস্তে ভব।
 বা...দো...মে...যা...কারস্য বিশ্ব...য...যে...ববন...মে।
 শাস্তবে...। সংস্তবে প্রণবি...ভবান্নো...এবদ্রে সমায় বঃ
 সমস্তবে পরমেশ। সংখারি প্রাপ্যল...। সংবাবেদ বিশাবিত্য
 হংবাস্তে সমা-বিলম্...প্রমাপ্যেৎ। প্রভাভব সংহারে
 সমায়ম্। শশাকিচ প্রপথে ন প্রভাতে...।
 প্রভাতে ত প্রমলাজ প্রণতে ন সহায় সমাস্যে সঙ্কো সা
 পরমেশ্বন ক্রমেণৈব জিহাবিত্য নীল প্র আহা ইদবিব
 সমায় মমঃ। বিধরিত্র রা রং মহত্বে চানক্য
 সঙ্গেন শক্রশ্বেদ হংসে রাত্রিদঃ যে জয় জজ্জহার...।
 সংয় রা প্রবেশ্য বিভ্রো...প্রভাতে। প্রবিনকাহা...।
 আহা...নমামি ভাস্বর বি...। লা লা লা লে বাপ্রবে।
 প্র রা প্র নারীস্তাঃ শক্তি স পত্রি। সার হইলো
 ন...। ধন প্রবল্য যার স্তি পা পা লি ব্রহ্ম ব্রহ্ম
 স্ব মে। নমস্ত ত ... হ।

ও ম্ স্বেহন্তম। (৩৪ বার উচ্চারণ করিলেন)। দ্র
 আত্রেয়দয়...ওমস্বম্ ওম্ সোহ অম্। (৪৫ বার ভৈরব স্মর)
 বা বারে যান্নং বাবা বালাং ববা যন্মাবেশ্য
 স্তবা বা বা...যন্মৈ স্বস্তবে...যিস্...শ্বেদ
 ভেদাভেদ ব্যাবজা বিদত্তা সাকিৎ বেদ বেশ
 বেদ লোপঃ বালাঃ হাহাঃ...নিত্যম্ সঙ্কো
 রূপে...লাবেদ সত্তালস্ত ভবান্তম্ সমস্ত

তো বেদ হংসা...সংযা টলে স টলো
 রন্তো মে রোকং শত্রু টোকং...লাহা জাকাহা ।
 স্ববাস্তিচাঃ এঃ নমস্তাবাঃ অঃ আঃ শত্রুস্পদেহাত্ত
 আঃ বি আঃ শত্রুবেদ্য । আঃ নমস্তে ব্রহ্ম
 প্রপাদ্ধি অন্ত প্রবালে নমস্তে অস্য ।
 অহং শ্রভাং শ্রভম্ । ত্বিষ রাঙ্কেনাত্ৰিঃ স্বেদ
 রোমত্বিদাম্ প্রমত্তে নম প্রস্ব প্রবৃন্তি রং রবন্তে
 বন্ধাবিত্তম্ । রথ্যা ত্তোরীং, ব্রহ্মবস্তবি ব্রহ্মস্বিষ
 প্রতিবাবত্তম্ রম্যন্তি ।

স্তোত্র কিষণপুর আশ্রমে শুরা রাত্রি ১১টায় গান—শ্রোতা
 শ্রবণেচ্ছ সূক্ষ্মদেহী ঋষিগণ ।

প্রবলরূপমিতি...নমঃ । বিপরমা...নমঃ । বিশ্ববান্ধ...
 জন্মে বিভো বিপত্তান্তব...সর্গবেশন্তিতম্ ।...জন্ম...বিশ্বতা...
 বিশ্বব্রহ্মাস্য কা... । শস্তো, শস্তো, প্রেমস্য মতিসার ভবতঃ ।
 ভবিত ভয়ো জায়ন্তা ঋতবে করুণাসদ্র...মান...লক্ষবে । ভবতা
 বাস্তবে...প্রবসে প্র ব স্বস্তবে শান্ত পার বিশ্বভো নমঃ
 ভুবলোক পথা । বা আ হা । বাহুস্য বিশ্বসংহার সবিতো
 মহান্তবান্ধা ব্রহ্মজ্ঞা যথা প্রান্তবগ্র... । প্রাণ মে প্র বিদ
 প্রোন্তিবো কঃ শাণ স্বেদো প্রমাত্তানঃ সরন্তে রন্তোন্তবলা
 আন্তবলা । বিশ্ববে আন্তবে । ঋতবা শমতে বাক্যং ভব...
 দমলে যাস্যতু । জয়া...শিবে । অপত্য বারণা...সাগ্রম
 প্রবাতি বশ্চ প্রবদাসি তবে । যো প্রমাতি মুনিঃ...সংসার ।

...প্রমত্তে এব ওম্ হ প্রাহাম্। ভবভীতি প্রবত্যে...সমহা
 প্রহা পি প্রমাতঃ পিহ। প্রম্ হ পমান প্রিহ...স্তি প্রীঃ।
 সন্ন্যাস ক্র প্রথমে প্রণ প্রমুখ ভরণম্। প্র ক্রা লহন্তাঃ সন্ন্যস্তমঃ।
 প্রমানপিত। হা হা নি সররস্তিঃ স্থস্য রাহাঃ বিরস্তনা ব্রো ত্রী
 সংস্তে তার স্থপ্রতি সবো বিবিস্তস্যো। স্থপ্রসবো রো-
 মৃত্যুসংহার। প্রবাহাঃ ব্রো ব্রাহাম্...রো মৃত্যে। স্বাহা স্তঃ
 নামীস্তঃ বাদি পাহা। শ্রোতস্যোতম্...শোভা। ওম্ প্র প্রো
 ...স্তাঃ ন ক্ষে আঃ প্রীতে প্রণমেতম্। প্রভপিত মাম্। প্রাম্
 লেল্লাম্। প্রে প্রম খন্ত স্র।

৩২শে শ্রাবণ বুধবার—

আজ মার সঙ্গে নানা কথা হইতেছে বেবী দিদি শোকার্ভা
 কিন্তু বেশ শান্ত ভাবেই আছেন। ককস বাজারের দেবেন্দ্র
 বাবুর স্ত্রী সব কয়টা (৭টি) সন্তান হারাইয়া পাগলের মত
 হইয়া আছেন। পূর্বেই ইহার কথা লিখা হইয়াছে। ককস
 বাজার মাকে পাইয়া ইনি অনেকটা শান্ত হন। কয়েকদিন
 হয় তিনি এখানে আসিয়াছেন। মাকে পাইলে তিনি
 অনেকটা শান্ত হন। মার কাছে একটা বিশেষত্ব এই যে
 এখানে শোক দুঃখ পাইবে না, এমন নয় বরং তাহার উল্টা
 অনেক স্থানে দেখা যাইতেছে কিন্তু সহ করিবার শক্তি মার
 নিকট হইতে পাওয়া যায়। মাকে এই কথা বলায় মাও
 হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন এখানে আসিলে যে কাহারও
 তোমাদের দৃষ্টিতে বিপদ হইবে না তাহা মনে করিও না রোগ

জগতের নিয়ম। শোক ইত্যাদিও যত বিপদ আশ্রক না কেন সহ্য করিতে পারা হইল বড় কথা। আমি বলিলাম মা ঠিকই বলিয়াছে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাই ত এই যে সহ্য করিবার শক্তি যেন থাকে। মহাভারতে এবং অগ্ন্যস্ত্র অনেক স্থানেই দেখা যায় এই পথের যাহারা পথিক জাগতিক হিসাবে দুঃখ কষ্ট তাহাদেরই বেশী হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিচলিত হন নাই, বীরের মত চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত পাণ্ডবদের দুঃখ কষ্টের অবধি ছিল না। তার সহ্য করিবার শক্তি তিনি দিয়াছিলেন তাই তাঁহারা অবিশ্বাসী বা বিচলিত হন নাই। এই ত প্রকৃত কৃপা। যাহারা এত বড় দান (অর্থাৎ শক্তি সঞ্চার) করিতে পারেন না তাহারাই সাধারণ বিষয় ২১টি রোগ শোক হইতে বাঁচাইয়া নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন।

কিন্তু কতটুকু সাহায্য তাহারা এইভাবে করিতে পারেন? প্রকৃত ভাবে সাহায্য করিবার যে তাহাদের শক্তি নাই। মা আরও ২১টি কথা বলিলেন। আবার কথা হইল কত বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়া মা সামঞ্জস্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। সব কথা প্রকাশ করা যাইবে না কারণ সকলে এই প্রকাশের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন না। অনেকে হয়ত ভুল বুঝিবেন। তাই অনেক কথা অপ্রকাশ রহিয়া গেল কিন্তু ইহাও সত্য কথা যে, মার সংস্রবে যিনিই আসিতেছেন তিনিই মার উপরোক্ত ভাবের পরিচয় পাইতেছেন ও আশ্চর্য্য হইয়া

হাইতেছেন আজ কথায় কথায় আরও একটি কথা উঠিয়াছে কামাখ্যা পাহাড়ের কথা। সেখানে যে নির্মল বাবুর স্ত্রী মার সঙ্গে বাহিরে গিয়া ভয় ও কি রকম একটু ভাব পাইয়াছিলেন, এবং পরে মা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ঐ সময়তে তিনি পাহাড় ভরা ছোট ছোট ঋষিদের মূর্তি এবং অগ্ন্যাগ্ন আরও কত কি দেখিয়াছিলেন। সব কথা ত সব সময় বাহির হয় না। বীরেন দাদারা সব যখন মার কাছে ছিলেন তখন মার মুখ হইতে একথাটা আরও পরিষ্কার হইয়া বাহির হইল' এইসব ঋষি, মুনি প্রভৃতি কত কি কামাখ্যা পাহাড়টা যেন ভরিয়া গিয়াছে এইভাবে দেখিয়া ছিলাম, ঐ সব এই শরীরটা (নিজের শরীর দেখাইয়া) হইতেই যেন সব প্রকাশ হইতেছিল দেখিতে ছিলাম।" আজও কথায় কথায় আমাকে একান্তে এই সব ভাবের কথাই অনেক বলিলেন। তবে—সবটা গুছাইয়া বলিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু যতটুকু বলিলেন পরিষ্কার এই ভাবেরই কথা। আমি অবাক হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিলাম।

আগামী কল্য ৬শ্রীশ্রীজন্মাস্তমী আশ্রমে অষ্ট প্রহর কীর্তন হইবে ঠিক হইয়াছে।—

১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার

আজ ভোর ৫।০ টায় কীর্তন শুরু হইল সন্ধ্যায় মাকে একবার মনোহর মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল তথায় জন্মাস্তমীর উৎসব হয়। রাত্রিতে মা মেয়েদের নিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টা

কীৰ্ত্তন করিলেন। মেয়েরা ৫৭ জন আসিয়াছিলেন বেশ আনন্দ হইল। প্রায় সারারাত সকলে জাগিয়া ২৪ ঘণ্টার কীৰ্ত্তন সমাপ্ত হইল। পরে মাকে মুখ ধোয়াইয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্ত শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মা সারারাতই প্রায় কীৰ্ত্তনে বসিয়াছিলেন। আজ প্রতি বছরের মত জন্মাষ্টমীতে আনন্দচকে মার যজ্ঞ মন্দিরে যজ্ঞ হইবে পূর্বেই এই যজ্ঞ আরম্ভের কথা লিখা হইয়াছে। আনন্দচকে শ্রীযুক্ত কালীনাথ টঙ্কাই (কাশ্মীরী) এ বিষয় প্রধান উত্তোগী। তাহাদের যজ্ঞে প্রতি বৎসরই নিয়মিত ভাবে যজ্ঞ হইতেছে। আজও বেলা প্রায় ৮টার আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত মন্থবাবু যোগেস ব্রহ্মচারী, ও কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী যজ্ঞ করিতে মনোহর মন্দিরে চলিয়া গেলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইবার পূর্বেই অর্থাৎ বেলা প্রায় ১২টার একটা বাসে করিয়া মার সঙ্গে আশ্রমের দলবল সকলে যজ্ঞ দেখিতে চলিলেন। মা সেখানে পৌছাইলে মন্থবাবু মাকে মন্দিরে বসাইয়া প্রথমে পূজা করিলেন পরে মার অনুমতি লইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এ দিকে সত্যবাবু (প্রফেসর), হরিরাম, অভয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনেকে দর্শনে আসিয়াছেন। যজ্ঞান্তে মন্থবাবু মায়ের আরতি করিলেন। আজ মায়ের ভোগ শ্রীযুক্ত কাশীববুর বাসাতেই হইল। একটি পণ্ডিত ভাল পাঠ করিতে পারেন তিনি আসিয়া খানিক সময় পাঠ করিবার জন্ত মার অনুমতি চাহিলেন।

মার সব সময়তেই এককথা। কেহ আশ্রম তৈয়ার করিতে চাহিয়া অনুমতি চাহিলেও মার সেই একই কথা “যাহা করিয়া তোমরা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হইতে পার বলিয়া মনে কর সেই সব কাজে সর্বদাই আনন্দ। তাহা কীৰ্তন করিয়াই হউক, জপ করিয়াই হউক, সৎসঙ্গ করিয়াই হউক যেরূপে পার নিজেদের উন্নতি সাধন করিয়া যাও।” মার অনুমতি পাইয়া খানিক সময় পাঠও হইল। সকলে মাকে নিয়া বসিয়া আছেন এর মধ্যে মা হরিরামকে বলিলেন “খুকুনি দিদিকে বল আজই মুসৌরী যাইবার খেয়াল হইতেছে।” আমি যজ্ঞ মন্দিরে ছিলাম, মা সকলকে নিয়া মনোহর মন্দিরের মাঝখানের বায়গায় বসিয়াছিলেন। আমি মারনিকট তৎক্ষণাৎ গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম মা বলিলেন “সময় বেশী নাই, এর মধ্যে যাইতে পারিবেনা?” আমি বলিলাম “কেন পারিবনা। আমি এখনই আশ্রমে গিয়া সব গুছাইয়া নিতেছি।” এই বলিয়া আমরা কয়েকজন আশ্রমে রওনা হইলাম, মা বলিলেন “আমি এখন হইতে মুসৌরী রওনা হইয়া যাইব পথে তোমাদের উঠাইয়া নিয়া যাইব।” তাই হইল বেলা প্রায় ৪টায় আমরা মুসৌরী রওনা হইয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত মন্থদাদা, যোগেশদাদা, এবং সাধন ব্রহ্মচারী এই কয়জন আশ্রমে রহিলেন, কক্স বাজারের দেবেন্দ্র বাবুরা আর সঙ্গে আসিলেননা তাহারা আশ্রম হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। বেবীদিদি ও টুমুর মা সঙ্গে আসিলেন।

আমরা মুসৌরী আসিয়া প্রথমে সনাতন ধর্মশালায় উঠিলাম। ১২১৩ জন সঙ্গে আসিয়াছি একটু অসুবিধা বোধ করায় মনসারামের একটা নূতন বাড়ী হইতেছিল এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই সেই বাড়ীরই একটা অংশে রাত্রিতেই আসিয়া স্থান নিলাম। মা আসিয়াছেন রাত্রির মধ্যেই খবর হইয়াগেল, অনেকে দর্শনে আসিয়াছেন। বাড়ীর মালিকের ম্যানেজার, চৌকিদার সব নার সেবার জন্ত সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ব্যস্ত হইল, কিন্তু বিশেষ কিছুই দরকার হইলনা। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন চট্টগ্রাম হইতে শশীদাদাও আজ কয়দিন যাবত মার নিকট আসিয়াছেন তিনি আগামী কল্য কলিকাতা যাইবেন আজ মার সঙ্গেই আসিয়াছেন।

২রা ভাদ্র, শুক্রবার :—

আজ প্রাতে বাড়ীর মালিক এবং আরও অনেকে মার দর্শনে আসিলেন। একটি ভদ্রমহিলা গতবার মাকে পাইয়া মেয়ে করিয়া নিয়াছিলেন তিনিও তাঁহার মা আসিয়া কত ভাবে মাকে আদর করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ১টায় আজ মায়ের ভোগ হইল।

বৈকালে মা উঠিয়াছেন। একবার একটি ঘটনা হইয়াছিল জনৈক ভক্ত একবার সপরিবারে আসিয়া মাকে বলেন তাহাদের একটা দুঃখের কারণ হইয়াছে এই যে তাহাদের একটি শিক্ষিতা মেয়ে তাহাদের অমতে নিজেদের বনিষ্ঠ

সম্পর্কের ভিতর বিবাহ করিয়াছে, এই ঘটনার মাতা একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। পরিণামে এই হইল যে এই ঘটনায় আঘাত পাইয়া মার প্রাণে ভগবানের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মিল সংসারে বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। ইহা আজ ৭-৮ বৎসরের কথা। সম্প্রতি উক্ত স্ত্রীলোকটি ধর্ম্মজীবনে বেশ উন্নতি করিতেছেন মেয়ের জন্ম তাহার আর কোন ব্যথার কথা শোনা যায় নাই। কিন্তু ঐ মেয়ে ও জামাতার পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনায় কয়েক বৎসর পর তিনি শ্রীশ্রীমাকে জানাইলেন “যে মা কি করিব? আমার প্রাণ আর এখন কিছুই চাহে না, আমি এই পথে বেশ আছি।” মা বাললেন “দেখ তুমি একটা কাজ কর তুমি দীক্ষা নিয়া পরে সেই সময়তেই ঐ মেয়ে জামাতাকে দীক্ষাদান করিয়া মেয়ে জামাতা রূপে নয় শিষ্যরূপে তাহাদের গ্রহণ কর।” পরে তাহাই তিনি করিলেন। এই কথা আজ বৈকালে উঠিয়াছে মা, আমাকে বলিতেছেন “দেখ আমি দেখিতেছিলাম মার প্রাণ যে গলিয়া গিয়া মোহের জগৎ মেয়ে জামাতা চাহিতেছে এ স্থলে তাহা নয়। মায়ের প্রাণ বেশ স্থির ধীর আছে, তাই এই ব্যবস্থা হইল। সব জায়গায়ই যে এরূপ হইবে তাহা কিন্তু নয়। আরও একটা কথা লক্ষ্য করিও এই মেয়ের জন্মই তাহার জীবন আজ ঐ দিকে চলিয়াছে। সংসার অসার এই ভাব তাহার ভিতরে জাগিয়াছে এবং নানা রকম ভগবৎ অনুভূতি পাইতেছে তাই ঐ মেয়ের কল্যাণ যে তাহার করিতেই হইবে।”

এই বলিয়া মুহু মুহু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “যখন বাহা দরকার এই ভাবেই হইয়া যাইতেছে।” তারপর আবার বলিলেন “দেখ বাহার ভিতর যে ভাবের সংস্কার থাকে সেইরূপই হইয়া যায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে রূপ ভাব থাকে সেইরূপই যোগাযোগ হইয়া যায়।”

তারপর আবার কথা উঠিল মা বলিতেছেন “দেখ ছোট বেলায় যখন বোঁ হইয়া আটপাড়া গ্রামে আশুর মার কাছে ছিলাম তখন যে প্রতিবেশী শূদ্র বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আমার সাহায্য করিয়া দিত তাহাও তোমাদের বলিয়াছি, এমন সুন্দর ভাব তাহাদের ছিল তাহারা ত তখন একটি বোঁয়ের একা এত কাজ করিতে কত কষ্ট হইতেছে ভাবিয়াই সাহায্য করিয়া দিত, এই গুণের জন্যই দেখ কত সময় তাহাদের কথা তোমাদের কাছে উঠিতেছে। কাল মুর্সোরী পাহাড়ে খেয়াল রূপে তাহারা আমার কাছে আসিয়াছিল তাই আজ আবার তোমার কাছে বলিতেছি। দেখ কি সুন্দর ভাব তাহাদের ছিল আমার কাজ করিতে কষ্ট হয় তাই কত সাহায্য করিত অথচ তাহা অতি গোপনে, যেন আশুর মা প্রভৃতি কেহ না জানে। বাসনগুলি মাজিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়া যাইত আমি ঘাটে গিয়া শুধু তুলিয়া লইয়া আসিতাম কেহ জানিত না যে তাহারা এইভাবে সাহায্য করিতেছে। গ্রাম দেশ কত কি কথা উঠিবে তাই গোপনে তাহারা এই শরীরটার জন্ত এত করিত। আবার কি করিত জান ?

মসলা বাটিয়া বেড়ার নীচ দিয়া রান্না ঘরে দিয়া বাইত কেহ জানিত না। আবার কত যত্ন করিয়া দুধ জাল দিয়া ভাল ভাল আম নানা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আনিয়া আমার জগ্ন রাখিয়া দিত এবং একটু সুযোগ পাইলেই সকলের অজ্ঞাতসারে আমাকে ধরিয়া নিয়া গিয়া সেই সব খাইতে বাধ্য করিত, অথচ আমি কিন্তু তাহাদের সঙ্গে কথাও বলিতাম না ঘোমটা দিয়া থাকিতাম। ভোলানাথদের ঘরের পাশেই ঐ স্ত্রীলোকদের ঘর ছিল। কত ভাবেই তাহারা এই শরীরটার যত্ন করিত। একজন ছিল রবীর মা একজন ছিল মাউজার মা, এই দুই জনই বেশী সাহায্য করিত। আমিও আমার ভাগে যাহা ভাল জিনিষ পড়িয়াছে, তাহাদের দিয়া দিতাম। হয়ত খাইতে বসিয়াছি কিছু খাইয়াই থালা তাহাদের দিয়া দিতাম। তাহারা বড় গরীব ছিল, কত আপত্তি করিত আমি ঘোমটা দিয়া থাকিলেও এমন ব্যবহার করিতাম যে তাহারা নিতে বাধ্য হইত।” আমি হাসিয়া বলিলাম “মা, দেখিতেছি প্রথম হইতেই পূজা পাইয়া আসিয়াছ। কেহ জানুক আর নাই জানুক যাহা দরকার তাহা হইয়াই গিয়াছে।” মাও হাসিতে লাগিলেন আমিও হাসিতে লাগিলাম।

বৈকালে মাকে নিয়া একটু সনাতন ধর্মশালায় (শিবালয়) গেলাম সেখানকার পূজারী প্রভৃতি প্রণাম করিয়া মাকে বলিতেছেন “মা, আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনি আমাদের ধর্মশালায় আসিয়াই ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।” মা বলিলেন

“কেন বাবা মেয়েটাকে এমন করিয়া বল। এক ভাব আন, সব স্থানই যে একজনের, বাবার বাড়ীতেই ত আছি।” এই সব কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া মা চলিয়া আসিলেন। যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি মার সন্ধানে পাঞ্জাব হইতে দেৱাতুন, সোলন আবার দেৱাতুন মার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন, মা দেৱাতুন হইতে আসিবার সময় তিনি খবর পান নাই আজ বাহির হওয়া মাত্রই দেখি তিনি মার জন্ম আবার দেৱাতুন ছাড়িয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই ভদ্রলোকটি শিখ সম্প্রদায়ের। মা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন “এই যে বাবা আসিয়া উপস্থিত, আমার খেয়াল হইতেছিল এখনই বাবা আসিবে।” সন্ধ্যায় এতদ্দেশীয় অনেকে মার কাছে কীর্তন করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ কীর্তন চলিল। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা শুইতে গেলেন। আমি, বেবীদিদি ও অভয় মার কাছে শুই, বিছানায় আসিয়া অভয় গান ধরিল মাও দুই একটি গান করিলেন নানা কথা বার্তা চলিল এই ভাবে রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শুইয়া পড়িলাম।

৩রা ভাদ্র, শনিবার :—

আজ সকালে মা উঠিলে মাকে একটু হাটিতে নিয়া যাওয়া হইল। পার্বত্য সহর বাহির হইলেই চড়াই উৎরাই করিতে হয় শরীর মার দুর্বল তাই বেশী দূর যাওয়া হইল না, ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখি অনেক লোক মার দর্শনে

আসিয়াছেন। বাঙ্গালীও কয়েকজন আছেন। বেলা প্রায় ১০টায় মার ভোগ দেওয়া হইল।

বৈকালে মা উঠিলেন কথায় কথায় মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন “কাল দেখিতেছিলাম কি জান? তিনটা লোক এই শরীরটাকে শেষ করিবার জন্য আসিয়াছে, ‘যাহা হইবার হইবে এই শরীরটাকে শেষ করিবই’ তাহাদের হাতে ছোট ছোট বন্দুক (পরে বলিলেন ভাবরূপী বন্দুক আর কি) এক জন নিকটে আসিয়া বন্দুক উঠাইয়াছে, এর মধ্যে এই শরীরটার একটা পরিবর্তন আসিল চক্ষু উজ্জ্বল ও বড় হইয়া উঠিল আর আমি তাহার নিকটে গিয়া হাত দিয়া তাহার ক্রমখ্য স্পর্শ করিলাম ও ক্রমধ্যে একটু আঁচড় কাটিয়া দিলাম। এইরূপ হইয়া যাওয়া মাত্রই লোকটা যেন অবশ হইয়া পড়িল। তাহাকে ঐভাবে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সর্দার দুইজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল ‘কি তুই এমন কাজ কেন করিতেছিলি তোকে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতেছি’ এই বলিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। কিন্তু আমি তাহাদের ভিতরের ভাব দেখিয়া হাসিতেছিলাম কারণ দেখিতেছিলাম বাহিরে যদিও তাহারা এ ভাবের কথা বলিল কিন্তু ভিতরের ভাবটা হইল উহাকে খোলা খোলা ভাবে একটু বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতেছে এখন অনেক আছে সকলে চলিয়া গেলে ঐ লোকটা এই শরীরটাকে শেষ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিবে। এই হইল ভাবটা।

বাহিরে ঐ ভাবটা দেখাইতেছে। সেই লোকটাকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে আমি সেই লোকটার (যাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে) কাছে কাছে ঘুরিতে লাগিলাম কারণ যতই তাহার এই শরীরটাকে শেব করিবার আগ্রহ হইতেছিল ততই এই শরীরটা তাহার নিকটে যাইতেছিল এই ভাবে খানিকক্ষণ চলিয়া গেলে তোমাদের দিদিমা আসিয়া আমাকে বলিল “খাইতে চল” আমি চলিয়া গেলাম। লোকটির তখন ঐ তীব্র ভাবটা কমিয়া আসিতেছে কারণ সে মনে করিল “শরীরটা যখন নিকট হইতে চলিয়া গেল এখন আর শেব করিবার জন্ত তীব্র ভাবটা জাগাইয়া রাখিয়া লাভ কি?” এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন “লোকটা বন্ধন দশায় রহিল এই শরীরটাকে শেব করিবার জন্য।” আমি ও অভয় বসিয়া বসিয়া এই সব কথা শুনিতে ছিলাম। অভয় ও আমি ধরিলাম তারপর কি বল? লোকটা ভিতরে রহিয়া গেল তোমাকে শেব করিবার জন্য এ ত ভাল কথা নয়। মা আর কোন জবাব দিলেন না।

৪ঠা ভাদ্র রবিবার :—

আজ মাকে নিয়া বৈকালে অনেকদূর বেড়াইতে যাওয়া হইল। আর কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা নাই। মন্থ দাদা মার আদেশে আজ এখানে আসিয়াছেন।

৫ই ভাদ্র সোমবার :—

আজ মা সকালে উঠিয়া বসিয়াছেন পরই কয়েকজন

দর্শনার্থী আসিয়াছেন। মা সকলের সহিত মাঝখানের একটা হলে বসিয়া কথা বার্তা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ১০।টায় মায়ের ভোগ হইল, আজ দুপুরে শুইবার ভাব নাই, অভয় কি কথা বলিবে সকলকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কাল রাত্রিতেও মার শুইবার ভাবই ছিল না, বেশী সময়ই বসিয়া ছিলেন। বৈকালে আমরা উত্তর কাশীর রাস্তায় অনেকদূর মার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

কিছু দিন যাবতই মায়ের ভাবটা কেমন যেন ভিতর হইতে চূপ চাপ দেখা যাইতেছে। বাহিরে কথাবার্তা যে বলেন যেন জোর করিয়া। তবে কোন রকমে চালাইয়া বাইতেছেন। আজ সকাল হইতেই সেই নিস্তব্ধ ভাবটা যেন বাড়িয়া উঠিয়াছে। ৯।টায় একটু খাওয়াইয়া দেওয়া মাত্রই শুইয়া পড়িলেন চোখ যেন টানিয়া খুলিতে পারেন না শরীর যেন অবশ।

বৈকালে উঠিয়া বসিয়াছেন। একটু কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া আমি কয়েক খানা চিঠি শুনাইবার জগ্গ একান্তে নিয়া গেলাম কিন্তু একটু পরেই দেখি মার ভাবের পরিবর্তন চোখ বুজিয়া আসিতেছে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিও তাহার ছেলে (দুই জনেই মাফটারী করেন) আসিয়া বলিয়া আছেন। প্রত্যহই দুই বেলা ইহার আসিয়া মার নিকট বসিয়া থাকেন আজও মা মাঝখানের হলের ভিতর গিয়া একটু বসিলেন তারপর উঠিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার সময়

আবার একটু উঠিয়া বসিয়াছেন কিন্তু গা ছাড়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন। ধরে স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। মাকে ডাকিলে মা যেন চমক ভাঙ্গার মত চোখ খুলিয়া জবাব দিলেন “কেন ?” কথারও জড়তা হইয়াছে। রাত্রিও প্রায় এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার :—

আজ ভোরে মার ভাব অনেকটা স্বাভাবিক। অভয় ও আমি প্রতিদিনের মত নাম করিলাম। পরে অভয় দুই একটি গান ধরিল। কিছু পরে মাও শুইয়া শুইয়া দুই একটি গান করিলেন। আমি, বেবীদিদি ও অভয় বসিয়া আছি নানা কথা হইতে হইতে ছোট বেলার কথা উঠিল। মা বলিতেছেন “খেওড়াতে, আমি তখন খুব ছোট ন্যাংটা, বাবার ও অগ্ণান্য সকলের গান শুনিতাম তারপর যখন একা একা গ্রামের পথ ধরিয়া চলিয়াছি তখন গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া গান ধরিতাম, কত কৃষ্ণের গান, মায়ের গান, আর দেখ গিয়া চোখ দিয়া বর বর করিয়া জল পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া ও আমার গানের আওয়াজ শুনিয়া সকলে আদর করিয়া কোলে করিয়া নিয়া গান করিতে কত বলিত তখন কিন্তু আর করিতাম না। আমি গান করিতে করিতে একা একা কাঁদিতাম দেখিয়া এই শরীরের বাবার এক মামা নিজের চোখে জল দিয়া আমাকে ক্ষেপাইত।”

আবার আমাকে বলিতেছেন (কয়েক দিন যাবত মা

আমাকে “তুই” বলিয়া বলিতেছেন) “তোরাও ত দেখিয়াছিস এই শরীরটা যখন খেঁওড়া কি বিছাকুট গিয়াছিল তখন গ্রামের সকলে এমন কি মুসলমানেরাও দলে দলে আসিয়া কত ভালবাসা জানাইয়া গেল। ভগার ইচ্ছায় এই শরীরটাকে সকলেই ভালবাসিত। এমন কি যাঁহাদের নিজেদের মেয়ে শিশুর বাড়ী যাওয়ার সময় কখন কেহ একটু দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখে নাই, এই শরীরটা যখন আসিত তখন তাহারাও বলিত কি জানি কেন ওর জন্ম মনটা কেমন কেমন করিতেছে’। আর এই শরীরটারও রকম ছিল যখন কাঁদা তখন শিশুর মত প্রাণ খুলিয়া কাঁদা কোন রকম লজ্জা সঙ্কোচ ছিল না।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম “তাই ত মা, সকলকে না কাঁদাইয়া তুমি আসিবে কেন? প্রাণ খুলিয়া নিজে কাঁদিয়া যাঁহারা কখনও কাঁদে না তাহাদেরও কাঁদাইয়া তবে মেরোট শিশুর বাড়ী আসিতেন।” এই কথায় সকলেই হাসিতে লাগিলেন মাও হাসিতে লাগিলেন। ভোর বেলা কীৰ্ত্তনান্তে বিছানা ছাড়িবার পূর্বেই এইসব আনন্দ চলিতেছে। বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। বেলা প্রায় ৯টার মার মুখ ধোয়াইয়া দিলাম এবং শিখদের গুরুদোয়ারাতে মাঝে নিয়া চলিলাম। সেখানে এই সময়তে ভজন পাঠ ইত্যাদি হয় শুনিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম ভজন শেষ হইয়া গিয়াছে, বক্তৃতা হইতেছে। মা ও আমরা একটু বসিয়া চলিয়া আসিলাম।

কয়েকটি ভদ্র মহিলা আসিয়াছেন, কথাবার্তা, গান সবই হইল তার পর মার ভোগ দেওয়া হইল এবং খানিক পরেই মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মার শুইবার ভাবই নাই। এক একবার আমাদের কথায় চোখ বুজিতেছেন আবার চোখ কখনও একটু টিপি টিপি করিয়া খুলিয়া কখনও বুজিয়াই ছেলে মানুষের মত দুই একটি কথা বলিয়া বলিয়া হাসিতেছেন হাসাইতেছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

বৈকালে মা উঠিয়াছেন। মাঝের হলে গিয়া বসিয়াছেন। অনেকে আসিয়াছেন, কথাবার্তা হইতেছে। কথা হইল এখানকার সর্বোচ্চ স্থান 'ডিকোতে' যাওয়া হইবে। দুইটা রিক্সা কর' হইল। আমি, মা, বেবীদিদি ও অভয় চলিলাম এবং পাঞ্জাবী ভদ্র লোকেরাও বাপ বেটার চলিল। তাহারা হাটিয়াই চলিয়াছে মার সঙ্গে থাকাই তাহাদের উদ্দেশ্য। রাস্তা মধ্যে মধ্যে কুরাসায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে খুব আনন্দ করিতে করিতে যাওয়া হইল। গির্জার সামনে গিয়া শুনিলাম এর উপর আর রিক্সা চলিবে না। ডাঙি করিতে হইল। আমি ও অভয় হাঁটিয়া চলিলাম। ডাঙিতে কখনও মা কখনও বেবীদিদি উঠিতেছেন। ডিকোতে গিয়া দেখি চারিদিক কুরাসায় ঢাকা কিছু দেখা যায় না; কিন্তু শুনিলাম এখান হইতে বদ্রিনারায়ণও দেখা যায়। আমরা খানিক সময় এখার ওখার হাটাহাটি করিয়া নীচে নামিলাম। গির্জার

ধারে আসিয়া সকলে বসিয়াছি। ডাণ্ডি ওয়ালাদের মধ্যে একজন মাকে বলিতেছে “দেখ মাতাজী (ইহারা মাকে জানে না সব স্ত্রীলোকদেরই এই পাহাড়িরা মাতাজী বলিয়াই সম্বোধন করে) এই হইল গির্জা, এখানে সাহেবরা ভগবানকে ডাকে। আমরা যে ঈশ্বরকে ডাকি ওরা খোদাকে ডাকে।” অমনি আর একটি ডাণ্ডিওয়ালা অগ্রসর হইয়া বলিতেছে “মাতাজী, সবই ত এক, যেমন এক মায়ের চার ছেলে, সব ছেলের মাই ত একজন।” আবার পূর্বোক্ত কুলিটি অগ্রসর হইয়া আবার কিছু তত্ত্ব কথা শুনাইল। সকলেই মাকে শাস্ত্রোপদেশ দিতে ব্যস্ত। মাও ছোট মেয়ের মত যেন মহা আগ্রহে শুনিতেন কতকটা এই ভাব। মা ত কাহারও ভাব নষ্ট করেন না। উহারা মায়ের এই ভাব দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পরমাত্মার তত্ত্ব বলিয়া যাইতে লাগিল। আবার জগতে সবই মায়া, নন্দর এই সব ছাড়া উচিত কিন্তু পারা যায় না এ সব কথাও বলিতেছে। মা বলিলেন “সত্যি কি পিতাজী, এই সবই কি মায়া? এ সব ভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাকি?” তাহারা বলিল “নিশ্চয়ই”। রহস্যময়ী মা অমনি মুহু মুহু হাসিয়া ডাণ্ডি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন “পিতাজী, তোমাদের নিকট হইতে এই সব উপদেশ পাইয়া আমি ভোগ ত্যাগ করিতেছি এই ডাণ্ডি ছাড়িয়া হাটিয়া যাইতেছি।” এই বলিয়াই একেবারে হাটিয়া রওনা দিলেন, ‘আমরাও পিছনে পিছনে চলিয়াছি। তখন ডাণ্ডিওয়ালাদের

ভয় হইল। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া মাকে বলিতেছে “না, মা, তুমি এই ডাঙিতে উঠিয়া বস,” মা বলিলেন “না, গুরুজি, তোমাদের কথায় আমার জ্ঞান হইয়াছে আমি কিছু সময়ের জন্য ডাঙিতে যাইবনা হাটিয়াই যাইব” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। কুলিদের কুগুরুজি, গুরুজি বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন হাত ষোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন। তাহারাও তখন মাকে হাত ষোড় ও প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল “মাতাজী, আমাদের মড কুলিদের কথায় তোমার এইরূপ জ্ঞান হইল তুমি ধন্য, আর মাতাজী ! আমাদের কথায় তোমার জ্ঞান হইল এজন্য আমরাও ধন্য।” এই ভাবে নানা লীলা করিতে করিতে মা চলিলেন, গুরুজিরাও নানা উপদেশ শুনাইতে শুনাইতে চলিল। সৎ সঙ্গের মাহাত্ম্য চলিতে লাগিল। খানিকটা নীচে আসিয়া আমরা রিক্সায় উঠিবার সময় মা যেই ডাকিলেন “গুরুজী” অমনি পূর্বোক্ত দুই ডাঙিওয়ালা মার কাছে আসিয়া জবাব দিল। তার পর মাকে কি পড়িয়া শুনাইল, মা রওনা হইবার পূর্বে বলিলেন “গুরুজী এই মেয়েটার কথা খেয়াল রাখিও, না হইলে আমি বাঁচিব কি করিয়া ? আর গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াই এই কথা বাহির হইতেছে যে “তোমরা একটু ভগবানকে ডাকিও” এই বলিয়া শিষ্য দুই এক কথা উপদেশচ্ছলে বলিতে লাগিলেন তাহারাও অবনত মস্তকে মার কথা রাখিবে বলিয়া স্বীকার করিল। তার পর মা বলিলেন “খুকুনি, গুরুজিদের প্রসাদ ত পাইলাম না।” আমি

চাহিয়া দেখি নিকটেই দুইটা কল ও মিষ্টির দোকান। মার
 কথায় মার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমি তখনই নামিয়া গিয়া কিছু
 মিষ্ট আনিয়া উপস্থিত সকলকে বিলাইয়া দিতে লাগিলাম।
 মা বলিলেন “সর্ব্ব শেষ আমি নিব।” তাই হইল প্রায়
 ১৭।১৮ জন কুলিয়া এবং উপস্থিত আরও ৮।১০ জনকে মিষ্ট
 বিলাইয়া দেওয়ার পর মা একটু গ্রহণ করিলেন। আবার
 মা হাতযোড় করিয়া বলিতেছেন “এই মেয়েটাকে মনে
 করিও।” তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিল “আমরা
 তোমাকে ভুলিতে পারিব না। আগামী বৎসর হয়ত এই
 সময় তোমার কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িবে। এইরূপ
 সংযোগ ত সব সময় হয় না।” তারপর তাহারা বলিল,
 “মাতাজী, এখন তবে আমরা বিদায় হই।” মা অমনি
 বলিলেন “তোমরা গুরুজি আমি কি করিয়া বলিব?” তখন
 বেশ গুরু ভাবে একজন বলিল “আচ্ছা আচ্ছা আমরা
 বলিতেছি তুমি এখন যাইতে পার।” মা হাসিয়া বলিলেন
 “আচ্ছা তবে আসি।” আমাদের রিক্সা ছাড়িয়া দিল।
 তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কুয়াসায়
 অন্ধকার করিয়া আসিতেছে একান্ত স্থান তার মধ্যে মার
 এই অপরূপ লীলা ও সং চর্চায় রাস্তা কাটান বেশ
 লাগিতেছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা বাসায় ফিরিলাম।
 এই ভাদ্র বুধবার :—

আজ সকালে বিছানায় বসিয়াই মা, হরিবোল, হরিবোল

বলিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে চেহারার পরিবর্তন হইল।
আজ আর উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা নাই।

৮ই তাদ্র বৃহস্পতিবার :—

আজও উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই। বেবী
দিদি স্বামীর বাৎসরিক তিথিতে আগামী কল্যা এখানে
উদয়াস্ত কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।
সেই উপলক্ষে দেৱাচন হইতে আজ যোগেশ দাদা, সাধন,
শশাঙ্ক, শচী, কমলাকান্ত সব ব্রহ্মচারীরা আসিয়াছেন।
কীর্তনের আরোজন হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় অভয়
গান ধরিল—

গাহরে, গাহরে, সবে গুরু ব্রহ্ম নাম হে,
ঐ নামে লভিরে ভাই, চিদানন্দ ধাম হে।

(গাহরে গাহরে)

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু অপার প্রেম সিদ্ধু
গুরু নারায়ণ শঙ্কু, গুরু মাতা পিতা হে

(গাহরে গাহরে)

এস প্রভু পরাংপর, ডাকে তোমায় চরাচর
হৃদয় কমলে বস, এস প্রভু এস'হে

(গাহরে গাহরে)

সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ধরিল। চমৎকার হইল। রাত্রিতে
হলটা সাজাইয়া কীর্তনের অধিবাস করিয়া কীর্তন আরম্ভ করা
হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা শুইলাম। মাও শুইলেন।

৯ই ভাদ্র শুক্রবার :—

আজ ভোর বেলা হইতেই কীর্তন আরম্ভ হইল। প্রথমে মা, মা নাম করা হইল, পরে আরম্ভ হইল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

উদয়াস্ত নাম চলিল। কীর্তনান্তে সন্ধ্যার সময় সকলের খাওয়া দাওয়া হইল। কথা হইয়াছে আগামী কল্য অভয় ও যোগেশদাদা উত্তর কাশী যাইবেন। উত্তর কাশী হইতে মাকে দর্শনের জন্ত একটি সাধু এবং সেই সঙ্গে সদানন্দ মার আদেশ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

১০ই ভাদ্র শনিবার :—

আজ খাওয়া দাওয়ার পর বেলা প্রায় ১টায় যোগেশদাদা ও অভয় উত্তর কাশী রওনা হইয়া গেল। অভয়ের বয়স ১৭-১৮ বৎসর হইবে, কিন্তু ভিতরে বেশ একটা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব আছে, তাহার ইচ্ছা একান্তে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে তাই মার আদেশ নিয়া রওনা হইল। আমাদের সঙ্গে একটা ছোকরা (তাহার বয়স ১৭-১৮ বৎসর হইবে) কলিকাতা হইতে কাজ কর্ত্ত করিবার জন্ত আসিয়াছিল এখানে আসিয়া সেও সকলের কাছে বলিতেছিল “আমারও আর দেশে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা নাই।” ছেলোটর নাম অনুকূল। ইহাদের উত্তর কাশী যাইতে দেখিয়া তাহারও উত্তর কাশী যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু

সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “তুই ঘাবি।” সে খুব আনন্দের সহিত বলিল “বাইতে দিলে বাইব।” আমি তাড়াতাড়িতে একথা আর মাকে বলিতে পারি নাই। অভয়রা রওনা হইয়া গেলে আমি মাকে একথা বলা মাত্রই মা বলিলেন “তাই নাকি? ডাক শিগগির অনুকূলকে।” সে জল আনিতে গিয়াছিল মার আর তখন দেৱী সহ্য হয় না। অনুকূল আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে সানন্দে বাইতে রাজি হইল। মা তখনই নিজের গায়ের গরম জামা কম্বল ইত্যাদি দিয়া এবং আরও ঘাহা ঘাহা আবশ্যক সব এর ওর নিকট হইতে দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে রওনা করিয়া দিলেন। একটা কুলি সঙ্গে দিয়া দিতে বলিলেন সে ইহাকে যোগেশ দাদাদের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া আসিবে। এই সব ব্যবস্থা করিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। সকলে অবাক। কোথায় চাকুরী করিতে আসিয়াছিল একেবারে সাধনার জন্ত উত্তর কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আর সে বিষয় কোন বিচার বিবেচনা নাই। উপস্থিত মত তখনই ব্যবস্থা। আমি মাকে বলিলাম “মা যে কয়জনকে পাঠাইবার সে কাজও শেষ করিলে, এখন একটু বিশ্রাম করত?” মা হাসিতে হাসিতে শুইয়া পড়িলেন।

আগামী কল্য কয়েক ঘণ্টার জন্ত এলাহাবাদ হইতে বাবু শিবপ্রসাদ সিংহ দেৱাছন মার দর্শনের জন্ত আসিতেছেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন মা যদি দেৱাৱহন আশ্রমে সেই সময় আসেন তবে মার নিকট আমি দুই ঘণ্টা বেশী থাকিতে পারি। আমরা মাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করায় মা বলিতেছেন “দেখা যাক উপস্থিত মত কি হয়।” এই শিবপ্রসাদ সিংহের মার দর্শনের পর অদ্ভুত পরিবর্তন। এলাহাবাদ হইতে এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিবপ্রসাদ সিংহের কথা লিখিতেছেন “শিবপ্রসাদের অদ্ভুত পরিবর্তনে এখানকার বড় বড় লোক সব অবাক হইয়া গিয়াছেন। শিবপ্রসাদ বাবু হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। মাকে মাত্র দুই তিন দিন দেখিয়াছেন, দেখা মাত্রই এর পরিবর্তন অদ্ভুত রকমের। যাহার মদ, মাংস না হইলে চলিত না সে এখন পেঁয়াজ রসুন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে। সাধু দেখিলেই সে পরিহাস করিত আজ মার নামে সে সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। দেখা মাত্রই এমন পরিবর্তন নাটক নভেলে পড়া যায় সত্য কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় না মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ধীরে ধীরে জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে এ অনেক দেখা যায় কিন্তু এষে দেখা মাত্রই এই পরিবর্তন।” আরও লিখিয়াছেন “শিবপ্রসাদ বাবু যেখানে সেখানে মার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বেড়ান। ছেলে মানুষের মত নিজেকে মার ছেলে ভাবিতে তার বুক গর্বে ভরিয়া উঠে কেহ ঠাট্টাচ্লে একটু কিছু বলিলে তিনি তথা হইতে উঠিয়া যান অথবা তাহাকে চুপ করাইয়া দেন” ইত্যাদি ইত্যাদি।

দর্শন মাত্রই যে কি আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে মা বোধ হয় তাহাই দেখিবার একটু সুযোগ আমাদের দিলেন।

বৈকাল ৪টায় মা উঠিয়া বলিতেছেন “চল দেরাডুন যাই” তখনই বন্দোবস্ত করিয়া নেওয়া হইল। আমি, কমলাকান্ত ও শ্রীযুক্ত মন্থদাদা মার সঙ্গে চলিলাম। আর সকলেই মুসৌরী রহিলেন। দেরাডুন হইতে শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী নামে একটা ছেলেও কীর্তনে মুসৌরী গিয়াছিল সেও আমাদের সঙ্গে ফিরিয়া চলিল, দেরাডুন আশ্রমের নিকটই ইহাদের বাড়ী। দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দেরাডুন পৌছিলাম। মার শরীর দুই তিন দিন যাবত আবার খারাপ চলিতেছে। ১১ই ভাদ্র রবিবার :—

আজ সকালেই শিবপ্রসাদ বাবু আসিয়া পৌছিলােন। মা শুইয়া ছিলেন তিনি গিয়া মার চরণে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। প্রাণ যেন তাঁহার এই জন্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। শিবপ্রসাদ বাবু যখনই এখানে আসেন মাকে নিয়া বেড়াইবার জন্ত একটা মোটর ভাড়া করিয়া রাখিয়া দেন। কোনও কার্য বশতঃ সেই মোটর বেলা ১১টায় দরজায় মুসৌরী যাইবে, একথা শুনিয়াই মা বলিলেন “খুকুনি মুসৌরী বেড়াইতে যাইবে?” আমি বলিলাম “চল” বেলা ১০টায় এসব কথা বার্তা হইল, একটু জল খাইয়া আমরা মুসৌরী চলিলাম। সঙ্গে বাবু শিবপ্রসাদও চলিলেন। কখনও

কখনও দেখি ছেলে মানুষের মত মোটর দেখিলেই মা বাহির হইয়া পড়েন। আবার কখনও কখনও হয়ত কত মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে একবার মাকে একটু বেড়াইতে যাওয়ার জন্য কত অনুরোধ করিতেছে কিন্তু মা যাইতেছেন না। আজও রাস্তায় হাসিতে হাসিতে সেই কথাই হইল। আশ্চর্যের বিষয় মুসোরী থাকিতেই আজ দুই তিন দিন যাবত বলিতে গেলে মার খাওয়া দাওয়া নাই শরীর বেশ অসুস্থ। মাকে দেয়াতুন আসিতে দেওয়াই স্বামিজী ও মন্থদাদার মত ছিল না কিন্তু মায়ের খেয়াল কিছু বলিতেও পারেন না। আবার ওটায় দরজা খুলিলেই ফিরিয়া আসিবার কথা। মুসোরী গিয়া মাত্র ১৮ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইতে হইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী মার কাছ ছাড়া হইলেই বড়ই প্রাণে আঘাত পান। আর কিছুতেই তাঁকে এই রকম আঘাতদিতে পারে না। মার নিকট থাকিলেও মার কাছে সর্বদা বসিয়া থাকা বা কথা বলা কিছুই তাঁহার নাই। নীরবে যতটুকু সাধ্য মার সেবা করিয়া যাইতেছেন। মা কাছেই আছেন এই তাঁহার আনন্দ। তিনি প্রায় সময়ই নিজের এক ঘরে হয়ত বসিয়া আছেন। কালও আসিবার সময় তিনি কোন প্রকার বাধা বা নিজে সঙ্গে আসিবার আবেদন করেন নাই কিন্তু প্রাণের ব্যথা মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ যাইবার সময় বলিতেছেন “বাবাকে

দেখিয়া আসিব”। জানিনা স্বামিজীর প্রাণের ব্যথাই মার মুসৌরী এই অল্প সময়ের জন্য বাইবার কারণ কিনা।

মুসৌরী যাইতেই সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ঘণ্টা খানেক তথায় থাকিয়াই মা আবার দেৱাদুর্ন অভিযুখে রঙনা হইলেন। একবার কথা হইয়াছিল একটু বেশী সময় মুসৌরী বিশ্রাম করিয়া ৬টায় দরজা খুলিলেই ফিরিয়া আসা যাইবে। মা বলিলেন “তিন টায়ই চল”। তিনটায় আসিয়া দেখি অনেকে আসিয়া মার দর্শনের জন্য বসিয়া আছেন। সাহারাণ পুর হইতে দুইটি ভদ্র মহিলা মার জন্য নানা প্রকার খাবার নিয়া উপবাস করিয়া আসিয়া বসিয়া আছেন। মা আসিতেই ধীরে ধীরে সারদা, লছমীরানী, হরিরাম ঘোষী সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বুঝিলাম মা কেন ৩টায় ফিরিবেন বলিয়া ছিলেন। সব সময়ই যে ইহা করিতেন তাহা নয় তবে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিতেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ বাবু আজ রহিয়া গেলেন আগামী কল্য যাইবেন।

১২ই ভাদ্র, সোমবার :—

আজ শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভাই মাকে নিয়া রায়পুর যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। বেলা প্রায় ৯টায় আমি, শ্রীযুক্ত মনমথ দাদা ও শিবপ্রসাদ ভাই মার সঙ্গে রায়পুর চলিলাম। বিশু ব্রহ্মচারী তথায় আছেন। মা পৌঁছিতেই বিশু সব বন্দোবস্ত করিয়া দিল। আমরা তথায় রান্না করিয়া খাওয়া দাওয়া

করিয়া আবার বেণী ওঠায় কিষণপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। দুই একটি লোক মাতৃ দর্শনে আসিলেন। নানা কথাবার্ত্তায় দিন কাটিয়া গেল।

একটি মহিলা আশ্রম করিবার কথা হইতেছে। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহ আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

১৩ই ভাদ্র, মঙ্গলবার :—

আজও উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই। মার শরীর খারাপ হইয়াছে কিন্তু বিশ্রাম নাই, একজনের পর একজন আসিতেছে যাইতেছে।

আজ দুপুরে মা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন এবং আমি কাছে বসিয়া আছি। হঠাৎ মা একটু মুহূ হাসিয়া বলিতেছেন “কি চমৎকার দেখ, এই যে স্থূল শরীর দেখিতেছ (নিজের শরীর, দেখাইয়া) যত কিছু স্থূল বস্তু আছে সব নিয়া এক শরীর সেটা কি রকম হয় জান? বাহা স্থূলে প্রকাশ নাই তাহা নিয়া সেই সূক্ষ্ম এক শরীর, আবার কারণ শরীর, সন্ধ্যায় অবস্থিত। ইহা যে ভিন্ন ভিন্ন দেখা হয় তা কিন্তু নয়। যেন একের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে সব আছে। আবার সেই কারণের কারণ মহাকারণ যা তাই। যেমন তেমনই আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বলিয়াও কোন কথা নাই। কি আছে কি নাই বলা যায় না বাস।” এই বলিয়া ছেলে মানুষের মত মহানন্দে হাসিতে হাসিতে ছোট্ট একটি

হাততালি দিয়া যেন সব উড়াইয়া দিলেন। আবার বলিতেছেন “এই ভাব নূতন নয়, এই রকম বরাবরই ছিল, একই ভাব, তবে এখন প্রকাশ করিয়া বলা হইল এই মাত্র।” এই বলিয়া চুপ করিলেন।

বৈকালে মা উঠিয়াছেন। আমি ও মা ঘরে বসিয়া আছি। নানা কথা হইতেছে। কৃপা ও কৰ্ম্মের কথা উঠিল। মা বলিতেছেন “কৃ—পা কিনা? কৃ মানে কৃত, অর্থাৎ যাহা করিয়াছে, পা—মানে তাহা পাইতেছ। অর্থাৎ কিনা যেমন কৰ্ম্ম তেমন ফল। তাহাও কিরূপে প্রকাশ? না তুমি এখন এমন কোন কৰ্ম্ম কর নাই যাহাতে এই ফল পাইতে পার কিন্তু তোমার এমন কোন কৰ্ম্ম ছিল যাহাতে এখন কৰ্ম্মরূপে প্রকাশ না পাইলেও পূর্বে তোমার যাহা করা ছিল তাহা ফলস্বরূপ পাইলে। আর এক দিক দিয়া দেখ, কৃ—পা যিনি করিতেছেন কৃ—পার, অর্থাৎ সেখানে এই করিতে পার আমার ত আবোল তাবোল কথা ধর না এই করিতে পার যিনি কৃ—পা করিতেছেন অর্থাৎ তিনি নিজে করিয়া তোমাকে পাওয়াইয়া দিলেন। সবটা তোমার কৰ্ম্মের ফল নয়। যেমন একজন মজুর তোমার বাড়ীতে কাজ করিতে গেল, দুর্বল শরীর বেশী কাজ করিতে পারিল না কিন্তু অভাব তাহার যথেষ্ট আছে, তুমি কৃপা করিয়া তাহাকে তাহার কৰ্ম্মের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়া দিলে, এই হইল কৃপা। আরও দেখ মোটরে চলিয়াছ, মোটর একটু খারাপ হইয়াছে, ড্রাইভার

ঠেলিয়া নিয়া যাইতেছে সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ঠেলিতেছ এইভাবে সাহায্য করিয়া যথাস্থানে মোটর নিয়া গেলে, আবার ভাড়াও দিয়া দিলে।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার বলিতেছেন “যখন কৃপাটা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিবার কৃপাটা সে পায়, তখন সে দেখে যেমন একটু স্ফুলিঙ্গ আগুনে যত জিনিষ জ্বালাইতে পারে তত জিনিষ কেহ একত্র করিতে পারে না, সেই রকম কৃপাটাও তাহার নিকট অনন্ত অখণ্ডভাবে বর্ষিতরূপে প্রকাশিত হয়। তখন সে দেখে “আমি যতই জাগতিক সাধন ভজন করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা এত পাওয়ার মত কিছুই করিবার আমার শক্তি নাই। একমাত্র তাঁরই দয়া ও কৃপা, তখন সে দয়া ও কৃপার সাগরে ভাসিতে থাকে। এইরূপ দয়া ও কৃপা পাওয়ার অনুভবটা বোঝাত কতটা গেলে এবং কি জাতীয় কর্মের ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে।” এই বলিয়া গভীরভাবে বলিতেছেন “যেখানে পাওয়া, দেওয়া কার্য্য কারণের ভাবের কথা থাকবে সেখানেই এই জাতীয় সব কথা আসে। আবার বাস্তবিক কথা শোন, একমাত্র ভগবানের যত্নই যখন, তখন কর্ম্ম হইলেই কৃপা আসে, তা আবার কি? একমাত্র কৃপাই সব।” সেখানে কোন হেতু নাই।

সেবা (সারদা), লছমী, কৌশল্যা মা, হরিরাম প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন। সেবা আসিয়াই চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে সহজে চোখ খুলিতে পারে না, কেমন একটা অবস্থা

হইয়া যায়। মা অন্যান্য সকলের সঙ্গে নানা কথা বলিতেছেন সেবাও চোখ খুলিয়াছে, মা বলিতেছেন “গুপ্ত কাজও কিছু করিও না গুপ্ত কথাও তাহা হইলে থাকিবে না।” আমি বলিলাম “ইন্ট মস্ত্র”। মা বলিলেন “ঐ একটা জিনিষ অতি গুপ্ত ভাবে রাখিতে হয়। এদিক ওদিক যাহাতে না হয় মাটিতে বীজটি পুতিয়া যদি ঢাকিয়া না রাখা যায় তবে গাছ হয় না প্রত্যেক দিন উঠাইয়া উঠাইয়া যদি দেখে তবে গাছ হইবার আশা নাই। তাই অতি যত্নে বীজটি মাটিতে পুতিয়া জল ইত্যাদি দিয়া যত্ন কর দেখিবে যথা সময়ে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে ধীরে ধীরে বড় হইতেছে।” সেবা বলিল “মা যদি জোর বাতাস ছাড়ে তবে ত’ গাছটি নষ্ট হইয়া যাইবেই; তখন গাছটি রক্ষা করিবার উপায় কি?” মা বলিলেন “তখন ছোট চারাটি ঢাকিয়া রাখিতে হয়, দেখনা শিলারূপি হইতে চারা গাছ বাঁচাইবার জন্য কত যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তারপর চারিদিকে বেড়া দিয়া গরু, ছাগল, ইত্যাদির ভয় হইতে গাছটিকে রক্ষা করিতে হয়। এই ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে আবার সেই গাছই আবার কত জনের রক্ষক হইয়া দাঁড়ায়।”

আজ এক সময়েতে আমি ও মা ঘরে বসিয়া আছি কথায় কথায় আউটসাহীতে যে মার ভাবাবস্থা হইয়াছিল সে কথা উঠিল পূর্বেই সে কথা কিছু কিছু হয়ত উল্লেখ করা হইয়াছে। সে দিনের অবস্থা অতি অদ্ভুত অবস্থা হইয়াছিল। প্রতি রোম-

কুপ এমন কি মাথার চুল পর্য্যন্ত এমন ভাবে খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল যে রোমের গোড়াগুলি বড় বড় গোটার মত দেখা যাইতেছিল এবং প্রতি রোমকুপ দিয়া যেন রক্ত বাহির হইয়া পড়িতেছিল, শরীর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভাব অবস্থায় বেশ উচু বারান্দায় গড়াইয়া পড়িলেন সেই অবস্থায় সর্প গতিতে গড়াইতে গড়াইতে শরীর বারান্দায়ই রহিল মাথা গিয়া উঠানে গড়াইয়া পড়িল। ইহাতেই অনুমান করিতে পারা যাইবে শরীর কতটা লম্বা হইয়াছিল। সে এক অতি অদ্ভুত অবস্থা।

তারপর কথা উঠিল ঢাকার খান কোড়ার বাড়িতে মার কথায় কীর্তন আরম্ভের কথা। একবার খান কোড়ার ৩দীনেশ বাবুর বাড়ীতে কীর্তনে মার খুব ভাবাবস্থা প্রকাশ পায় সেই অবস্থায়ই মা বলিয়াছিলেন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তোমারা এবাড়ীতে কীর্তন করিও। যেদিন মার এরূপ ভাব হইল সেই বারেই তাহারা প্রতি সপ্তাহে কীর্তনের ব্যবস্থা করিল, ইহা আজ প্রায় ১০-১২ বৎসরের কথা এখনও তাঁহারা কীর্তন রক্ষা করিতেছেন।

তারপর কথা উঠিল মার শাহবাগ থাকা কালীন একদিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী গিয়াছেন একটি লোক মাকে পরীক্ষা করিবার মানসেই হউক বা যে ভাবেই হউক মাকে গিয়া বলিয়াছিল “আমি কিসের জন্ম আসিয়াছি বলুন ত’ দেখি ? আমি মুখে বলিবনা আপনি ত’ অন্তরের কথা জানেন বলুন ত’ ?” মা হাসিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন “আমি মুখে উত্তর দিলামনা তুমি

বুঝিয়া নেস্ত।” সেই লোকটি বাড়ী গিয়া দেখিয়াছিল সে যে প্রার্থনা নিয়া মার কাছে গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে তাই পরদিন মার কাছে কত কাঁদাকাটি করিয়া প্রণাম করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল।

নানা কথাবার্তায় রাত্রি হইল। মার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে। সর্দি, কাশি পেট বেদনা আছে কিন্তু সব সময় এ সকল বিষয় খেয়ালই নাই। বলেন “গোলমাল কি জান তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ বলি এই এই হইয়াছে সব সময় তাও বলিতে পারি না কিন্তু এই যে সব অসুখ হইয়াছে তোমরা বল, আমার কিন্তু কোন অসুবিধাই হয় না যেমন আছি তেমনই।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম “এই জন্মই ত’ অসুখও সারে না।”

১৪ই ভাদ্র, বুধবার :—

আজ বেলা ৯টায় মা বলিতেছেন “খুকুনি ! ১১টায় গেট খুলিলেই চল আজ মুর্সোরী রওনা হওয়া যাক।” তাই হইল তাড়াতাড়ী কিছু খাওয়া দাওয়া করিয়া মুর্সোরী রওনা হইয়া আসা হইল। মন্থ দাদাকে এবার কিম্বদন্তি আশ্রমেই রাখিয়া যাওয়া হইল। মা, আমি, কমলাকান্ত ও শৈলেন রওনা হইয়া আসিলাম। ষণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা মুর্সোরী পৌঁছিলাম।

১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার :—

আজ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই। মার শরীর খুব

থারাপ। সর্দি, কাশি, হজমের জন্ম পেটে বেদনা। কিছুই প্রায় খাওয়া হয় না।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার :—

অভয় এখানেই থাকিতে মা বলিতেছিলেন “একজনে একটা আছাড় খাইবে দেখিতেছি।” অভয় আমাকে আসিয়া বলিল “দিদি, মা বলিতেছেন একজনে আছাড় খাইবে।” করেকদিন চলিয়া গিয়াছে আর কাহারও সে কথা মনে নাই। কাল আমি সেই আছাড় খাইলাম। পড়িয়া গিয়া শরীরের স্থানে স্থানে কাটিয়া গেল। মাকে আসিয়া বলিলাম, মা হাসিয়া বলিলেন “এতদিনে সেই আছাড় খাওয়া হইল।” তখন আমার মনে পড়িল মা ত’ কয়দিন পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছিলেন।

কথায় কথায় বলিতেছেন “দেখ, একটি ছোট্ট বীজ বুনিলে, যত্ন করিতে করিতে কি হইল? না, তাহার ভিতর হইতে খাড়া ভাবে গাছ বাহির হইল যেন যোগী টান হইয়া বসিয়া আছে। তপস্যা করিতে করিতে স্থির, ধীর যোগী, তারপর কি হইল না ফুল, ফল আবার সেই ফলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বীজ। সেই বীজের একটিতেই আবার গাছ, ফুল, ফল হইবে। আগেও যা একেবারে শেষেও তাই। তাইত বলি আগেও বে-দন্ত পরেও বে-দন্ত মাঝখানের দাঁতগুলি নিয়াই যত গণ্ডগোল। এক ছাড়া আর কি আছে?” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “এই যে বলিলাম পূর্ব্বে পরে এই পূর্ব্বপর

বলিয়া আবার কোন কথাই নাই। এই যে মাঝখানে যাহা দেখিতেছ তাহা মায়ার খেলা, আসল তত্ত্ব ত এক।”

মা ও আমি এক ঘরে বসিয়া আছি কথায় কথায় উঠিল আমরা যে বলি “তিনি করাইলে তবে ত’ করিব, তিনি জানেন” ইত্যাদি এই কথায় মা বলিতেছেন “সর্ব প্রথম তিনি কে তাহা জানিতে চেষ্টা কর, তাঁর সহিত কি সম্বন্ধ তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা কর, তবে ত’ বলিবার অধিকারী হইবে যে ‘তিনি যাহা করান তাই করিতেছি’ এখন ত’ তাঁহার সহিত পরিচয়ই নাই, তবে তিনি, তিনি করিতে করিতে তাঁর অনুসন্ধানের ভাবটা জাগিতেও পারে।

মার অশুখ পেটে ব্যথা, সর্দি, ইত্যাদি সবই আছে। মাকে অনুযোগ করা হইতেছে “মা, অশুখ নিয়া বসিয়া আছ কেন ? ইচ্ছা করিলেই ত’ তাড়াইয়া দিতে পার।” মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন “সবই আমার পুতুল, পুতুল নিয়া খেলা না করিয়া আশি থাকিতে পারি না। একটা না একটা পুতুল নিয়া আমার খেলা চলে। কখনও তোমাদের নিয়া খেলা করি, কখনও এই দেখনা তিন চারটি পুতুল (সর্দি, কাশি, প্যালপিটেশন, ব্যথা) নিয়া খেলা হইতেছে আবার কখনও শরীরটা চূপ হইয়া যায় তখন চূপরূপী পুতুল নিয়া খেলা চলে, আবার যখন কথা চলে তখন বাক্যরূপী পুতুল নিয়া খেলা হয়। এই রকম প্রয়োজনানুসারে এক একটি পুতুল নিয়া খেলা হইয়াই যাইতেছে।” এই বলিয়া ছেনমানুষের মত হাত তালি দিয়া

হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন “তোমাদের দৃষ্টিতে এই শরীরটা যতক্ষণ এ খেলাও ততক্ষণ।” অনেক সময় দেখা যায় পারমাণ্বিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি কোনটার সঙ্গেই যেন মায়ের কোন যোগ নাই, একেবারে শান্ত, এইও যেন একটা খেলা। মা বলেন “খেলা যা কিছু বল নিজকে নিয়াইত। কি দ্রুত জান না? যেমন পায়ের আঙ্গুল নাড়িতেছ, আবার হাতের আঙ্গুল নাড়িতেছ, আবার নিজেই হাততালি দিয়া হাসিতেছ, এই যে সব দেখিতেছ শরীরটা তোমরা দেখিতেছ বলিয়াত?” আবার বলিতেছেন “খেলাও যার, দেখাও তার, আবার দেখ, খেলা বা দেখা বলিয়া কোন কথাই নাই।”

সন্ধ্যা বেলা অনেকে আসিয়াছেন, পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকও কয়েকটি আসিয়াছেন, মাকে ইহারা পূর্বেও কয়েক জনে দেখিয়াছেন, সকলেই বলিতেছেন “মা তোমার নিকট হইতে উঠিতেই ইচ্ছা হয় না।” একটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক বলিতেছেন “দিদি, আমি যখন মার নিকট আসিবার জন্য রওনা হই তখন আমার বুক ধড়ফড় করিতে থাকে যে কখন আসিয়া মার পায় সব শরীর মন ঢালিয়া দিব”।

কথায় কথায় ৬ নির্মল বাবুর মৃত্যুর কথা মা উঠাইলেন। আমাকে বলিলেন “এই সব পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকেরা তখন ছিল”। এই বলিয়া হিন্দিতেই বলিতে লাগিলেন “দেখি কি চমৎকার যখন নির্মল বাবু হরিদ্বার আসিয়া মুসৌরীতে

টিটি লিখিল, মা, অনুমতি দাও তোমার কাছে যাইব”। আমি জ্যোতিষকে দিয়া লিখাইয়া দিলাম “বখন সময় হইবে তখনই দেখা হইবে।” “এই পত্র পাইয়াই নির্মল বাবু রওনা হইয়া আসিল, আসিয়া রাস্তা হইতে আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল ‘মা আমি আসিয়াছি, আমার সময় হইয়াছে না’? আমি বলিলাম “হঁা হইয়াছে”। “আমরা সনাতন ধর্ম্মশালায় ছিলাম, উহাদের যায়গা হইলনা বলিয়া উহারা পাঞ্জাবীদের গুরু দোয়ারাতে রহিল। রোজই আমাদের ওখানে যাইত। রাত্রির খাওয়া দাওয়া কখনও ওখানেই করিত। একদিন তরুর গোপাল নিয়া ছুটামি করা হইল তখন বাবাজী কথায় কথায় (নির্মল বাবু) বলিল আমার ঘর বাড়ী সব গোপালের আমার কিছু নয়’। খুব চাপা লোক ছিল একথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হওয়া সহজ ছিল না। একদিন তার ইচ্ছা হইল বলিল সকলে মাঝে রাঁধিয়া খাওয়ায় আমিও আজ মাঝে পরোটা তরকারী করিয়া খাওয়াইব।” তাই করিল। তারপর একদিন কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়াছে আমি দেখি সমস্ত মুখে যেন গাঢ় লালের উপরও একটা কাল আভা পড়িয়াছে। বলিলাম ‘তোমার কি শরীর খারাপ হইয়াছে’? বলিল ‘না, মা, আমি আজ ১০।১২ মাইল হাটিয়া আসিলাম’। তারপর পায়খানায় গেল রুষ্টি হইতেছিল, আসিয়াই বলিল ‘আমার পেটে বেদনা উঠিয়াছে, কলিকের বেদনা তাহার ছিল। শুইতে

বলা হইল। খানিক পর গুরু দোয়ারাতে যাইবে, বলা হইল
 ডাঙি আনিয়া দেওয়া হউক, উত্তরে বলিল, কেন মা, আমার এখনও
 এমন শক্তি আছে আমি দুই তিন জন উঠাইয়া নিয়া যাইতে
 পারি'। তারপর তাহারা সকলে চলিয়া গেল। জ্বর হইয়াছে
 খবর পাইলাম, তাহার স্ত্রী আসিয়া আমাকে অনেক বলিল
 মা একবার চল দেখিয়া আসিবে। ওটাত গুরু দোয়ারার
 ধর্মশালা তোমার ত যাইতে বাধা নাই। কিন্তু কেমন খেয়াল
 হইল না বলিলাম 'না যাইবার খেয়াল হইতেছে না'।
 দুঃখিত হইয়া সে ফিরিয়া গেল। সর্বদা উহার আমার
 কাছে থাকে সকলেই একবার দেখিয়া আসিতে বলিল কিন্তু
 যাইবার খেয়ালই হইল না। নির্মল বাবুর কাছে গিয়া
 তাহার স্ত্রী বলিল 'দেখ মাকে কত বলিলাম একবার আসিয়া
 তোমাকে দেখিয়া যাইতে, মা কিছুতেই আসিলেন না'।
 নির্মল বাবু বলিল 'ব্যস্ত হও কেন? মা সময় মত আসিবেন'।
 তারপর দিন বৈকালে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে বেড়াইতে
 বাহির হইয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া ধর্মশালার দরজায়
 দাঁড়াইয়া আছি তখন ভাব এই হইল যে কেহ একবার
 বলিলেই এখন নির্মল বাবুকে দেখিতে যাই। এর মধ্যেই
 ভোলানাথ নির্মল বাবুকে দেখিয়া আসিয়াই আমাকে
 বলিল 'চলনা একবার দেখিয়া আসিবে উহার এই অবস্থা'।
 আমি এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িলাম।
 রাস্তায় ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম ডাক্তাররা, কি

বলে ? সে বলিল 'ডাক্তাররা বলে এখনও এমন কিছু অবস্থা
 খারাপ নয় দুই তিন দিনের মধ্যে কিছু হইবে না'। আমি
 কিন্তু অসুখ হওয়া মাত্রই জ্যোতিষকে বলিয়াছিলাম ভাল
 করিয়া চিকিৎসার যেন ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আজ
 বলিয়াছি ওদের যেন দুঃখ না থাকে সিভিল সার্জেন
 আনাইয়া দেখান দরকার। তাহার বন্দোবস্তও করা হইল।
 আমরা পৌছিতেই নির্মল বাবু খাটিয়ার উপর হইতে শোওয়া
 অবস্থাতেই হাত বাড়াইয়া পায়ের ধুলা লইল। তারপর দুই
 একটি কথা বলিল। ভাল ভাল দুই চারটি শব্দও বাহির
 হইল। এর মধ্যে সিভিল সার্জেন আসিয়া পৌছিল, ঘরে
 যায়গাও বেশী নাই অবস্থাও প্রায় শেষ সময় দেখিয়া
 ভোলানাথ ভয় পাইল পাছে আমার শরীর কেমন হইয়া
 যায়। আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন 'তোমরা ত
 দেখিয়াছ ভোলানাথের সর্বদাই একটা ভয় থাকিত এই
 শরীর টার কখন জানি কি পরিবর্তন হয়। কান্না কাটিত
 নাই, কিন্তু শরীর ছাড়িতে মুহূর্তও লাগিবেনা, ইহা তাহার
 মনে হইত। তাই ভয় পাইয়া আমাকে হাত ধরিয়া উঠাইবার
 চেষ্টা করিয়া বলিল 'চল যাই'। আমিও স্থির ভাবে উঠিয়া
 দাঁড়াইলাম রুগীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি চক্ষু তখন
 উর্দ্ধদৃষ্টি, আমিত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, সেই
 সময়ে আমার হাত দিয়া তাহার ব্রহ্ম তালুর স্থানটা স্পর্শ
 করা হইল এবং তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

প্রাণবায়ুও প্রায় তখনই বহির্গত হইয়া গেল। সিভিল সার্জেন নাকি একটা ইনজেক্সন এই অবস্থার মধ্যেই করিয়াছিল। নিশ্চল বাবুর কিন্তু বরাবরই একটা কথা ছিল ‘আমার শেষ সময় দেখিলেও কেহ যেন ইনজেক্সন না করে’। কিন্তু সে সময় সে কথা তাহাদের কাহারও খেয়ালও হয় নাই”। এই বলিয়াই বলিতেছেন “দেখ অনেকেই বলে না, ‘মা, অন্তকালে যেন তুমি উপস্থিত থাকিও’, নিশ্চল বাবু চাপা লোক সেও অনেক সময় বাহিরে যেন ঠাট্টার ভাবে বলিতেছে, কিন্তু তাহার ভিতরের কথা তাই, বলিত ‘মা, শেষ সময় উপস্থিত থাকিও’। সকলে তাহার একথা ধরিতে পারিত না, ভাবিত হয়ত ঠাট্টা করে। কিন্তু তাহা যে তাহার প্রাণের কথা একথা সকলে বুঝিত না। আমি তাহা ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, যাহা হইবার হইয়া যায়।”

আরও খানিক সময় কথা বার্তার পর ধীরে ধীরে সকলে চলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

১৭ই ভাদ্র শনিবার :—

আজ মা প্রায় ৮টায় উঠিয়া বসিয়াছেন। আজ মাকে একটু ভাত ও তরকারীর ঝোল করিয়া দেওয়া হইল। ঝাওয়া দাওয়ার পর আমি মার সঙ্গে কথা বার্তা বলিতেছি কথায় কথায় আমি বলিতেছিলাম “মা, রমনার আশ্রমে যে সমাধি স্থানের উপর তোমার পাদপদ্ম জ্যোতিষদাদা স্থাপিত

করিয়াছেন” এই কথা শোনা মাত্রই মা বলিলেন “সমাধি স্থানের উপর একথা কাহার নিকট শুনিলে”? আমি বলিলাম অনেকের মুখেই শুনি উহা একটি সমাধি কাহার নিকট তাহা নাম করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম।” মা কিছু বলিলেন না সত্যি কথা এই যে মাকে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও আজ পর্যন্ত ঐ স্থানটার বিষয় কিছু জানিতে পারি নাই। ওটা বাস্তবিক কাহার ও সমাধি স্থান কিনা এ বিষয়ও মার মুখ হইতে এখনও কিছু শুনিতে পারি নাই।

আবার কথা উঠিল মা যে মাটিতে ভাত ঢালিয়া খাইতেন। আমরা যখন খাওয়াইয়া দিতাম তখন ত একটু জায়গা পরিষ্কার করিয়া দিতাম কিন্তু তার পূর্বে মা যখন নিজে হাতে খাইতেন তখনও কিছু সময় মা মাটিতে ভাত খাইতেন। সে সময় এমন করিতেন যে জায়গা পরিষ্কারও করিতেন না ভিটি পাকাই হউক বা মাটিরই হউক কত পায়ের ধুলা কত চুলও কত সময় থাকিত, কাঠি কুটা সব পড়িয়া; আছে তার মধ্যেই যেটুকু ভাত খাইতেন ঢালিয়া নিতেন। কত দিন এই ভাবেই কাটিয়াছে। কাঠি, কুটা, চুল ইত্যাদি ভারতে সঙ্গে সঙ্গেই মুখেও দিতেছেন। পরিষ্কার করিয়া নিবার মত ভাবটাও তখন জাগিবার মত অবস্থা ছিলনা।

প্রথম ভাগে ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে মা বলিতেন “আমি কয়েক হাত উপরেই শূণ্ণের মধ্যে দুইটি মহাপুরুষ

বসিয়া আছেন দেখিলাম একটি গুরু অপরটি শিষ্য—শিষ্যটি দাঁড়াইয়া আছে।”

একথায় মা বলিলেন “একটি মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। আর একটি ভাহার শিষ্য সে দাঁড়াইয়া আছে।”

প্রথম ভাগের ১৭৫ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে “খাওয়া দাওয়ার পর মা পাহাড়ের নীচে জ্যোতিষ দাদার বাসায় বেড়াইতে গেলেন ” মার সঙ্গে এই কথা আলোচনায় মা বলিলেন “তা নয় অষ্টভূজা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াই আমি নীচে জ্যোতিষের বাসায় চলিয়া গেলাম, যাইবার সময় বলিয়া গেলাম আমি আজ খিচুড়ি খাইব। খাওয়ার পূর্বেই জ্যোতিষের বাসায় গিয়াছিলাম। আর ডান পায়ের সাপে কামড়াইয়াছিল আর জ্যোতিষ ঔষধ ঢালিয়া দিল বাম পায়।”

এই স্থানে আরও একটি কথা লিখিতেছি প্রথম ভাগে ১৮৮ পৃষ্ঠায় একটি কথা বড়ই ভুল লিখা হইয়াছে। আমাদের ক্রটিতেই এই ভুল হইয়াছে। কথাটী এই লিখা হইয়াছে “কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিবার সময় প্রথম প্রথম মা খুব তাড়াতাড়ি উঠিলেন খানিক দূর গিয়াই শ্বাস কষ্ট হওয়াতে আর উঠিতে পারিলেন না। আমরা ধরা ধরি করিয়া কোন প্রকারে উঠাইয়া নিলাম।”

একথাটি সম্পূর্ণ ভুল, ব্যাপারটা এই হইয়াছিল :— মা খুব তাড়াতাড়ি উঠিতে উঠিতে হঠাৎ শ্বাসের গতির সঙ্গে

ভাগ]

প্রথম অধ্যায়

১৯৫

শরীর একেবারে ছাড়িয়া দিলেন যেন অবশ শরীরের কেমন একটা ভয়ানক ভাবের পরিবর্তন হইয়া গেল। আরও একটা বিশেষ কথা এই যে সঙ্গীয় আমরা কয়জন একেবারে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম ওঠা দায় হইয়া উঠিল। মার ভাবের এই রকম পরিবর্তন দেখিয়া মার শরীর রক্ষা করিবার জন্ত আমরা এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম যে সেই চিন্তায় আমাদের পরিশ্রান্ত ভাবটা যে কোথায় কখন চলিয়া গেল আমরা বুঝিতেই পারিলাম না। বাকি পথটা মার শরীর বহন করিয়া আমরা অনায়াসে উঠিয়া গেলাম। কে বলিবে আমাদের শ্রান্তি অপনোদনের জন্তই মার ঐ ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল কিনা ?

আরও একটি কথা ১৯৮ পৃষ্ঠায় আমাদের টিকাটুলির বাসায় দুর্গা পূজার কথা আছে। সেই পূজায় বলির কথা লিখা আছে। আজ কথায় কথায় সেই কথা উঠিল। মার সঙ্গে কথা বলিয়া আমারও বেশ মনে পড়িল একটি ঘটনা লিখাই হয় নাই, কিন্তু ঘটনাটি বেশ সুন্দর। ঘটনাটি এই—যখন পাঠা বলি দিতে পাঠা ঠেকিয়া গেল তখন বাড়ীশুদ্ধ স্ত্রী লোক ভাবিআশঙ্কায় অস্থির হইয়া ওঠেন, সেই সময়তে মা নন্দকে বলিলেন “এখনই তাজা ডাব আনাও।” তাই করা হইল। পরে মা বলিলেন “ইহা হইতে একটা ডাব বলি দেওয়া হউক। আর তাহার মাথার দিকের অংশটায় যে জল থাকিবে তাহা দিয়াই পূজায় রুধিরের ত্রিগ্নাদি করা

হইবে।” সুরেন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই ডাবটিকে বলি দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় ডাবের দুই অংশ দুই দিকে পড়িয়া গেল। নীচের অংশটা গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মাথার দিকের অংশটা চিৎ হইয়া পড়িল তাই তার মধ্যে কতকটা জল রহিয়া গেল। সেই জল দিয়াই পূজার রুধিরের ক্রিয়াদি করা হইল। ইহার পর হইতেই দেখা গেল ভাবী বিপদের আশঙ্কায় বাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়া ছিলেন তাহাদের মন হইতে আশঙ্কার দাগ মুছিয়া গেল। আবার পূর্বের মত আনন্দের স্রোত চলিতে লাগিল।

মার কত ভাবের খেলাই দেখিতেছি। হয়ত বা আমাদের মন হইতে এইরূপ একটা অশান্তির দাগ মুছিয়া ফেলিবার জন্তই মার এই ডাবের খেলাটো জাগিল। কোন কোন সময় যেটা খেলা হইত শত বাধা বিঘ্ন হইলেও সে কাজটি করাই চাই, আবার বিঘ্ন নাশ করিবার বিধি গুলিও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। যিনি গড়িতেছেন তিনিই ভাঙিতেছেন। মা এই জন্তই বলেন “যিনি উঠাইতে জানেন তিনিই ডুবাঁইবার খেলাটাও খেলিতে পারেন।”

স্বামিজী আজ বৈকালে মাকে একটু বেড়াইতে নিয়া গেলেন। বেড়াইয়া ফিরিতেই দুই চার জন করিয়া লোক মার দর্শনে আসিতে লাগিলেন। আজ সকালে একটি ঘটনা ঘটয়াছে। আজ ৮টায় মার খাবার তৈয়ার করিয়া মাকে ডাকিতেছি মা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়াই আছেন। খানিক

পর উঠিয়া বসিলেন কিন্তু মুখ ধুইতে যাইতেছেন না। এই করিতে করিতে ৯টা বাজিয়া গেল। ৯টার পর দেৱাত্ন হইতে শশাঙ্ক ব্রহ্মচারী কিছু পাটপাতা নিয়া আসিয়া উপস্থিত। মার জন্ম একজন পাঠিয়ে দিয়েছেন। মা তখন হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন “দেখত, আমাকে ৮টায় খাওয়াইতে চাহিয়াছিল, তবে পাটপাতা যে পাঠাইল তাহা কি করিয়া খাওয়াইতে?” আমরা বুঝিলাম মা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্মই বসিয়া ছিলেন। এই পাটপাতার আরও ঘটনা, মা কয়েক দিন পূর্বে এই মুসৌরীতেই রাস্তায় হাটিতে হাটিতে আমাকে বলিতে ছিলেন “পাটপাতা আনাইতে পার?” এদিকে পাটপাতা পাইবার কোন উপায় নাই, তাই আমরা হাসিয়া একথা উড়াইয়া দিলাম। তারপর এর মধ্যে কয়দিন পূর্বে দেৱাত্ন খাওয়া হইল সেখান হইতে আসিবার দিন একটি ভদ্রলোক (শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র মা তাকে বলেন “কর্ম্মযোগী”) আশ্রমে বসিয়া গল্প করিতেছেন তিনি পাটগাছ লাগাইয়াছেন একথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু বলিলেন “মাকে কিছু পাঠাইয়া দিও” তখন মাও হাসিয়া উঠিলেন আমাকে বলিলেন “খুকুনী সেদিন না পাটপাতার কথা বলিয়াছিলাম।” আমারও তখন মনে পড়িয়া গেল।

আবার আজ সন্ধ্যায় পাটপাতা নিয়া আরও একটি ঘটনা ঘটিল একটি ভদ্র মহিলা আসিয়া বলিলেন “মা, স্বামিজীর (একটি স্বামিজী এখানে আছেন মার সঙ্গে তাঁর

কয়েকবার দেখা হইয়াছে) একটি ভক্ত কলিকাতা হইতে লেবু, চালতা কি কি সব নিয়া আসিয়াছেন স্বামিজী বলিয়াছেন ‘মাকে বলিও মা বাহা খান এখান হইতে পাঠাইয়া দিব’। মা শুনিয়া বলিলেন “বাবা বাহা মেয়েকে দিবেন তাহাই ঠাইব। তবে একটা কাজ আগে কর বাবাকে কিছু পাটপাতা পাঠাইয়া দেও।” পাটপাতা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। স্বামিজী সেই পাটপাতা পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন “আমি কয়দিন যাবত ইহাদের বলিতে ছিলাম পাটপাতা পাওয়া যায় এখানে?” তখনই তাঁহার এক সেবক দিয়া মার জঘ লেবু, চালতা ইত্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। ভদ্রমহিলাটি স্বামিজীকে বলিয়া আসিলেন “বাবা আপনি যে পাটপাতার কথা বলিয়া ছিলেন আপনার মনের ভাব জানিয়াই মা বোধ হয় আপনাকে পাটপাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

আজও সন্ধ্যা কীর্তনাদি হওয়ার পর সকলে বিদায় নিলেন।

১৮ই ভাদ্র, রবিবার :—

আজও সকাল বেলা মা উঠিবার পূর্বেই কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কথা হইয়াছে আজ ভোর ৬টা হইতে ১০টা অবধি কীর্তন হইবে। বেলা প্রায় ১২টা অবধি কীর্তন হইল। পরে সকলে মাকে নিয়ে বসিলেন। এখন অনেকেই মার গলায় মালা দেন পায় ফুল দেন। সে সম্বন্ধে কথা হইতেছে এখন ত এসব দেওয়াতে মা কিছুই বলেন না কিন্তু প্রথম প্রথম এমন

গিয়াছে মালা ত দূরের কথা একটা ফুল কি বেলপাতা গায় ফেলিয়া দিলেই শরীর ঢলিয়া পড়িয়া যাইত। অবস্থার একটা বিষম পরিবর্তন হইয়া যাইত। যেন প্রস্তর মূর্তি। এইভাবে পড়িয়া থাকিতেন। উৎসবের মধ্যে ভোলানাথ যখন মার পূজা করিতেন তখন মার শরীর জল, ফুল, বেলপাতায় ঢাকিয়া যাইত মা সেই ফুল বেলপাতার নীচে এমন ভাবে পড়িয়া থাকিতেন যেন পাথরের মূর্তি, নীরব, নিম্পন্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে কাটিয়া যাইত। তারপর আমরা উঠাইয়া নিয়া কাপড় ছাড়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিতাম। তার পূর্বে ত কাহাকেও ফুল ইত্যাদি দিতেই দিতেন না বলিতেন “ওসব কি মানুষের পায় দিতে হয় দেবতাকে দিও” তারপর হইল ফুল বেলপাতা ফল কিছু দিতেই বাধা দিতেন না কিন্তু এসব ভাবের কিছু কেহ দিলেই শরীরের অবস্থা ঐ রকম পরিবর্তিত হইয়া যাইত। উঠাইতে অনেক সময় যাইত।

কথায় কথায় মা বলিতেছেন “এই যে লোকে সব সদা-লোচনা করে কিসের জ্ঞান ? আলোচনা করে অ-লোচন হইবার জ্ঞান ত ? যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণই সৃষ্টি।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আরও এক কথা বলিলেন “তোমাদের গহ্বরের কালীর দরজা খোলার ভার যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছিল। আর সেই সময়তেই প্রণামীর টাকা পয়সার হিসাবও তাহার কাছেই হওয়ার কথা ছিল, এখন ত দরজা খোলা বন্ধ হইয়া গেল,

কিন্তু প্রণামীর টাকার হিসাব এখনও পূর্বোক্ত মত যোগেশ বাবুর কাছে এবং তার অভাবে তাহার ছেলে অথবা স্ত্রেন বাবুর (বাডুয়ার) ছেলেরা এই কার্যের ভার নিতে পারে। আজ আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই।

১৯শে ভাদ্র, সোমবার :—

আজ সকালে মা উঠিয়াছেন। আজও মা ভাত বা রুটি খাইলেন না। কয়দিন যাবতই প্রায় দুধ সাবু কি তরকারী জলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়ান হইতেছে। আজও তাহাই খাইলেন। দুপুরে ১২ টায় কয়েক খানা চিঠি পড়াইয়া শুনাইলাম। আবশ্যকীয় দুই এক কথার জবাব দিলেন। তারপর বলিলেন “চল ঘুরিয়া আসি তারপর শুইব।” রিক্সা করিয়া Camel Back দেখিতে যাওয়া হইল। বেবীদিদি ও স্থানটা দেখেন নাই। প্রায় ১১০ টায় বাহির হওয়া হইল, বাহির হইতেই ভয়ানক বৃষ্টি। কোন প্রকারে যাওয়া হইল। বেলা প্রায় ৪ টায় আমরা ফিরিয়া আসিলাম। মা শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পূর্বে মা উঠিলেন। সন্ধ্যায় আজও প্রতি দিনের মত একটু কীর্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১০ টায় মার ঘরের আলো বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমি ও বেবীদিদি প্রতিদিনের মত মার শয্যা পার্শ্বেই কন্ডল বিছাইয়া শয়ন করিলাম।

২০শে ভাদ্র, মঙ্গলবার :—

প্রতিদিনের মত আজও বৈকালে মা উঠিয়া বসিলেন।

দর্শনার্থীরা অনেকে আসিয়াছেন। লক্ষ্যে হইতে এক ইঞ্জিনিয়ার (ইউ, পির লোক) সস্ত্রীক মার খবর এলাহাবাদে মহারতনের নিকট ও বাবু শিবপ্রসাদের নিকট পাইয়া মার খোঁজ করিতে করিতে এখানে আসিয়াছেন। শিখ সম্প্রদায়ের এক সর্দার মার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছেন। আরও অনেক বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী স্ত্রী, পুরুষ আসিয়াছেন। শিখ সম্প্রদায়ের সর্দারটি বলিতেছেন “মা তোমার কাছে আসিয়াছি সাধু সঙ্গ করিতে পারিয়াছি এখন আবার ভিখারী থাকিব কেন ?” মা উত্তরে বলিতেছেন “তঁার সঙ্গ করিতে পারিলে ত আর কথাই থাকে না। সঙ্গ করা হয় কই ?” ইঞ্জিনিয়ারটি বলিলেন “তবে কি কিছুই হয় না ?” মা বলিলেন “কিছুই হয় না একথা আমি বলিতে পারি না ভয়ানক রোদ্দ গাছের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলে গাছের স্বভাবই ছায়াদান করা, ছায়া তুমি পাবেই, যতক্ষণ গাছের নীচে থাকিবে, গাছের প্রভাব তোমার উপর আসিবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তুমি যদি গাছের ছায়ায় একবার দাঁড়াইয়া আবার রোদ্দে যাইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে থাক তবে পরিশ্রান্ত হইবেই।”

ইঞ্জিনিয়ারটি বলিলেন “মা, সকলেই বলে কলিযুগে নামই একমাত্র সাধন। অথচ আমি দেখি অনেক স্থানে অনেকে কত বছর যাবত এই নাম করিতেছেন কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না ইহার কারণ কি ? আমার মনে হয় এই নাম করিবারও হয়ত একটা বিশেষ বিধি আছে তাহা জানিয়া

সেই রকম ভাবে নাম করিলে কাজ হয়, নতুবা কিছুই হয় না।”
 মা বলিলেন “দেখ নাম ও নামী ত এক যেমন আমি যদি
 তোমার নাম ধরিয়া ডাকি তুমি আসিয়া হাজির
 হইবে। কাজেই নামেই কাজ হয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।
 তবে কখনও কখনও দেখনা কোন কোন ছেলে পেলে
 পড়িয়া যাইতেছে কিন্তু তাহার মাথায় কিছু ঢুকিতেছে না
 সেই রকম আর কি। আরও দেখ ঐ নাম নিয়া হয়ত
 অনেকটা পবিত্র হইয়াছে না নিলে হয়ত আরও কত খারাপ
 হইয়া যাইত।” ইঞ্জিনিয়ারটি মার এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া
 বলিলেন “হাঁ মা, এত খুব ঠিক কথা।” আবার কথায়
 কথায় সর্দারটি বলিতেছেন “মা জীবন্মুক্তদের কি স্বপ্ন
 হয়?” মা হাসিয়া বলিলেন “যাহারা চির জাগ্রত তাহাদের
 স্বপ্ন কি করিয়া হইবে? আর স্বপ্ন যদি বল তবে এই যে
 আমরা সব দেখিতেছি সবইত স্বপ্ন।” সর্দারটি অনুমোদন
 করিয়া বলিলেন “ঠিক মা ঠিক” বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।
 আবার সর্দারটি বলিলেন “আচ্ছা মা, জীবন্মুক্তদের রোগ হয়
 কিনা?” মা বলিলেন “যাহারা জীবনাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন
 তাহাদের এরূপ রোগ ভোগের প্রশ্ন কোথায়?” মা আরও
 বলিলেন “দেখ দেহাটুনে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর আসিয়াছে
 আমি কাঁপিতেছি এই অবস্থায় এক সন্ন্যাসী গিয়াছেন। আমাকে
 গিয়া বলিতেছেন “মা আপনি অনেক দিন যাবত অন্থখে
 ভুগিতেছেন আপনাকে আমি একটা ঔষধ আনিয়া দেই।”

আমি হাসিয়া বলিলাম “বাবা বেদান্তের মতে নাকি সমবৃত্তি সমদৃষ্টিতে থাকিতে হয়। তুমি সন্ন্যাসী বেদান্তবাদী তুমি রোগকে ঘেঁষ করিতেছ কেন? বাবা, আমি ত তোমাকেও তাড়াইয়া দিতেছি না রোগটাকেই বা তাড়াইয়া দিব কেন? যাহার যে কাজ করিয়া যাইবে রোগ যদি এ শরীরটাকে নিয়া যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি, এক আনন্দেরইত সব মূর্ত্তি। কাহাকেও ডাকিয়াও আনি নাই কাহাকেও তাড়াইয়াও দিতেছি না কাহাকে তাড়াইব? এক ছাড়া যে দুই নাই। আর দেখ বাবা! শুধু সন্ন্যাস নিয়া সাজ সজ্জা করিয়া শরীরটা রক্ষা করিয়া সুস্থ দেহে দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইবার জন্যই ত সন্ন্যাস নেওয়া নয়, বা তোমাদের বেদান্তের মূল তত্ত্বও তা নয়। সমবৃত্তি, সমদৃষ্টিতে স্থিতি, আত্মস্থিতি, অর্থাৎ স্বরূপ লাভ করা এই ত উদ্দেশ্য। তবে অসুখটাকেই বা ঘেঁষ করা কেন? যদি ঘেঁষ মিত্র এ সব ভারই রহিল তবে আর আসল তত্ত্বের হইল কি?” এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। ইঞ্জিনিয়ারটিও সর্দার সাহেব এ সব কথায় খুব সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন “মা এ বড় চমৎকার ভাব। এরূপ ভাব বড় দেখা যায় না।” কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। একটা মেয়ে গান করিল। বেশ সুন্দর গায়। তারপর কীর্ত্তন হইল। রাত্রি প্রায় ১০টার একে একে সকলে বিদায় নিলেন।

২১শে ভাদ্র বুধবার :—

আজ বৈকালে মাকে নিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইব

এর মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত সর্দার সাহের আর একজন শিখ সাধুকে নিয়া আসিয়া উপস্থিত। নূতন সাধুটি মাকে বলিলেন “মা, আমি আমার সঙ্গীয় এই মহাত্মার কাছে শুনিলাম এখানে একজন বিপ্লি (অর্থাৎ ভগিনী দেখিলাম ইহারা ভাই ভগ্নী সম্বন্ধ ধরিয়া কথা বলে মাতাজী বলে না) আসিয়াছেন তিনি দর্শন যোগ্যা, আমি কাল তাঁহাকে দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিয়াছি চলুন আজ আপনাকে তাঁর কাছে নিয়া যাই, তাই আপনার দর্শনে আসিয়াছি।” আমরা তাঁহাদের দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাকে নিয়া ঘরে বসিলাম। নূতন সাধুটি হিন্দি বলিতে পারেন তিনিই কথা বার্তা বলিতে লাগিলেন। তিনি মাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি উপাসনা করেন?” মা হাসিয়া উত্তর দিলেন “আমাকে দেখিয়া পিতাজী কিছু সে সম্বন্ধে বুঝিতে পারিতেছ না?” তিনি বলিলেন “না, আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে কিছু বুঝিতেছি না।” মা হাসিয়া বলিলেন “যদি উপাসনা বল, তবে নিজে নিজের উপাসনা করি।” গুরুর কথায় বলিতেছেন “প্রথম পিতা ও মাতা এই দুই গুরু তারপর তাঁহারা যাহার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন ‘এই তোমর গুরু’ তাহাকেই গুরু বলিয়া মানিলাম, তারপর তোমারা সকলেই এমন কি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সবই গুরু। কারণ এক মাত্র তিনিই গুরু আর এই বাহা কিছু দেখিতেছ সবই তিনি। কাজেই গুরু যদি বল একমাত্র তিনিই গুরু” আবার আমিই

আমার গুরু। আবার গুরু বলিয়া কোন কথাই নাই যা বল তাই। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁরপর সাধুটি বলিলেন “আপনি কাহাকে মানেন কৃষ্ণ রাম কি দেবী?” মা হাসিয়া বলিলেন “এক কৃষ্ণ বা এক রাম বা এক দেবীই ত সব ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, গুণ তত্ত্ব। এক ছাড়া ত কিছু নাই।” তিনি বলিলেন “দশরথের পুত্র রাম বা নন্দের পুত্র কৃষ্ণ।” মা অমনি বাধা দিয়া বলিলেন “আমি দশরথের পুত্র বা নন্দের পুত্র জানি না এক মাত্র রাম বা এক মাত্র কৃষ্ণ এই জানি।” সাধুটি আনন্দ পূর্ণ নয়নে মার দিকে চাহিয়া দুই চারিটি কথা বলিতে লাগিলেন। খানিক পরে সাধুটি বলিলেন “বেশ কথা, আচ্ছা বলুন ত এই পঞ্চভূতের সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?” মা অমনি হাসিয়া বলিলেন “এবার আমি পিতাজীর কাছেই জিজ্ঞাসা করিতেছি বলত আমার পঞ্চভূতের সঙ্গে কি সম্বন্ধ?” সাধুটি বলিলেন “একি কথা আমি আসিয়াছি আপনার নিকট হইতে কিছু নিতে আমি ভিক্ষুক, আর আপনি ভিক্ষুকের কাছেই আবার কিছু চাহিতেছেন? এক ঘরে যদি ভিক্ষুক ভিক্ষা নিতে আসে গৃহস্থ তাহার ঘরে যাহাই থাকে কিছু ভিক্ষা দিয়া দেয় তাহার নিকট কিছু চায় না আপনি উল্টা করিতেছেন কেন?” মা হাসিয়া বলিলেন “বাবা, আমি ত জানি আমরা সব এক ঘরেরই কে কাহাকে ভিক্ষা দিবে কেই বা নিবে? আমি তোমার মেয়ে আমাকে এমন কথা

বলিও না।” সাধুটি বলিলেন “মা, ফল ভার গাছ নতই হয় যতই লাঠি কাঠি দিয়া ডাল উচু করিয়া দেওয়া হয় গাছ শুধু নিচের দিকেই নামিতে থাকে। আর যাহার ভিতর ফাঁকা সে টান হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে যেমন বাঁশ গাছ।” এই রকম নানা কথা বার্তা হইল। সাধুটি বলিলেন বড় আনন্দ পাইলাম।” মার কথাবার্তা শুনিয়া বলিলেন “এ যে একেবারে বেদান্তের কথা।” লিখা পড়া কিছুই জানেন না এবং সাধন ভজনও বাহিরের দিক দিয়া কেহ করিতে কখনও দেখে নাই, গুরুও সাধারণের মত করেন নাই আমার মুখে এ সব কথা শুনিয়া সাধুটি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কথায় কথায় আবার বলিলেন “মা, গুরু ত একটা চাই ই”। দুই চারটা প্রমাণ দিয়া বলিলেন গুরু ছাড়া ত কোন কার্য্যই হইতে পারে না।” মা বলিলেন “পিতাজী, বাহা বলিতেছ খুব ঠিক কথা। কিন্তু এ শরীরটার সবই কেমন যেন হইয়া গিয়াছে বলিলাম ত গুরু যদি বল পাঁচ গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী, তোমরা সকলে তারপর একমাত্র তিনি, এই পাঁচ গুরু।” এই বলিয়া আবার বালক স্নলভ হাসি হাসিতে লাগিলেন। সাধুটি কিছু সময় আলাপের পর বলিলেন “আচ্ছা, আপনি বেড়াইতে যাইতে ছিলেন আমি আসিয়া বিরক্ত করিলাম এখন যাই।” এই বলিয়া হাত ঘোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে উদ্ভূত হইলে মাও হাত ঘোড় করিয়া বলিলেন “এমন করিয়া মাঝে মাঝে বিরক্ত

করিও। ভাল ভাল কথা হইল কত আনন্দ দিলে। আর দেখ বাবা, পর হইলেই লোকে বলে বিরক্ত করিলাম, কষ্ট দিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি আপন ঘরের লোক বলিয়া কথাবার্তা বলিলে কি এসব কথা আসে? আমরা যে বাবা এক ঘরের লোক।” এই বলিয়া আবার হাসিতে লাগিলেন। সাধু দুইটি মার এই কথা সমর্থন করিয়া “আচ্ছা, আচ্ছা” বলিয়া বিদায় নিলেন।

আমরা মাকে নিয়া উত্তর কাশীর রাস্তায় প্রায় দেড় মাইল যুরিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিলাম। কীর্তনাদি হইল। সবজজ যোগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, কৃষ্ণ বাবুর (রাজ পুতানার দিকে পশুর চিকিৎসা করেন) মা, আশু বাবুর (ইনি কাশ্মীরে প্রিন্সিপল ছিলেন এখন পেন্সন পাইতেছেন) স্ত্রী, ও কন্যা ঢাকার বরদা বাবুর এক কন্যা এবং এখানকার আরও কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে রোজই প্রায় মার কাছে আসেন। এখানে এখনই বেশ ঠাণ্ডা।

২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার :—

আজও দুপুরে মাকে শরীর অসুস্থতার জন্য ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া একটু শোওয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাল যে নূতন সাধুটি আসিয়াছিলেন তিনি দুপুর বেলাতেই আসিয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে আরও দুই তিন জনকে নিয়া আসিয়াছেন।

বৈকালে মা উঠিয়া বসিলেন। দুই চার জন আসিয়াছেন।

কথাবার্তা হইতেছে। মাকে একটু জল খাওয়াইতে নিয়ে গেলাম। একটি ভদ্র মহিলা মার জন্ম খাবার তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। মা হাসিয়া আমার নাকের কাছে নিজের ডান হাত খানি আনিয়া হাসিয়া বলিলেন “খুকুনি হাতে কিসের গন্ধ?” আমি হাতে অতি সুন্দর একটা আতরের গন্ধ পাইলাম তখন উপস্থিত সকলেই একে একে মার হাতের গন্ধ লইতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন চন্দনের গন্ধ, কেহ বলিলেন অতি সুন্দর ধূপের গন্ধ, কেহ বলিলেন আতরের গন্ধ, এইরূপ সকলেই একটা চমৎকার গন্ধ পাইলেন। বাম হাতে গন্ধ ছিল না। কয়েক ঘণ্টা পরে আর গন্ধ পাওয়া গেল না। এইরূপ গন্ধ পাওয়া নূতন নয়। আরও অনেক সময় মধ্যে মধ্যে মার গায়ে অতি সুন্দর গন্ধ পাওয়া গিয়াছে। আজ কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ১২টায়া মা শয়ন করিলেন।

২৩শে ভাদ্র শুক্রবার :—

আজ পূর্ণিমা তাই সকলে মিলিয়া উদযাস্ত কীৰ্ত্তন করিল। একটি এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ভোগের সব তৈয়ার করিয়া দিলেন সন্ধ্যালেলা সকলে প্রসাদ পাইলেন।

আজ দুপুর বেলা আমার মায়ের বাম হস্ত দিয়া সুগন্ধ বাহির হইল। ডান হাতে আজ গন্ধ নাই। আজ মা বিশেষ কিছূই খাইবেন না বলিয়াছিলেন। সকালে আমি ও মা রিক্সা করিয়া উত্তরকাশীর রাস্তায় প্রায় দেড় মাইল ঘুরিয়া আসিলাম। মা খাইবেন না তাই আমাদের জন্ম একটা খিচুড়ি করিয়া নিব

ভাবিয়া ডাল চড়াইয়া মার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিলাম আসিয়া দেখি ডালের নীচে অনেকটা পুড়িয়া গিয়াছে। মা দেখিয়া বলিলেন “আমি আজ এই ডালই খাইব।” শরীর অসুস্থ তাই অতি সাবধানে পথ্যাদি দেওয়া হয়। কিন্তু আজ ঐ পোড়া ডালই খাইবেন বলিলেন “জিনিষে অভিসম্পাত করে, কেন জিনিষ নষ্ট করিবে? সত্যই আজ ঐ পোড়া ডাল দিয়া কয়েক গ্রাস ভাত খাইলেন আর কিছু করিতে দিলেন না। দুইটি ভদ্রমহিলা মায়ের সেই প্রসাদ নিয়া বলিলেন” এই এ যেন অমৃত কোন রকম পোড়া গন্ধই ত নাই”। অথচ মাকে খাওয়াইবার সময় তাহারা বলিতেছিলেন “দিদি, এই পোড়া ডাল মাকে দিবেন না” মাকেও বলিতেছিলেন “মা এগুলি খাইওনা”। মা খাইতে খাইতে হাসিয়া বলিলেন “আচ্ছা তোমাদের খাওয়াইতেছি” এই বলিয়া তাহাদের খাওয়াইলেন তাহারা চাহিয়া চাহিয়া প্রায় সবটা প্রসাদ শেষ করিলেন। এই কথা নিয়া খুব আনন্দ করা হইল।

ভোগের পর সকলে চলিয়া গেলেন। মা, আমি ও বেবী দিদি বসিয়া আছি। কথা উঠিল মা বেবীদিদিদের দেয়াত্ন পৌছিবার পূর্বদিন ভোগে বসিয়া আমার কাছে বলিয়াছিলেন একজনের অপমৃত্যু হইতেছিল সেই সময়তে মা যেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খেয়াল জাগিল অপমৃত্যু হইতে দেওয়া হইবে না। তাই হইল বাহির হইতে যদিও দেখা গেল অপমৃত্যু কিন্তু বাস্তবিক তাহার অপমৃত্যু হয় নাই। এই কথার

পর একদিন নাকি এখানেই রিক্সাতে বসিয়া বেবী দিদিকে বলিয়াছিলেন স্নকুমারের (বেবী দিদির বড় ছেলে, যাহার গত বৈশাখ মাসে মোটর পড়িয়া গিয়া মৃত্যু হইয়াছে । ছেনেটি I.C.S. পাশ্ করিয়া C. P. তে এডিশ্যুয়াল জজের পদে নিযুক্ত ছিল) কথায় মার ঐরূপ খেয়াল হইয়াছিল । আর বিশেষ বিস্তারিত করিয়া কিছু বলেন নাই । কোন বিশেষ কথাও মা বড় প্রকাশ করেন না কথায় কথায় হয়ত দুই তিনবারে একটা বিশেষ ঘটনা মার মুখ হইতে পরিকার শোনা যায় । যা বলেন “ঘটনা ত কতই হইতেছে তাহা বলিব এমন ভাব ত জাগে না তাই বলা হয় না কথায় কথায় তোমরা যখন বেটুকু বাহির করিয়া নেও তাই বাহিরহয় মাত্র” । এই স্নকুমারের ঘটনাও খাইতে বসিয়া আমাকে কিছু বলিলেন, রিক্সায় বেবী দিদিকে কিছু বলিলেন কিন্তু বিশেষ কিছুই পরিকার হয় নাই, আজ অনেকটা পরিকার হইল । মা বলিতেছেন “দেখ স্নকুমারত আমার কাছে বেশী আসে নাই, সব নিয়া বোধ হয় চার বার আসিয়াছিল । প্রথমবার বেবী নিয়া আসিয়াছিল শাহবাগে তখন সে ছেলে মানুষ চোখ খারাপ ছিল তাই দেখাইতে নিয়া আসিয়াছিল সব সময় ত সব কথা হয় না, কিন্তু সেদিন বলিয়াছিলাম কুয়াসার জল পরিকার ঞ্চাকড়া দিয়া উঠাইয়া দুই তিনবার চোখে দিও তারপর চোখ ভাল হইল । তারপর একবার নিয়া আসিল সিদ্ধেশ্বরীতে যখন আমি অসুস্থ তখন বিলাত বাইতেছে বেবী আমাকে বলিল মা, তুমি ওর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর

আমি বলিলাম আমি ত ঐ রকম কাহাকেও করি না তুমি করিলেই হইবে। বেবীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি বেবীর হাত ধরিয়া ওর মাথায় দিলাম।” এই কথার পরেই বেবী দিদি বলিলেন “তখন একটা কাণ্ড হইল ওর মাথায় আমার হাত ধরিয়া মা দিতেই আমার হাত খানা পড়িয়াগেল মার হাতই ওর মস্তকে রহিয়া গেল”। মা বলিতেছেন “তৃতীয়বার দেখা কলিকাতায় বেবীর কথায় আমার পায় এক মুঠা ফুল দিল। চতুর্থবার কলিকাতায় যখন দেখা হইল তখন কথা হইল বেবী আমাকে মেয়ে করিয়া আমার নাম গৌরী রাখিয়াছে তাই আমি বলিলাম আমি তোমাকে (সুকুমারকে) কি ডাকিব? বেবী বলিল তুমিই ছোট তুমি ত মাত্র তিন বৎসর যাবত মেয়ে হয়েছে তাই ও বড়’। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম বেশ আমার ছোট দাদা। এই বলিয়া আনন্দ করা হইল। আর কিন্তু ওর সঙ্গে আমার দেখা নাই। কিন্তু যতবার দেখা হইল এক একটা ঘটনা হইল। বাহা হইয়াছে বলিতেছি হইলে আমি কি করিব?” এই বলিয়া বলিতেছেন সুকুমারের শেষ সময়তে যেই আঘাত পাইল এই শরীরটা (নিজের শরীর দেখাইয়া) সেইখানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমাকে দেখিয়া বহু পূর্বে আমি তাহাকে যে “ছোরদা” বলিয়া ডাকিয়াছিলাম সেই সব কথা এমন কি এই শরীর সম্বন্ধে সব স্মৃতি তাহার মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল এবং আমার খেয়াল হইল অপমৃত্যু হইতে দেওয়া হইবে না। তারপর শোন্, সে

ফিরিয়া চাহিল, আমাকে দেখিল, দেখা মাত্রই আশাত এমন কি তাহার বর্তমান অবস্থার কথা সে ভুলিয়া গেল তাই অবস্থারও পরিবর্তন হইল, এই শরীরের দিকে দেখিতে দেখিতে তাহার মৃত্যু হইল। কাজেই অপমৃত্যু হয় নাই। এই যে হইল বলিয়াছি ত আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না যাহার বাহ্য কর্ম তোমরা করাইয়া লও। ঐ ভাবে আশাত পাওয়াও কর্ম ছিল আবার ঐ ছোরদা ডাকে ইত্যাদিতে ঐ অবস্থা হইবে তাহাও ছিল তাই এইরূপ হইল। সন্তোষেরও এই রকম অপমৃত্যু হইল কিন্তু এমন স্থানে হইল যে অপমৃত্যুর দোষ হইল না সুন্দরভাবে শ্রদ্ধা শাস্তি হইয়া গেল”। তখন বেবী দিদি মহা আনন্দের সহিত বলিলেন “মা তোমার যে এত কৃপা তাহা ত আমি নিজেই বুঝিতেছি। আমি ত সকলকেই বলিতেছি পুত্রশোক কি কেহ এমন ভাবে হাসিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যেন আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে যাই কে যেন আমার শাস্ত করিয়া দেয়, টানিয়া রাখে। আমি ত মা স্বামীর শোকেও কত কাঁদিয়াছি কিন্তু খোকার শোক যেন আমার লাগিতেছে না ইহার কারণ আমি বেশ জানি তোমারই কৃপা কিন্তু আজ আরও ভাল করিয়া বুঝিলাম যে কেন আমি পুত্রের মৃত্যুতে এত স্থির থাকতে পারিয়াছি। আরও দেখ মা তোমার কথায় আমার এখন অনেক কথা মনে পড়িতেছে। খোকার মৃত্যুর কিছু পরেই আমি স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া পূজা করিতে গিয়া দুই তিন ঘণ্টা স্থির ভাবে পূজাদি করিয়া

আসিলাম । সকলে অবাক আমি নিজেও অবাক হইতেছি
 আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছি । কিন্তু ভিতরে তেমন অস্থিরতা
 অনুভবই করিতেছি না যেন শাস্তিভাব । মা, তুমি যাহাকে ঐ
 ভাবে কৃপা করিয়াছ, তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া যাহার জীবন
 গিয়াছে যাহার মৃত্যু সময়তে গিয়া তুমি দাঁড়াইয়াছ সে ত
 সাধারণ লোক ছিল না । আরও দেখ মা আশ্চর্য্য এইভাবে
 মৃত্যু হইল অথচ তাহা যেন কাহারও খেয়াল নাই শ্রদ্ধা শাস্তি
 বাঙ্গালী পণ্ডিতরা নিয়ম মতই করাইল কোন কথাই উঠিল না ।
 ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল ? আজ বুঝিতেছি তাহার যে
 অপমৃত্যুই হয় নাই তাই ওসব কথাই ওঠে নাই” । আমি
 বলিলাম “কোথায় কিভাবে যে মা কাহাকে কৃপা করিতেছেন
 কে বলিবে ? লোকে বলিতে পারে যে যাওয়া আসা করে
 তাহার উপর কৃপা হয় কিন্তু স্নকুমারত বিশেষ আসে নাই মাত্র
 চার দিন দেখা । কাহার কোন কর্ম্মফলে যে মা কে বাধিতেছে
 কে বলিবে ।

রাত্রিতে মা শুইয়া শুইয়া গান ধরিলেন

মন চল যাই রজকের ঘাটে

চৈতা ধোপা দিচ্ছে ভাটি, নিতাই গঞ্জের ঘাটে

(মন রে ওরে অবোধ মন)

পাঁচ রকমের সাজিমাটি, পরিপাটি ঘাটে,

ভাটি বেলায় ভাটি দিলে, ভাটির ফল কি ঘটে ?

বেদ চিঠি সব তেলের দাগে, মন বসনে রটে,

আড়ি করে বাড়ি দিলে, বসন যায় রে ফেটে
(মন চল যাই রজকের ঘাটে)

২৪শে ভাদ্র শনিবার :—

আজ সন্ধ্যায় পূর্বোক্ত পাঞ্জাবী শিখ সাধু দুইটি আরও তিনটি পাঞ্জাবী শিখ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছেন। মাকে পূর্বোক্ত একজন সাধু বলিতেছেন “আমরা তোমার কাছে আসল জিনিষ নিতে আসিয়াছি তুমি পূর্ণ হইয়া বসিয়া আছ”। মা বলিলেন “বাচ্চাকে এ রকম বলতে নাই”। তাহাদের একজনের হাতে একটি লোহার তীরের মত অস্ত্র। মাকে দেখিতে দিয়া বলিল “ইহা দ্বারা বাহিরের শরীর রক্ষা করা যায়। কারণ এই মানুষ শরীরই শুধু ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায় আজ যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম তাহাও শরীর আছে বলিয়াই ত। এখন তোমার নিকট জানিতেও ষড়রিপু নাশ করিবার অস্ত্র নিতে আসিয়াছি”। মা বলিলেন “তোমাদের কাছে ত পিতাজী সে অস্ত্র আছে তাইত এই মূর্তিতে দেখা দিতে আসিয়াছ।” এই সব কথা বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। সাধুটি বলিলেন “মা, তুমিই একমাত্র আলোক, আমরা সব পতঙ্গ, তাই আজ তোমার কাছে আসিয়াছি। আলো ত পতঙ্গের কাছে যায় না। পতঙ্গই আলোকের কাছে আসে, আর দেখ অগ্নি ত সর্বত্রই আছে কিন্তু চুলার ভিতরে আগুনের বিশেষ প্রকাশ তাই সেই আগুনে কত কাজ হয়। তেমন আমাদের নিকটই সব আছে বলিতেছ কিন্তু তোমার

মধ্যেই তাঁর প্রকাশ তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার মধ্যে যে পূর্ণ আনন্দ তাহা আমাদের দেও। তুমি আনন্দে ভরিয়া আছ তাই আমরা এত লোক তোমার কাছে আসিয়া আনন্দ পাই শান্তি পাই”। ইত্যাদি ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন মা হাসিয়া বলিলেন “পিতাজী, তুমি যদি সেই আনন্দের খবর কিছুই না জান তবে তাহার সন্ধান করিতেছ কেন? নিশ্চয়ই তোমর ভিতর তাহা আছে”। এই বলিয়া মা চুপ করিলেন কিন্তু তাহাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মা বলিতে লাগিলেন “দেখ এক লক্ষ্যই হইল উপায়। সেই এককে পাইতে হইলে এক লক্ষ্যই হইল উপায়। আর দেখ পিতাজী, আমরা এক এক গ্রাস করিয়া খাই, এক পা এক পা করিয়া হাটি, এক রাস্তা খরিয়া চলি, এক অক্ষর এক অক্ষর করিয়া লিখি, কাজেই এক নিয়্যাই ত আমরা আছি। আবার আমাদের ভিতরই অব্যক্ত অনন্ত সব রহিয়াছে” এই বলিয়া পূর্বোক্তরূপে তাহাদের বলিলেন। তাহারা খুব খুসী হইলেন। আরও কিছু সময় কথাবার্তা হইল। উপস্থিত সকলেই খুব আনন্দ পাইলেন। তারপর মা বলিলেন “পিতাজী, তোমাদের মুখে একটু ভজন শুনিব”। তাহারাও মার মুখের গান শুনিতে চাহিলে মা দুই একটি বাংলা গান করিয়া হিন্দিতে বুঝাইয়া দিলেন। পরে কমলাকান্ত প্রভৃতি কীর্তন করিলে শিখ সাধুরা একটু ভজন করিয়া মাকে শুনাইলেন। বেশ আনন্দ হইল। কয়েক দিন পূর্বে একটি লামা আসিয়াও মাকে ভজন শুনাইয়া গিয়াছেন। এই

রকম আনন্দ চলিতেছে, মা শিখ সাধুদের বলিলেন তোমরা কতআনন্দ দিলে কৃপা করিয়া দর্শন দিতে আসিয়াছ”। তাহারা বলিলেন “আমরা আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে বিদায় নিলেন।

আজ আরও কয়েকটি কথা হইল প্রথম ভাগে যে ৬জ্যোতিষ দাদার শাহবাগে মাছ পাঠাইয়া দেওয়ার কথা লিখা হইয়াছে মা পূর্বেই মসল্লা তৈয়ার করিয়া রাখিয়া ছিলেন সেই ঘটনার একটা বিশেষ কথা লিখা হয় নাই, কথাটি এই ৬জ্যোতিষ দাদার বাসায় সেদিন কে মাছ দিয়া গেল তাহা কেহই জানে না একটি লোক মাছটি দিয়া বলিয়া গিয়াছিল আবার আসিব কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার আর কোন খবর নাই আর সে আসেও নাই। প্রথম ভাগে আর অশ্বখের ভিতর রমনার বাসায় ৬জ্যোতিষ দাদা যে মার আদেশে স্নান করিয়াছিলেন সে বিষয় একটু কথার গোলমাল হইয়াছে “মাতৃ দর্শনে” সেই ঘটনাটি ঠিকভাবে লিখা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে ২৮২ পৃষ্ঠায় মায়ের অশ্বখের কথা যে লিখা হইয়াছে তাহার ভিতর আরও একটু রহস্য আছে। কথা এই—একদিন সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের সঙ্গে সমবয়সীর মত হাসি তামাসায় মা বলিয়া উঠিলেন “আমার জ্বর হইবে নাকি? আমার জ্বর হইয়াছে। “তাহারা হঠাৎ মার মুখে এই ভাবের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ছোট মেয়ে ছানা বলিল “দেখি

কেমন তোমার জ্বর হইয়াছে”? এই বলিয়া থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখে সত্যিই একটু জ্বর হইয়াছে। মা তখন দিদিমাকে বলিলেন “আমাকে শিগ্গির জ্বরের ঔষধ দেও, না হইলে কিন্তু জ্বর বাড়িয়া যাইবে। “ঔষধ কি জান? ডাক্তার-বাবু ভোলানাথকে যে দুই শিশিতে ঔষধ দিয়াছেন তাহার এক শিশিতে যাহা আছে সেই ঔষধ আমায় দাও”। মার খেয়াল হইতেছিল এক শিশিতে শুধু জল তাই ঐ কথা বলিলেন। পরে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তারও স্বীকার করিলেন মা যাহা মনে করিয়াছেন ঠিকই। যাক মা দিদিমাকে বলিলেন “আমাকে শিগ্গির জল দাও না হইলে অসুখ বাড়িবে কিন্তু”। এমন ছেলে মানুষী আরম্ভ করিলেন যে দিদিমা বাধ্য হইয়া জল নিয়া মাকে একটু খাওয়া সরাইয়া নিয়া বলিলেন “আর না কত জল খাবি”? মা অমনি হাসিয়া বলিলেন “এতটুকু দিলে নাকি? বুঝলে ত? অসুখটা কিছুদিন ভাল ভাবে থাকবে”। মার জ্বর ভাবও ছিলনা হঠাৎ খেলায় খেলায় জ্বর জ্বর বলিলেন অমনি জ্বরও হইল। পরদিন হইতে জ্বর বাড়িতে লাগিল।

২৬শে ভাদ্র সোমবার :—

আজ মার আদেশে তিনটার সময় আমরা দেৱাচন নামিয়া আসিলাম। পূর্ণিমার কীর্তনের দিন, ওখানকার মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ মুখার্জীর সহিত আমাদের পরিচয় হইল। ইহার ২৩ বৎসর বয়স, কুমারী।

সঙ্গে তাঁহার ছাত্রী আরও চার পাঁচটি ছিল। বেশ মেয়েটি। আজ আসিবার সময় তিনি মেয়েদের নিয়া মাকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া গেলেন।

আসিয়া দেখি দাসজীকে (গোনার নাম হইয়াছে) নিয়া তাঁহার মা আসিয়াছেন। খবর পাইয়া হরিরাম হংস প্রভৃতি তিন চার জন মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আজও সারারাত্রি মার শুইবার ভাবই নাই।

২৭শে ভাদ্র, মঙ্গলবার :—

আজ মা প্রায় বেলা ১১টায় উঠিলেন। বেলা প্রায় ১২টায় ভোগ হইল। আজ কথায় কথায় ১৩৩৬ সনের মার অম্মুখের কথা উঠিয়াছে। শরীর যখন অবশ হইয়া গিয়াছিল তখন এক দিন শনিবারের কীৰ্ত্তনে মার হঠাৎ বারান্দায় যাওয়া, বারান্দায় যাইয়াই বসিয়া পড়িলেন। একথায় মা বলিলেন “সে যাওয়া কি রকম জানিস্ না? যেমন বাতাসে কাগজ কিংবা শুকনা পাতা উড়াইয়া নিয়া যায়।”

অদ্ভুত অদ্ভুত সব অবস্থা মার শরীরে দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। যখন বেশী রকম ছাড়া ছাড়া ভাবটা দেখা যায় তখন এমনই ছাড়া ভাব যে গায়ের পায়ের লোম কি মাথার চুল পর্য্যন্ত ঝুরঝুর করিয়া যেন ঝড়িয়া পড়ে গায়ের লোম টান দিয়া দেখাইয়াছেন আশ্বে উঠিয়া আসে যেন আলাগা লাগান। একবার বসিয়া আছেন পায়ের লোমগুলি এমন ভাবে কাপড়ে আসিয়া লাগিয়াছে যেন ক্ষুর দিয়া চাহিয়া কাপড়ে লাগাইয়া

দেওয়া হইয়াছে। মাথার চুলও এমন ভাবে হাতের ভিতর উঠিয়া আসিয়াছে বেন কেহ কাটিয়া রাখিয়াছে বিশেষ বিশেষ এক একটা অবস্থার পর এইরূপ দেখা যায়। আরও একটা অবস্থা দেখা গিয়াছে। রমনার আশ্রমে মার মাথার চুলগুলি যখন ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন কোন কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থার পর মাথার চুল গুলি কদম ফুলের মত খাড়া হইয়া যাইত। দিদিমা তাহা দেখিয়া ভয় পাইতেন কারণ শুনা যায় মাথায় চুল এই ভাবে খাড়া হইয়া উঠিলে সে বেশী দিন বাঁচেনা। দিদিমা হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ চুলগুলি নামাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু নামাইতে পারিতেন না। পরে ধীরে ধীরে আবার আপনা আপনিই নামিয়া যাইত। বড় চুল যখন ছিল তখনও চুলের গোড়াগুলি ঐরূপ ভাবে খাড়া হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া থাকিত। এই রকম কতনা অবস্থা গিয়াছে।

ত্রিভেণ্ডামের কথা উঠিয়াছে। সেখানে গিয়া মা কত মূর্তি দেখিলেন কিন্তু দৃষ্টি পড়িল দোলনায় ৩নারায়ণ বটপত্রে শুইয়া আছেন সৃষ্টির প্রারম্ভের এই মূর্তি। মা সেই মূর্তির বিছানা পত্র বদলাইয়া দিয়া আসিলেন। সেই কথা উঠিল মাকে আমি হাসিয়া বলিলাম “মা তোমার বুঝি আদিটাতেই বেশী দৃষ্টি পড়ে?” মা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন “যাহা হইয়া যায় আমি ত তোদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না।”

তারপর কথা উঠিল বাজিতপুর যেদিন নিশিবাবু জ্ঞানকীবাবুর

সহিত কথায় মার নিজ মুখ হইতে নিজের পরিচয় বাহির হয় সেইদিনের কথা। মা হাসিয়া বলিতেছেন “যখন জানকীবাবু বলিলেন সয়তান না কি, জানি এই ভাবেরই বলিল তখন বলা হইল ‘আচ্ছা তোমরা পরীক্ষা করিতেছ বুঝি? তা তোমরা যাই বল যাহা আসল সত্যি কথা তাই বলা হইল’।”

মা কথায় কথায় বলিলেন “বাউল বাবুই প্রথম এই শরীরটার পায় ফুল, বেলপাতা এবং গলায় ফুলের মালা দিতেই শরীরটা পড়িয়া যায়। পরে দেখা গেল ফুলই দেও, জলই দেও বা মাটি কাদাই দেও আর ময়লাই দেও সব সমই এক ভাবে স্থিত।” আজ এই সব নানা কথার আলোচনা হইল।

আজ শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখার্জি (এলাহাবাদে থাকেন) কোনও কার্যোপলক্ষ্যে দুই তিন দিনের জন্য দেৱাছন আসিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া হোটেলে আছেন। মার সঙ্গে রোজই দেখা করিতে আসেন। আজও আসিয়াছেন ইনি। “মনস্থির হয় না” ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিতেছেন, কথায় কথায় মা বলিতেছেন যদিও মস্তক হইল মূল স্থান তবুও সুখ দুঃখ অনুভব হয় হৃদয়ে। তাই স্বাসের গতি হৃদয় হইতে ক্রমশঃ পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখিয়া সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলে কাজ হয় এক সময়তে ত সে বসিবেই হৃদয়েই বসুক কি ক্রমশঃই বসুক যেমন জল ত গাছের গোড়ায় মাটির উপরিভাগেই দেওয়া হয় কিন্তু যায় মূলে তার মূলে গেলেই সমস্ত বৃক্ষটিই

তাহাতে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে, পত্র পুষ্পে ভরিয়া ওঠে। তেমনই মন হৃদয়ে বসিলেই ভ্রমধ্যে যাইবে, আবার ভ্রমধ্যে গেলেই সহস্রারে যাইবে। এই তাহার স্বাভাবিক গতি। মন স্থির করাই হইল উদ্দেশ্য। দেহের মধ্যেই প্রথম নিবন্ধ রাখিতে চেষ্টা কর। আবার দেখ যেমন প্রাণবায়ুর স্পন্দন হইতেছে যদিও বলা হয় প্রকৃতিজাত চঞ্চল গতি তবুও এই চঞ্চল গতির ভিতর দিয়াই রাস্তা করিয়া, সেই চঞ্চল অচঞ্চলের প্রশ্নই যেখানে ওঠেনা সেই তত্ত্বের সন্ধানে স্থিত হইতে হইবে। আরও দেখ এই জগতে যত কিছু সবই এক প্রাণ বায়ুর খেলা নিজের প্রাণবায়ু যদি সেই ধারায় মিলাইতে পার তা হইলেই পড়বে ঐ যে সে ধরা।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। “সে কে? না, ঐ যে সেই এক” এই বলিয়া তর্জ্জনী উঠাইয়া বলিলেন “সেই এক।”

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ১০টার সকলে বিদায় নিলেন। মা রাত্রিতে আমাদের নিয়া বারান্দায় শয়ন করিলেন।
২৮শে ভাদ্র, বুধবার :—

আজ খাওয়া দাওয়ার পরই মায়ের পেটে হজমের জন্ম একটা বেদনা হইয়াছে এর মধ্যেই বেলা ১২টার বলিলেন “আজই হরিদ্বার যাইব।” মার সঙ্গে আমি রুমাদেবী ও সাধন ব্রহ্মচারী চলিলাম। মা বলিলেন “যদি শরীর ভাল থাকে আমি ঘুরিয়া আসিব নতুবা তোমাদের খবর দিব তোমরা যাইও।”

চারটায় রওনা হইয়া ৬টায় হরিদ্বার পৌঁছিয়া নানকী বাইয়ের ধর্মশালায় যাইতে বলিলেন। ধর্মশালায় পৌঁছিয়া দেখি নানকীবাই কালই হৃষিকেশ হইতে আসিয়া আজই তথায় চলিয়া যাইবার কথা কিন্তু মাকে দেখিয়া তিনি হৃষিকেশ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। মা তাঁহার ধর্মশালায় নিজ হইতে গিয়াছেন ইহাতে তিনি কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার সঙ্গীয় স্ত্রীলোক একটি বলিলেন “আজই আমি দুপুরে মার কথা ভাবিতেছিলাম।” ডাক্তার পার্টকে খবর দিতে যাইতেই ধর্মশালার দরজায় তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল তিনিও আগামী কল্য নিজবাড়ী ভীমতাল রওনা হইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন তিনি মাকে পীত কুটীতে নিয়া যাইতে চাহিলেন। মার পেটে বেদনা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। পীত কুটী ২ মাসের জন্য মেয়েদের স্কুল বন্ধ হইয়াছে কাজেই খালি পড়িয়া আছে। মা বলিলেন “আজ এখানেই থাকিব কাল দেখা যাইবে।” রাস্তায় আসিতে আসিতে ট্রেণে পেটে ব্যথা তখন কি কমিয়াছে। মা আমাকে বলিতেছেন “এই যে ব্যথা হইয়াছে কাল রাত্রিতে দেখিতেছিলাম ইহার বিকট মূর্তি অর্থাৎ পূর্ণরূপ।” আমি ত চমকিয়া উঠিলাম। হরিদ্বার আসিয়াই বেদনা বাড়িয়া উঠিল। আজ রাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

২০শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার :—

আজ বেদনা আরও বাড়িয়াছে মা বলিতেছেন “বোধ হয়

ভিতরের যন্ত্রেই কিছু হইয়াছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়াও সেইরূপই অনুমান করিলেন। ভিতরে কোথায় কি হইতেছে মা সব বলিয়া দিতেছেন। ডাক্তারের মতের সঙ্গেও মিলিতেছে। ভিতরে কোড়া পাকিলে যেমন হয় সেরূপ বেদনার কথা বলিতে শ্বাস ফেলিতে পর্য্যন্ত চোট লাগে। ডাক্তার নড়াচড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। দেয়াহন যাইতেও নিষেধ করিলেন। মা এই দুই দিনেই শয্যাগতা। অতি সামান্য জলীয় জিনিষ পথ্য দেওয়া হইতেছে। পেটে ফুলাও দেখা যায়। অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বলিতেছেন “এই অবস্থা আর কাহারও হইলে মহা মুকিল হইত।” শ্বাস অতি বৃহৎ মা বলিতেছেন “এইরূপ শ্বাস অপরের পক্ষে বড়ই সাংঘাতিক হইত এই শরীরটার অভ্যাস আছে তাই চলিতেছে।

বৈকালেই ডাক্তার পাণ্ট মাকে পীতকুঠীতে নিয়া আসিলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামী, কমলাকান্ত ও সদানন্দকে আসিতে লিখিয়া দেওয়া হইল। আজও রাত্রিতে ভয়ানক বেদনা চলিতেছে।

৩০শে ভাদ্র, শুক্রবার :—

আজও মার অবস্থা এক রকমই খবর পাইয়া হরিরাম আসিয়াছে। স্বামিজী প্রভৃতিও সকলে আসিয়াছেন। মার কাছে আমি বসিয়া আছি, মা বলিতেছেন “কাল রাত্রিতে দেখিতেছিলাম একটি মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী এই শরীরটা উপলক্ষ করিয়া বলিতেছে ‘আমি মুক্তি প্রার্থনা করি।’ কি সে

আওয়াজ এখনও কাণে বাজিতেছে।” এই বলিয়াই আবার দুটামী করিয়া হাসিয়া বলেতেছেন “এ সব কি, তোমরা মাথার বিকার বোঝ না কি? আমিও হাসিয়া বলিলাম “মাথা ত তোমার বিকারেই ভরা।”

আজ কথায় কথায় মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন ‘শৌন খুকুনী! দেৱাছন একজন ভদ্রলোক নানা ভাল ভাল আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ আমাকে বলিতেছে’ আচ্ছা দেখুন, একজন মাননীয় সাধুর সঙ্গে আমার আলোচনা হইতে হইতে আপনার আলোচনা হইতেই দেখিলাম আপনার প্রতি তাহার ঈর্ষার ও উপেক্ষার ইঙ্গিতে পাইলাম। তবে আপনার আলোচনায় তাহার উপকার না করিয়া ত অপকারই করিলেন। তাহাকে বলা হইল ‘এই শরীরটা দিয়া ত দেখতে পাও সাধারণ ভাবে কাহারও সেবা ক্রিয়া কিছু হইতেছে না। সাধুর যদি হিংসা চ্ছেলে ও এই শরীরটার বিষয় ভাবিয়া নিজে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে তবে ত বলিব সাধু কৃপা করিয়া এই শরীরটাকে তাঁহার সেবায় লাগাইয়া নিলেন। সে ত মহা আনন্দের কথা।

মা যাহা বলিয়াছেন তাই হইয়া দাঁড়াইল ষ্টমাকে (Stomach) ফোঁড়া হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশঙ্কা করেন। উপরেও বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। মা বেদনার পূর্ণ রূপ দেখিয়াছিলেন আবার দেৱাছন বলিয়া আসিয়াছেন আমি যদি অমুস্থ হইয়া পড়ি তোমাদের যাইতে লেখা হইবে

তোমরা যাইও। তাহাই হইল, মার ত সবই ঠিক আছে। মার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই ভয়ানক একটা আতঙ্ক হইয়াছে।

আজ কথায় কথায় কথা উঠিয়াছিল মার মধ্যে ত কত ভাবের খেলাই দেখিতেছি। কখনও কখনও অটু অটু হাসি আবার কখনও ভয়ানক একটা কান্না, আবার দেখিতেছি এমন একটা গম্ভীর ভাব যে আমাদেরও কথা বলিতে ভয় হয়। আবার কখনও দেখিতেছি একেবারে ছেলে মানুষের মত ভাব। কথা বলিবার ভঙ্গি, অঙ্গের হাব ভাব, সবই ছেলে মানুষের মত। আবার দেখিতেছি একটা ভয়ানক বেগরোয়া ভাব ; বিশাল মহান-উদাসী কি একটা ভাবে যেন অবস্থিত ; পৃথিবীর কেহই কিছুতেই যেন সে ভাব হইতে টলাইতে পারিবে না। আবার দেখিতেছি কোন সময় বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী মার মুর্তিতে তীব্র দৃষ্টি সহ একটা ভাব খেলিয়া গেল ; আবার তৎ মুহূর্তেই যে শান্ত সেই শান্ত ভাব। এক সময় দেখিতেছি বজ্রাদপি কঠোর, আবার দেখিতেছি কুসুম হইতে কোমল, করুণাময়ী জগজ্জননী মুর্তিতে মা আমার কতই না স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন। জগতে সে স্নেহ অতুলনীয়। মা এই সব ভাবের কথায় বলেন, “তোদের যখন যা দরকার সেই ভাবেরই প্রকাশটা করাইয়া নিস্”। কেউ কেউ হয়ত ঝগড়া করিতেছেন, মা আনন্দে হাত তালি দিয়া বলিতেছেন “শোন, শোন, শব্দ ত্র্যক্ষের কীর্তন হইতেছে”। কোন কোন সময় এই

কথা শুনিয়া ও মার ভাব দেখিয়া হস্ত তুমুল ঝগড়া একেবারে থামিয়া গেল। তবে এটা ঠিকই অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই সব ভাবের ভিতরও মার যে একটি স্থির ধীর শান্ত ভাব তাহা এই সব ভাবের ভিতরও সব সময়েই একই রকম আছে, সে ভাবের কোন রকম পরিবর্তন নাই।

৩১শে ভাদ্র শনিবার

আজ মার পেটের বেদনাটা কিছু কম। কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে। ডাক্তার পান্থ বলিতেছেন, “আমি অনেক রোগী দেখিয়াছি কিন্তু রোগী হিসাবেও মা আদর্শ রোগী”। এমন কঠিন কঠিন ব্যারামেও এমন হাসিমুখ আর দেখেন নাই। মাকে ডাক্তার বলিতেছেন, “মা এই ব্যারামের পূর্ণ মূর্তি বড় বিকট, আপনি ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে শীঘ্র ইহাকে (রোগকে) সরাইয়া দিন। মা যখন আবার ডাক্তারের কথামত চলেন তখন এমন কথামত চলেন যে একটু এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। গতবার ডাক্তার মাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন, মা এমন চুপ করিলেন যে ডাক্তার আসিয়াও কথা পান না। সবটাই নিখুঁত রূপে হইয়া যায়।

রাত্রি প্রায় ৯টা ডাক্তার পান্থ, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, সাধন, কমলা ও আমি মার ঘরে মার কাছে বসিয়া আছি। ডাক্তার পান্থের সঙ্গে মা কথা বলিতেছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, “এই শরীরটা, ছোটবেলা বাপ মা পালন করিত তারপর

কয়েকটা বছর যোগক্রিয়াদিগুলি এই শরীরটার ভিতর হইয়া গিয়াছে। তখন আর বাহিরের আহালাদ প্রয়োজন হয় নাই। যাহা যাহা শরীর রক্ষার জন্য আহারের সঙ্গে নেওয়া হয়, তাহার সব জিনিষই এইসব পঞ্চভূতে মিশিয়া ত আছে, এ আহারের সঙ্গে তাহা নেওয়ার দরকার হয় নাই। যোগ ক্রিয়াদি যে হইত তাহা দ্বারাই ঐ সব জিনিষ গ্রহণ করিয়া শরীর রক্ষা হইত। ইহার মধ্যে আরও অনেক দিকের কথা আছে। কাজেই আহাৰ নাই তোমাদের দৃষ্টিতে, নিদ্রার ত প্রশ্নই নাই ; কিন্তু শরীর বেশ ছিল। ইহারা (আমাদের দেখাইয়া) দেখিয়াছে তখন শরীর জল, মাটি, কাদায় পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু কোন-রূপ অসুখ ছিল না”। ডাক্তার এ কথা স্বীকার করিলেন। আবার মা বলিতেছেন, “এখন আবার শিশুকালের মত শরীর তোমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি তোমরা রাখিতে পারিলে থাকিবে না হয় যাইবে”। এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তার পর দিন মা সারাদিন চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। আমাদের আহাৰ ইত্যাদি ত্যাগ হইয়া কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৮৯ টার সময় হঠাৎ দেখা গেল মার হাতে পায়ে যেন কি রকম ক্রিয়া হইতেছে ব্যস্ত হইয়া দেখিতেছি। ডাক্তার পান্থও বিশেষ ভাবে দেখিতেছেন। আসন হইতেছে সমস্ত শরীর যেন মোচড়াইয়া ফেলিতেছেন। হাত পা, মাথা সর্ব অঙ্গে অদ্ভুত ক্রিয়া হইতে লাগিল, কিছু পরে একটু একটু হাসি হাসি ভাবে বলিতেছেন “কি ভামাসা, শরীরটা কেমন

হইয়া যাইতেছে ভিতরটাও ঠিক এইভাবে মুচড়াইয়া যাইতেছে”। ডাক্তারের দিকে চাহিয়া য়হ য়হ হাসিয়া পরিষ্কারভাবে বলিতেছেন, “কি কেন এমন হইতেছে”? ডাক্তার বলিতেছেন, “কি জানি, আমি ত এসব কিছুই বুঝি না আপনিই জানেন এসব কি হইতেছে দেখ। ডাক্তার মাকে ভাল-বাসেন সত্য কিন্তু অন্ধবিশ্বাস তাঁহার নাই। তিনি এসব বিষয় বিশেষ কিছু দেখেনও নাই এসব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণাও নাই। বিলাতকেরং লোক, সহজে এসব বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু তিনি আজ দেখিয়া অবাক হইয়া বলিতেছেন “একটু পূর্বেই যিনি কথা বলিতে, একটু নড়িতে পর্য্যন্ত ভিতরে চোট পাইতেছিলেন, শ্বাস পর্য্যন্ত ভাল করিয়া নিতে পারিতেছিলেন না, কাত হইয়া শুইতে পারেন নাই এখন তিনি এইভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস নিতেছেন সমস্ত শরীর ওলট পালট হইতেছে অথচ পেটের যন্ত্রনা এখন কিছুই টের পাইতেছেন না। কি করিয়া এ রকম সম্ভব হয়”। শরীরের প্রতি অঙ্গ এমনভাবে উলটাইয়া যাইতেছে যে ডাক্তার অবাক হইতেছেন মা বলিতেছেন “পেটের ভিতর যে এতদিন যাবৎ একটা ভয়ানক যন্ত্রনা চলিতেছে এখন তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল হইতেছে না”। এই প্রকার প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিল। তারপর আমরা হাত ধরিয়া আঙ্গুলগুলি টানিয়া দিতেছি কিন্তু মা হাসিয়া বলিতেছেন “কিছুই জোর নাই আমি ত টেরও পাইতেছি না”। এই বলিয়া এমন অট্ট অট্ট হাসি, মুখে একটা

উজ্জ্বল জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। ডাক্তার সাহেব তাহা দেখিয়া বলিতেছেন “মা আমার মনে হয় আজ হইতেই তোমার সব ব্যারাম চলিয়া গেল। এমন সুন্দর উজ্জ্বল মূর্তি রোগীর হইতে পারে না তোমার যেন এই রূপই সর্বদা থাকে”। বাস্তবিকই গাল দুখানি, চোখ যেন ঝকঝক করিতেছে। মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন “দেখ এই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে বা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণবায়ু বাহিরও হইয়া যাইতে পারে আবার আরামও হইয়া যাইতে পারে। সবই হইতে পারে”। ডাক্তার হাত খোঁড় করিয়া বলিলেন “না, মা, এমন কথা বলিবেন না”। মা বলিলেন “এই শরীরটার সব গ্রন্থি গুলিই ধোলা তাই এইরূপ ক্রিয়া হইতে পারে”।

ডাক্তার বলিতেছেন “মা আজই আমি হরিরামের সঙ্গে তর্ক করিয়াছি। হরিরাম বলিতেছে ‘মা ইচ্ছা করিলেই ব্যারাম সারাইতে পারেন’ আর আমি বলিয়াছি ‘না গতবার আমার ঔষধেই জ্বর ছাড়িয়াছে। সেবারও আমার দুই চার দিন ঔষধ দেবার পর যেদিন ঔষধ দেওয়া শেষ হইল সেদিন আপনার শরীরে এইরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া হইয়া গেল তারপর হইতেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। আমি মনে করিলাম আমার প্রদত্ত ঔষধেই জ্বর ছাড়িয়াছে। কিন্তু আজ এইভাবে এই রকম রোগ যদি ছাড়িয়া যায় আমি নিশ্চয়ই বুঝিব আমার ঔষধে কিছুই হয় নাই আপনার ইচ্ছায় সব হইতেছে। আমার মনে হইতেছে পরশু একেবারে এই রোগের চিহ্নও থাকিবে না”।

মা অমনি হাসিয়া বলিলেন “তাই নাকি ? বেশ দেখা যাইবে, তুমিত শিশু বয়সেই বিপত্রীক তারপর হইতেই এই ভাবে আছ, ব্রাহ্মণ মানুষ, গঙ্গার উপরে বসিয়া আছ। দেখি তোমার কথা কেমন সত্য হয়। যদি রোগ না থাকে আমি বলিব পিতাজীর কথায় রোগ চলিয়া গিয়াছে। কি বল ?” ডাক্তারসাহেব বিনীতভাবে বলিলেন “না, মা এ কথা বলিবেন না”। এইভাবে রাত্রি প্রায় ১১টা, মার খুব চটপটে ভাব, কথাও সেই রকমই বলিতেছেন “দেখ ভিতরে এখনও ঐ ভাব ফ্রিয়া করিতেছে তাই এই রকম কথাবার্তা হইয়া যাইতেছে”।

মা অতি সাবধানে পেটে চাপ দিয়া পায়খানায় যাইতেন। হাঁটিতে পারিতেনই না একটু নড়াচড়া করিলেই ভয়ানক চোট লাগিত। আজ এই সব অবস্থার পর রাত্রি প্রায় ১২টায় মা বাহিরে যাইবেন, বেশ স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়া গেলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম “দেখি রোগী এখন কি ভাবে চলে” ? মা হাসিয়া বলিলেন “না, না, তোমরা এসব বলিও না। কথা হইল এই এখনও ভিতরে ঐ ভাবটাই চলিতেছে কি না তাই ভিতরে যে কি রোগ আছে সে দিকে খেয়াল নাই তাই হাঁটা চলা ঐ ভাবেই হইতেছে”।

আজ শুইবার ভাবই নাই। সকলে প্রণাম করিয়া শুইতে চলিয়া গেল আমি মার কাছেই শুই। মার ঘরের আলো নিবাইয়া দিলাম। কিন্তু শুইবার ভাব নাই বলিয়া

দুই চারিটা কথাও বলিতেছেন। এ কয়দিন মার চেহারা খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে তবুও ডাক্তার বলেন “যে রোগ তাহাতে মুখের চেহারা অনেক হইলে ভয়ানক খারাপ হইয়া যাইত। মার ত একবার বেশ ভাল আবার ভয়ানক খারাপ এই দেখিতেছি। এখন আর রোগের কোনরূপ লক্ষণই চেহারায় প্রকাশ নাই”। আমি একখানা ছোট আয়না মার হাতে দিয়া বলিলাম “মা, তুমি দেখ কি সুন্দর উজ্জ্বল মূর্তি হইয়াছে। চোখ দুইটাতেই ত তুমি সকলের সর্বনাশ করিতেছ”। আলো জ্বলাইয়া দিলাম। মাও ছেলেমানুষের মত বসিয়া আয়না দিয়া নিজের চেহারা দেখিতেছেন, হাসিয়া বলিলেন, “তাই ত রোগের চেহারা ত নাই”। আবার বলিতেছেন “কই তোমরা যে বল চোখে কি আছে, আমি ত দেখি না”। এই বলিয়া আয়নাখানা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছেন আর মুহু মুহু হাসিতেছেন, আমি আবার বলিলাম “ঐ চোখেই ত তুমি সর্বনাশ করিতেছ”। মা হাসিয়া বলিলেন, “সর্ব—নাশ করিতেছি কই? তোমাদের যদি সর্ব-নাশ হইত তবে ত অতি মঙ্গলের কথা”। এই সব কথাবার্তায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল। আমি আলো নিবাইয়া দিলাম। মাও চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

১লা আশ্বিন রবিবার :—

আজ বেলা প্রায় নয়টায় মা উঠিলেন। ডাক্তার পান্স, স্বামিজী সকলে একত্র হইয়া মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“মা কেমন আছ ?” মা বলিলেন, “বেশ আছি”। আশ্চর্য্যের বিষয় সমস্ত শরীর, মাথার চুল পর্য্যন্ত এত উজ্জ্বল যেন, কেহ তেল মাখিয়া রাখিয়াছে। ডাক্তার সাহেব হাত যোড় করিয়া বলিলেন, “মা, আমি একটি অতি সত্যি ঘটনা বলিতেছি—আমি এ সব বিশ্বাস করি নাই কালও এ বিষয়ে কত তর্ক করিয়াছি কিন্তু আজ আমার অভিমান অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। কাল রাত্রিতে মার এই সব ক্রিয়া হওয়ার পর আমি যখন শুইবার জন্ত ছাতে গিয়াছি তখন পরিষ্কার দেখিতেছি মার ঘর হইতে একটা অতি কালো কুন্ডা, কুন্ডা ঠিকনয়, বানরের মত একটা বাহির হইয়া গঙ্গায় ঝাপাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম আমার কি ভ্রম হইল কিন্তু শেষে ভাল করিয়া দেখিলাম আমার ভ্রম নয় ঠিকই দেখিতেছি। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মা যে বলেন রোগের মূর্ত্তি আছে আমার মনে হইল ঠিক এ তাই। আর মার রোগ থাকিতেই পারে না, রোগ ত গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। এই সব দেখিয়া ও এই ভয়ঙ্কর রোগে মার, কাল যে শরীরে ক্রিয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছি। ম্যালেরিয়া ইত্যাদি, ত বেশী কথা নয় কিন্তু এ’ষে ভয়ঙ্কর ব্যারাম হইয়াছিল। কি করিয়া সেই অবস্থা এই ভাবে পরিবর্তন হইল ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি”।

মা বেশ আছেন কথা বার্তা বলিতেছেন আনন্দ করিতেছেন। মার অন্ত্রখের খবর পাইয়া এলাহাবাদ হইতে শিব প্রসাদ বাবু আসিয়া উপস্থিত। দেৱাভূন হইতে লছমী এবং দাসজী

(গোলা) ও তাহার মা, বহিন সব আসিয়াছে। হরিরামও আসিয়াছে। আসিয়া দেখে মা বেশ ভাল আছেন। ডাক্তার সাহেব সকলের কাছে সব ঘটনা বলিলেন। বলিলেন “অবস্থা যাহা হইয়াছিল অণু কেহ হইলে কি হইত বলা যায় না। আমার যাহা যাহা ধারণা ছিল মার কুপায় আজ বুঝিয়াছি সে সব ভুল।

কাল ঐ অবস্থার সময় মা খুব চটপট ভাবে কয়েকটি কথা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসার ভাবে বলিয়াছিলেন সেই কথা উঠিল। মা বলিলেন, “দেখ, তোদের ভাবেই শরীরটাকে চালাইতেহিস্ শরীরের যে রকম অবস্থা হইতেছিল তাহাতে ডাক্তারের মনে হইতে পারিত, হিষ্টিরিয়া তাই ঐ ভাবে জিজ্ঞাসা হইতেছিল এই জিজ্ঞাসায় তাহার সেই ভুল ধারণা নষ্ট হইয়া গিয়াছে”। আজ আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা নাই।

২রা আশ্বিন সোমবার :—

আজ কথায় কথায় দুপুরে মা বলিতেছেন, “দেখ, শোনা যায় মুনি-ঋষিরা ধ্যানে বসিয়া সব বিষয় জানিতে পারিতেন। তোদের আমি শাহবাগেও বলেছি, এখনও বলিতেছি এই শরীরটার কি রকম জানিস্? ধ্যান, অধ্যান কিছু বলি না এক ছাড়া কিছু থাকিলে ত? আল্গা কিছু থাকিলে ত? ধ্যানে বা মুখ ঘুরাইয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া দেখিতে হয়।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম কাহাকে নিয়া আমরা খেলা করিতেছি।

আজ ভোলানাথের দেহত্যাগের দিনের কথা উঠিয়াছে, একটার পর একটা কি সুন্দর ভাবে হইয়া গিয়াছে তাই শুনিতেছিলাম মা বলিতেছিলেন। বেলা প্রায় ৩টা আমি মার ঘরে বসিয়া আছি আর কেহ ঘরে নাই। মা বলিতেছেন “সন্ধ্যার সময় আমি ঘরে গিয়া ধূপ জ্বালাইয়া দিতে বলিলাম এবং গঙ্গাজলের ছিটা সব ঘরে ছিটাইয়া দেওয়া হইল উপস্থিত সকলের গায়ই গঙ্গাজল দেওয়া হইল। তারপর আমি গিয়া বসিলাম। একদিন একটু জলের ছিটা গায় লাগাতেই ভোলানাথ বলিয়াছিল “কি গঙ্গাজল নাকি” ? তারপর গঙ্গাজল দেওয়া হইত। আজও দেওয়া হইল। আমি বসিয়া একটু গ্লুকোজ (glucose) দিতে বলিলাম। যাহারা ঘরে ছিল কেহ কেহ গ্লুকোজ তৈয়ারি করিতে বাহিরে গেল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম “দেখ, তোমার সন্ধ্যাস মন্ত্র মনে আছে” ? বলিল “আছে”। “দিনে আমাকে ধরিতে চাহিয়াছিল। এই ধরাটার যেন সন্তানের মাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা। এখন আমিই বলিলাম এই যে আমার হাত, ধরিবে ? এই বলিতেই হাত বাড়াইয়া আমার হাত ধরিল কিন্তু হাত কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। তখন বলিল। ‘আমি যাই’ আমি অমনি বলিলাম, ‘একি বলিতেছ, যাওয়া আসা কি আছে’ ? তখন বলিল, ‘তুমি ত চিরদিনই আমাকে এই আশা দিয়া আসিতেছ’ এই কথায় বোঝা গেল সমস্ত জীবনে তাহাকে যে বলা হইয়াছে “মরণ নাই”, সেই ভাব গুলি, কথা গুলি, সব মনে জাগিয়াছে

ইহাও শুদ্ধ সংস্কার। তখন সে কাত হইয়া শুইয়াছিল আমার হাত দিয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইবার মত হইয়া গেল। তারপর গ্লুকোজ খাওয়ার পর বলিল, ‘আমার শীত করে না? আমার শীত করে’। সব কাপড়ই ছিড়িয়া মুখ ইত্যাদি মুছাইবার কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল একখানা গেরুয়া চাদর বাস্কে ছিল আমি সেখানা আনাইয়া গায়ে দিয়া দিতেই বেশ চিৎ হইয়া শুইল। এবং সকলে বুঝিতে না পারিলেও আমি বুঝিতে ছিলাম প্রণব ও সন্ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। এর মধ্যেই এক সময়তে আমি বলিলাম, “তুমি না কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতে, কীর্ত্তন শুনিবে”? বলিল, ‘আচ্ছা’। আমি যোগেশকে ডাকিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিলাম খানিকপর বলিলাম থাক আর দরকার নাই। এই সব যে করিতেছি উপস্থিত সকলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না যে কেন এই সব করিতেছি। তারপর প্রণব উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার হাত তাহার মাথা স্পর্শ করিয়া রহিল। কোন রকম মুখ বিকৃত বা হাত পা টান হইয়া যাওয়া কিছুই হইল না পা দুইখানা গুটানই রহিয়াছে এই অবস্থায় প্রাণ বাহির হইয়া গেল। ঘরে কবিরাজ প্রভৃতি কেহই জানিতে পারিল না যে কখন প্রাণ বাহির হইল? আমি ইতি পূর্বেই বড়ি নীচে বিছানায় রাখিতে বলিয়াছিলাম। প্রাণ ত্যাগের পর পা দুইখানি গুটান অবস্থাতেই অন্ন হেলিয়া গেল। কেহ কেহ যে বসা অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে এও সেই অবস্থাই। একবার

ভোলানাথ বলিয়া ছিল, ‘আমাকে বসাইয়া দেও’। কিন্তু শরীরের এই অবস্থা ধরিয়া উঠান মুশ্কিল তাই উঠান হইল না কিন্তু উঠাইয়া বসাইয়া দিলে বসা অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ হইত। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া ত তোদের মত কিছু করি না, যাহার বাহা দরকার এই শরীরটা দিয়া সে তাহাই করিয়া নিতেছে। দেখ, একটার পর একটা কি সুন্দর ভাবে হইয়া গেল। দেহ-ত্যাগের পর আমি কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করি কি তোমাদের মতে ঠিক হইয়া গিয়াছে ত ? যেন কাহার কথা কে বলিতেছে। তাহারা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যেন শব্দ করিতে পারিতেছেন। খানিক পরে বলিল, ‘হাঁ মা’। তখন আমি সংস্কারের ব্যবস্থার কথা সব তাহাদের রামকৃষ্ণমিশনে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছি’। আমি মার মুখে সব শুনিয়া অবাক ও মুগ্ধ হইতেছি মা’ই মার তুলনা স্থল।

আজ সোলন হইতে নিবারণ বাবু মার আদেশে এখানে আসিয়াছেন তিনি বিস্ফাচলে যজ্ঞরক্ষার জন্ত যাইতেছেন। সেখানকার ব্রহ্মচারী অনঙ্গ ভট্টাচার্য্য কয়েক মাসের জন্ত তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন। নিবারণ বাবু আসিয়া বলিতেছেন, ‘মা কি আশ্চর্য্য ঘটনা। পরশু সকাল বেলা জলে হাত দিয়া আমার হাত প্রায় অবশ হইয়া গিয়াছিল। তখন আমার মনে হইল এখানকার ঠাণ্ডায় এখন আবার কি করিব ? আবার তখনই মনে হইল মা’ই ব্যবস্থা করিবেন আমার চিন্তার দরকার কি ? তারপর দিনই মার টেলিগ্রাম গেল মা আসিতে আদেশ দিয়াছেন’।

ওরা আশ্বিন, মঙ্গলবার :—

ডাক্তার সাহেব মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন “মা, আমি যে মূর্ত্তি যাইতে দেখিয়াছিলাম তাহাই এই রোগের প্রকৃত মূর্ত্তি কিনা” ? মা বলিয়াছিলেন “এখন কিছু আসিতেছেন। পরে আসিলে বলিব” । আজ ৪টার দরজা খুলিতেই দেখি মা জাগিয়াই আছেন আমি বলিলাম “মা তুমি চোখ খুলিয়াই ছিলে বুঝি ? আজ বুঝি শুইবার ভাব নাই” । মা বলিলেন “হাঁ, উহার আবার এখন সব আসিয়াছিল, কথাবর্ত্তা হইতেছিল” । আমি কথা পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলাম “দরজা বন্ধ কে আবার তোমার সঙ্গে কথা বলিতে আসিল ” ? মা একটু মুহূ হাসিয়া বলিলেন “ঐ যে সেদিন রোগের মূর্ত্তি গিয়াছিল তাহার। দেখ প্রত্যেক রোগেরই আবার সত্ত্ব, রজ, তম হিসাবে তিন মূর্ত্তি এই রোগেরও তাই। পান্থ সে দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ‘মা, আমি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহাই এই রোগের মূর্ত্তি কিনা, তখন এ কথার কোন জবাব হয় নাই’ । এই বলিয়াই চুপ করিতেই আমি বলিলাম “বল না” । মা আর কিছু বলিলেন না ; তারপর রোজ পড়িয়া যাইতেই আমরা মাকে একটু হাঁটিবার জন্য ছাতে নিয়া যাইতেই সঙ্গে ডাক্তার পান্থও ছাতে গেলেন । মা তখন ডাক্তার পান্থকে বলিলেন, “পিতাজী, সে দিন যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ঐ মূর্ত্তিই এই রোগের কিনা ? কথা হইল এই, প্রত্যেক রোগেরই তিন মূর্ত্তি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম, ভাবের তিন মূর্ত্তি । ঐ যে তুমি দেখিয়া ছিলে তাহার পিঠটা

কতকটা বিড়ালের মত, আর চেহারা বানরের মত ভ্রম মধ্যে বড় বড় লোম আছে ওটা হইল এই রোগের বিবাক্ত অংশের মূর্তি। আজ তাহারা (অর্থাৎ তিন মূর্তি) মিলিতে (অর্থাৎ দেখা করিতে) আসিয়াছিল। আমি আর বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই”। ডাক্তার পান্থ বলিলেন “মা, আমিও ত বলিয়াছিলাম কি রকম একটা কুত্তা বা বানরের মত রূপ এই লম্বা লম্বা তার আঙ্গুলী কাঁপ দিয়া গঙ্গায় পড়িল কিন্তু গঙ্গার জলের কোন শব্দ হইল না। যেন ছায়া মূর্তি”। মা একটু গৃহ হাসিলেন, যেন ডাক্তার পান্থের কথার সমর্থন করিলেন। তারপর সন্ধ্যা বেলায় আবার সকলে আসিয়া মার ঘরে বসিলেন। কথাবার্তা হইতে হইতে রাত্রি ১০টা বাজিতেই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৪ঠা আশ্বিন, বুধবার :

আজ কথা উঠিয়াছে শ্রীযুক্ত যোগেশ বন্দোপাধ্যায়ের উপর যে ৮কালীর ঘরের দরজা খোলার ভার দেওয়া হইয়াছিল সেই কথা। মা বলিতেছেন “দেখ, কেন তাহার উপর এ ভার দেওয়া হইল জানিস্? যে দিন প্রথম শাহবাগ গোল ঘর হইতে কালীকে সরান হয় আমি তাহার পূর্ব দিন যোগেশ, বিনয় ও কুলদাকে বলিলাম ‘কাল সূর্যোদয়ের পূর্বে আসিয়া, ৮কালী ঐ ঘর হইতে নাড়িতে হইবে’। তাহারা ১৥ মাইল দূর হইতে, সব অন্ধকার থাকিতেই শাহবাগে আসিয়া পৌঁছিল। বাগানের দরজা তখন খোলা ছিল না তাহারা

বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে শুনা গেল বাহিরে দাঁড়াইয়া কথায় কথায় যোগেশ বাড়ুয়া নাকি বলিতেছিল ‘কালী উঠাইয়া নিতে হইবে। যদি কালী উঠাইতেই বুর বুর করিয়া হাত হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে বাপু তবে ত কাহার সর্বনাশ হইবে ঠিক নাই’। এর পর বাগানের দরজা খোলা হইল। তাহার ভিতরে আসিয়া (অমূল্য ও কমলাকান্তকে সহ পাঁচ জনে) যেরূপ ভাবে বলা হইল ‘কালীকে অন্য ঘরে নিয়া গেল। যোগেশ বাড়ুয়া যে বাহিরে বলিয়াছিল ‘এই কালী যাহার হাত হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার ত সর্বনাশ’। তাহার এই কথার ভিতর একটা সুন্দর বিশ্বাস আমি তীব্র দেখিলাম সেই বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপই ধর না আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে ‘যতদিন যোগেশ বাড়ুয়া বাঁচিয়া থাকিবে সেই এই কালীর প্রয়োজন মত দরজা খুলিবে ও প্রণামীর টাকার হিসাব যেন করে। এখন ত দরজা বন্ধ হইয়া গেল এখনও বলা হইল ঐ মন্দিরের প্রণামী টাকা পয়সার হিসাব বৎসরান্তে যোগেশ বাড়ুয়ার কাছেই গোনা হইবে, এবং উপস্থিত ষথাস্থানে দেওয়া হইবে। যতদিন এই কাজের দরকার হইবে, তার অভাবে তার ছেলে অথবা সুরেন বাড়ুয়া (পোর্টমাক্টারের) ছেলেদের কাছে ঐ কাজ হইতে পারে। আশ্রমের এই দরজা খোলার প্রসঙ্গে যা বলিতেছেন,” আশ্রমের শুদ্ধ কাজের ভার যাহার উপর যতটুকু পড়ে সকলেই সেই কাজে সহায়তা করা দরকার। কারণ এই শুদ্ধ কাজের ভার পাইয়া যাহার যতটুকু কল্যাণ হয় ততইত

মঙ্গল। তাই আশ্রম বাসীদেরও আনন্দের সহিত এই সব আধ্যাত্মিক কর্মের সহায়ক হওয়া বিশেষ দরকার”।

আর একটি কথা উঠিল, মা যেবার উৎসবের পর এই দিকে ভোলানাথ, ও জ্যোতিষদাদাকে নিয়া চলিয়া আসেন, সেবার উৎসবের শেষ দিক দিয়া সুরেনদাদা (পোর্টমাস্টার), কমলাকান্ত বিনয়দাদা (বিনয় বন্দোপাধ্যায়) অমূল্য চৌধুরী ও আমাকে দিয়া আশ্রমের স্থায়ী যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়াইয়া ছিলেন। এ’কথায় মা বলিতেছেন, “দেখছিলাম ইহাদের পাঁচজনের কোনও সময়তে এই জাতীয় আধ্যাত্মিক এক যোগের কর্মাদি ছিল। তাই উপস্থিত তাহাদের এই ভাবের কার্য্য হইয়া গেল।” মা কখন যে কাহাকে কি জ্ঞা কি আদেশ দেন কে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে। কেহ হয়ত এইজন্ম দুঃখীত হয়, অভিমান করে, ‘মা আমাকে দিয়া করাইলেন না, উহাকে দিয়া করাইলেন;’ কিন্তু এই সকল কর্মের নিগূঢ় কারণ যে মা’ই একমাত্র জানেন। আমাদের সে বিষয় ধারণা করাও বাতুলতা মাত্র।

৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার :—

মার অবস্থা এক ভাবেই চলিতেছে। আজ আট নয় দিন যাবত ভাত বা রুটি একেবারে বন্ধ। সাত আট দিন যাবত দুধ ও একটু একটু ফল দেওয়া বাইতেছে। ঐ ভাবেই আহাৰ চলিতেছে।

সন ১৩৪৫ ৬ই আশ্বিন, শুক্রবার :—

কাল ও আজ দুই দিনই প্রক্বেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় মেয়ে ও জামাতাকে নিয়া মার কাছে আসিয়াছেন । কাল বিশেষ কিছু কথা হয় নাই কিন্তু আজ অনেক কথা হইল । তাহার মধ্যে কয়েকটি লিখিতেছি । শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, “এই যে কতগুলি কুসংস্কার আছে তাহা সর্বতোভাবে ত্যাগ করাইতো দরকার : কারণ সেগুলি পালন করিতে করিতে আরও অজ্ঞানতাই ত বাড়িয়া যায় ; যেমন জাতিভেদ ইত্যাদি” । মা বলিলেন, “সকলের পক্ষে এক কথা নয় ; কাহারও এমন সংস্কার যে ঐ সব ভাবের ভিতর দিয়াই বাইতে হইবে, ঐ সব ভাবের ভিতর দিয়া না গেলে সে বন্ধনমুক্ত হইতে পারিবে না, তাই তাহাকে ঐ সব নিয়ম পালন করিতেই বলা হয় । যেমন যাবে সকলেই এক জায়গায়, কিন্তু যে যেখানে আছে তাহাকে সেখান হইতেই চলিতে হইবে, এই জগ্গই প্রত্যেকের এক পথ নয় । উদ্দেশ্য যদিও একই, এক ছাড়া ত কিছুই নাই ।” শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, “আমরাও সেই অখণ্ডেরই অংশ ।” মা বলিলেন, “অংশ কেন বাবা, তুমিই পূর্ণ অখণ্ডস্বরূপ । দেখ না, তোমাদের মধ্যে যদি সেই অখণ্ড ভাব না থাকিত তবে তোমরা অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড শান্তি, চাও কেন ? যে যেই জিনিষের স্বাদ না জানে সে কি সেই জিনিষের জন্ম লালসিত হয় ? আর দেখ বাবা, তোমরা ত একের মধ্যেই আছ, এক পা এক পা করিয়া চল, এক অক্ষর এক অক্ষর করিয়া লিখ, এক গ্রাস এক গ্রাস করিয়া খাও ।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন,

“আচ্ছা, গুরু করা কি দরকারই?” মা বলিলেন, “হাঁ একটা উপলক্ষ্য ছাড়া চলিতে পারে না তা।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সৎগুরু কি করিয়া চিনিয়া নেওয়া হইবে?” মা উত্তর দিলেন, “সত্যি কথা বলিতে হইলে, প্রফেসারকে কি ছাত্ররা চিনিয়া নিতে পারে? এই জন্মই কেহ কেহ বলেন এক বৎসর সঙ্গ করিয়া পরে গুরুত্বে বরণ করিতে হয়। তাহাতেও কি চেনা যায়? তবে একটা কথা আছে যাহার সঙ্গে যে সংযোগ তাহার নিকট হইতে সেইটুকু পাইতেই হইবে। সেই অনুসারেই যোগাযোগ হয়। হয়ত এমনও হয় গুরু করিয়া শেষে আপশোষ করে, আর ভাল লাগে না। তখন বলা হয় তাঁহার নিকট হইতে যতটুকু পাওনা ছিল ততটুকু পাওয়া গেল। আর একটা কথা, তুমি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া গিয়া ট্রেন ধরিলে, ট্রেনে উঠিয়া ঘোড়ার গাড়ীকে তুচ্ছ করিতে নাই। কারণ ঘোড়ার গাড়িতে গিয়াই ত তুমি ট্রেন ধরিতে পারিলে। আর এক কথা, যেমন পাঠশালায় পড়িয়া, তোমার যখন সেখানকার বিদ্যা শেষ হইয়া গেল তখন তোমাদের স্কুলে পড়িবার এবং স্কুলে পড়িয়া কলেজে পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কাজেই কিছুই বৃথা যায় না। তোমার পিপাসা হয়ত পাঠশালা মিটাইতে পারিল না কিন্তু পাঠশালার বিদ্যাইত তোমার স্কুলে পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিল, কাজেই কিছুই বৃথা যায় না। আবার সৎগুরু, স্বয়ংই শিষ্যকে আশ্রয় দেন। অনুসন্ধান করাইয়া লন।

জগতগুরু স্বভাবই, এই করুণা। ইচ্ছা, গুরু ও মন্ত্র তিনইত
এক, তাই এই।”

আজও মাকে বৈকালে একটু ছাতে নিয়া যাওয়া হইল।
সন্ধ্যায় নীচে নামিয়া আসিলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ৮ই আশ্বিন রবিবার একটি কন্যা-
আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে দেৱাতন
আশ্রমের পিছনের একটা ছোট বাড়ী সেই উদ্দেশ্যে নেওয়া
হইবে। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজীর
অর্থ সাহায্যেই এই কার্যের ভিত্তি স্থাপন হইল। ঢাকা হইতে
শ্রদ্ধেয় কুলদাদাদা দুই কন্যাকে কন্যাআশ্রমে রাখিবার জন্ম
মার চরণে পাঠাইতেছেন খবর পাওয়া গিয়াছে। কুলদা দাদাই
প্রথম ছেলেকে ব্রহ্মচারী করিয়া দিয়াছেন, এখন মেয়েদের
আশ্রমেও তিনিই প্রথম মেয়েদের পাঠাইতেছেন কথা হইয়াছে।
ধর্মপ্রাণ মেয়েদের ধর্মপথে বাইবার সাহায্য করাই এই
আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে। বাহিরের শিক্ষা বিশেষ দেওয়া
হইবে না। আগামী রবিবার মেয়েদের নিয়া শ্রীযুক্ত যতীশ-
চন্দ্র গুহ মহাশয়ের আসিয়া পৌছিবার কথা। এই খানেই
গঙ্গাতীরে মেয়েদের নূতনভাবে ব্রতী করা হইবে।

৭ই আশ্বিন শনিবার :—

আজ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই। অভয়,
যোগেশ দাদা, অনুকূল প্রভৃতি কাল উত্তর কাশী হইতে দেৱাতন
আসিয়া পৌছিয়াছেন। অভয় ও অনুকূল কাল রাত্রিতেই

এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যোগেশ দাদা কিষণপুর আশ্রমেই আছেন ।

৮ই আশ্বিন, রবিবার :—

আজ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকার কুলদা দাদার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়েকে কন্যা আশ্রমের জন্য পাঠাইয়াছেন । আজ শ্রীযুক্ত মনমথ দাদা তাহাদের আশ্রম প্রবেশ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমার পূজা, হোম, মেয়েদের উপর কুমারী পূজা, কীর্ত্তন ইত্যাদি করা হইল, মেয়েদের নাম হইল ভক্তিপ্রিয়া ও শান্তিপ্রিয়া ।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছি, সে দিন রাত্রিতে মার শরীরে ক্রিয়াদি হইয়া যাইবার পর হইতেই মার চেহারায় একটা বিশেষ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে । যদিও তারপর দিন যেমন ছিল তেমন নাই কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে । খাওয়া কিন্তু একটু একটু দুধ ও একটু শুকনা কল । আর ঐ রকম ভয়ঙ্কর অমুখে তিন চার দিনেই চেহারা যে রকম হইয়া গিয়াছিল ডাক্তার পাশ্বে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন কিন্তু ক্রিয়ার সময় হইতেই চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্তন । এমন কি যতীশ দাদা (শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ) আসিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, “দিদির চিঠিতে আমরা যে রকম ভয় পাইয়াছিলাম, আসিয়া মার চেহারা দেখিয়া বিশেষ কিছু হইয়াছিল বলিয়াইত মনে হইতেছে না ।” মা এ কথায় হাসিয়া আমাকে বলিলেন— “তোকে এখন বেকুব বানাইব ।” অর্থাৎ আমি সকলকে

মার এত বড় অসুখ ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিয়াছি এখন সকলেই আসিয়া দেখিবে তেমন কিছু নয় বরং মা ভালই আছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, “তা বেশ ত বেকুবই না হয় হইলাম তবুও তুমি যে ভাল হইয়াছ।” আজও প্রতিদিনের মত রাত্রি ১০টার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৯ই আশ্বিন, সোমবার :—

আজ কলিকাতা হইতে আশু (ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র) মার অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছে। ধীরে ধীরে অনেকেই মার দর্শনে আসিতেছেন। আবার ডাক্তার পান্থের সেবাসদন, লোকের কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। ৩পূজার বন্ধ তাই সকলে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আজ দুপুরে মার সঙ্গে কথা হইতেছে, মা আমাকে বলিতেছেন—“কাল দুপুরে শুইয়া আছি বেনা ৩টা হইবে, আমি চোখ খুলিয়া দেখি রৌদ্রে সবদিক ভরিয়া আছে, ভাবিতেছি “এখনও দেখি খুকুনী মুখ ধুইতে ডাকিতেছে না এত বেনা হইয়া গেল।” তুই ও অভয় রাত্রিতে কাছে শুইয়া থাকিস্ তাই চাহিয়া দেখিতেছি তুই ও অভয় দুই জনেই উঠিয়া গিয়াছিস কেউ দেখি এদিকে নাই।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, “মা মুর্শোরীতেও একদিন সকালে তোমার মুখ ধোয়াইয়া দিয়াছি তুমি ১০টার সময় খাইতে বসিয়া বাবাকে বলিতেছ, “খুকুনী আজ আমার মুখ ধোয়াইয়া দেয় নাই।” তখন শুধু একথা নয়, তুমি বলিয়াছিলে

খাওয়ার অনেক পূর্ব হইতেই অর্থাৎ মুখ ধুইয়া বসিবার পর হইতেই প্রায়, তুমি নাকি ভাবিতেছিলে খুকুনী আমাকে মুখ ধোয়াইয়া দেয় নাই; আবার এও দুর্ঘটনাই ছিল যে, “আমি পূর্বের কিছু বলিব না যখন ডাকিয়া খাওয়াইতে বসাইয়া খাওয়ার জিনিষ মুখে দিবে তখন বলিব।” মা একথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “এসব কি মাথা খারাপ নাকি? বুড়াদের যেমন খাইয়া ভুল হয় এও তাই, নাকি?” আমি বলিলাম, “মা তোমার কথা তুমি জান, প্রায় এক বৎসর পূর্বেই ত তুমি আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলে যে এই রকম কিন্তু পূর্বেই বলিয়া রাখিতেছি।” মা এসব কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। পরে বলিতেছেন “দেখ, এই যে তোদের হিসাব মত সময়ের মাপ, কোন সময়ে ইহা একেবারেই থাকে না, তাই এই রকম হইয়া যায় ইহাও একটা দিকের প্রকাশ জানিস্। ইহা বিস্মৃতি বা ভ্রমের ঘরে যায় না।” এই ভাবের আরও অনেক কথা হইল।

১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার :—

আজ ভক্তেরা অনেক সময়ই সকলে মিলিয়া মার কাছে নাম কীর্তন করিয়াছেন। আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।

১১ই আশ্বিন, বুধবার :—

আজও প্রায় ৭টায় মা উঠিয়াছেন। পরে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিলাম, একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়ার পর ভক্তেরা

সকলে মার নিকট বসিলেন। ঘণ্টা খানেক কীর্তন হইল। গঙ্গার উপর বাড়ী, তার মধ্যে প্রভাতে, মার কাছে বসিয়া ভক্তদের মুখে নাম কীর্তন বড়ই মধুর লাগিতেছিল।

১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার :—

আজ কলিকাতা হইতে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে গিরি-মহারাজের আশ্রমে আসিয়াছেন এবং তথা হইতে মার নাম শুনিয়া মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি কথায় কথায় বলিতেছেন, “স্বামী অসিতানন্দের (ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের) মুখে একটি ঘটনা শুনিয়া আপনাকে দেখিবার বড়ই আগ্রহ হয়, ঘটনাটি তিনি যেমন করিয়া বর্ণনা করেন আমি তেমন ভাবে করিতে পারিব না। শুনিলাম তিনি আপনার সঙ্গে উত্তর কাশী মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় গিয়াছিলেন তারপর দেৱাতুল আসিয়া আপনি সকলকে নিয়া রায়পুর যান সেখান হইতে ফিরিবার সময় বৃষ্টিতে পথের নদীতে ভয়ানক শ্রোত চলিতে থাকে। মোটরে আরোহীদের নিয়া পার হওয়া অসম্ভব। তখন আপনি নাকি সকলকে নিয়া বৃষ্টির মধ্যে নামিয়া পড়িলেন এবং নদীর মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া এমন ভাবে সকলকে পার করিতেছিলেন, তাঁহার নাকি সে সময়, আপনার ঐ রূপ দেখিয়া কেবলই মনে হইতেছিল। ভব-কর্ণধার গুরুরূপে আপনি দাঁড়াইয়া সকলকে পার করিতেছেন। সেই কথাটি তিনি অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন, তাঁহার প্রাণে সে সময়কার ঘটনাটি লাগিয়া গিয়াছে।

আমাদেরও এই ঘটনা শুনিয়া সেদিনের কথা মনে পড়িল। বাস্তবিক ভয়ানক অবস্থা, বহুলোক সঙ্গে, ছেলে পেলো বৃদ্ধা সব রকমই আছে। এমন স্রোত যে দুই তিন জনে ধরিয়া ধরিয়া এক এক জনকে পার করিতে হইতেছে। মা তখন এমন সুন্দর ভাবে মাঝখানে দাঁড়াইয়া ব্যবস্থা করিতেছিলেন কাহাকেও হাত ধরিয়া সাহায্য করিতেছিলেন সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রুষ্টি হইতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মধ্যে মধ্যে করকাপাত হইতেছে, তার মধ্যে এই লীলা চলিতেছে, অনেকেরই তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা মনে পড়িয়াছিল। আবার কাহারও কাহারও মনে স্বামী অসিতানন্দের মত 'কর্ণধার গুরু ভাব' জাগিয়াছিল।

আজ বৈকালে সকলে মার কাছে বসিয়াছেন। কথায় কথায় হইতেছে মার কাছে কত খারাপ লোক আসেন, কিন্তু তাহারও মার নিকট হইতে কোনরূপ অনাদর পান না তাই সকলের আশ্বাস দাড়াইয়া যায়। দুষ্কের দমনও হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। মা হাসিয়া বলিতেছেন, “দেখ, তোমরাও কত জনে আমাকে এ বিষয় কত উপদেশ দিলে, কিন্তু আমি ত রক্ষা করিতে পারিতেছি না, কি করি বল? কথাটা কি জান? সাধু সন্ন্যাসী যে অসং লোককে নিজের কাছে রাখে না দূরে সরাইয়া দেয়, তাহার কারণ সেই সব অসং লোকের প্রভাবে সাধুদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, ইহা ঠিকই কথা; আর এক শ্রেণীর আছে, তাহারা এতটা উচ্চ স্তরের হয়ত,

অসং লোকের প্রভাবে তাহাদের কিছু ক্ষতি হইবে না তবুও তাঁহারা লোক শিক্ষার জন্য অসং লোকদের নিকট হইতে দূরে থাকে। আর এই শরীরটার সবই উল্টা পাল্টা কি না, খেয়াল কি হয় জানিস্ ? শরীরে ঘায়ের প্রকাশ হয় না ? তা বলিয়া কি হাতটা কাটিয়া ফেলে নাকি ? ঔষধপত্র দেয়, ভাল করিতে চেষ্টা করে। এখানে ত চেষ্টা টেষ্টা নাই, যাহা হইয়া যায়। কাহাকে বলিব সরিয়া যাও। আর কি বা সরাইয়া দিব, কোথায় বা সরাইয়া দিব। এক ছাড়া যে দুই কিছু নাই।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তাই ত বলি রোগগুলিকে সরাইয়া দিব কোথায় ? আর কাহাকে সরাইয়া দিব ? তোমরাও যেমন আস শরীরটা নিয়া খেলা কর উহারাও তেমনই আসে, খেলা করে। তবে বলিতে পার, শরীর শুখাইয়া যায়, দুর্বল করে, তা’ত করিবেই উহাই যে তাহাদের স্বভাব বা স্বরূপ। যে আসিবে তাহার প্রভাবও দেখা যাইবেই। মার মুখে এসব কথা কতবারই শুনি, স্তম্ভিত হইয়া যাই। কত বড় ভাবের এসব কথা। যিনি বিশ্বময় হইয়া আছেন, মহান, অসীম, অনাদি, অনন্ত শুধু তিনিই এ কথা বলিতে পারেন। আবার ভুলিয়া যাই, তাঁহার লীলা-চক্রে পড়িয়া এসব কথা মনেই থাকে না। সব ভুলাইয়া দেন। তাঁহার চক্রে পড়িয়া ক্ষুদ্র আমরা হাবুডুবু খাইতেছি কি করিব।

সন্ধ্যায় কীর্তনাদি হইল। রাত্রি ১০টার লাইট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৩ই আশ্বিন, শুক্রবার :—

আজ সপ্তমী পূজা। ভক্তেরা সকলে মিলিয়া কীর্তন, পূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করিলেন। খুব আনন্দ হইল।

১৪ই আশ্বিন, শনিবার :—

আজ মহাষ্টমী, ভক্তেরা যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। যোগেশ দাদা, নীরোজ দাদা, আশু, নরসিং ও ডাক্তার পান্ডু এই পাঁচজনে আহুতি দিলেন। কমলাকান্ত চণ্ডীপাঠ করিল। সাধন, শশাঙ্ক এবং স্ত্রীলোকেরা সকলে বসিয়া জপ করিলেন। পূজা, যজ্ঞ ও ভোগাদি সুন্দররূপে হইয়া গেল। যজ্ঞাদির পর কীর্তনাদি হইল।

খুব আনন্দ চলিতেছে। মাকে ফুল দিয়া সাজাইয়া দিতেছে। কতজনে কাপড় দিয়া সাজাইতেছে আবার তখনই সকলকে কাপড় বিলাইয়া দেওয়া হইতেছে। আজ শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহ সপরিবারে আসিয়াছেন। মা সন্ধ্যার পূর্বে ছাতে গিয়া বসিলেন। সেখানে কীর্তন হইল। সন্ধ্যার পর আবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। সকলে মার কাছে বসিয়াছেন নানা কথাবার্তা হইতেছে। রাত্রি ১০টার পর দরজা বন্ধ করিয়া মাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইল।

১৫ই আশ্বিন, রবিবার :—

কাল রাত্রি ৩টায় মা বাহিরে আসিলেন। তারপর বিছানায় গিয়া আর শুইবার ভাব নাই। বসিয়া আছেন। হঠাৎ সমস্ত শরীর ভয়ানক ভাবে কাঁপিতে লাগিল। খানিক

পরে আবার শরীরে ক্রিয়াদি হইতে লাগিল। আসন করিয়া বসিলেন এবং পর পর কত রকম আসন হইতে লাগিল। অদ্ভুত ভাবে শরীর সঞ্চালিত হইতেছে। একে একে সকলে উঠিয়া আসিয়া মার এই ভাব দেখিতেছেন। এলাহাবাদ হইতে জীতেনদাদাও আসিয়াছেন। তিনি পূর্বের আরও এই ভাব অনেক দেখিয়াছেন সত্য, তবুও এই সব ভাব যেন নিত্য নূতন। ইহার মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ। আজও প্রায় ষণ্ঠা খানেক ক্রিয়া চলিল। তারপর মা স্থির হইয়া বসিলেন। প্রভাত হইয়া গেল বেলা প্রায় ৫৷ টায় মাকে শয়ন করিতে বলা হইল, মাও ছেলে মানুষের মত বলিতেছেন, “শুইব? আচ্ছা।” এই বলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় ৮টায় চোখ খুলিলেন। আমরা উঠিয়া হাত মুখ ধোয়াইয়া একটু জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, আজ শরীরে যেন একেবারে ছাড়া-ভাব। অনেক চেষ্টায় উঠাইলাম। কিন্তু সারাদিনই আজ ঐ ভাব। চোখ যেন ঘুমের ভাবে ভরিয়া আছে। কাল, কাঁপুনিতে সমস্ত মাংসের ভিতর একটা বিষম আলোড়ন হইয়াছে। এরূপ বড়, হয় না। তাই শরীরটা বড়ই ছাড়া-ছাড়া ভাব হইয়া গিয়াছে। দুপুরে আমি মার কাছে বসিয়া আছি, যেরে আর কেহ নাই। কথায় কথায় কাল রাত্রির শরীরে যে ক্রিয়া হইয়া গিয়াছিল, সে কথা উঠিল; মা বলিলেন, “দেখ, এই যে সব ক্রিয়াদি হইয়া যায় এইগুলি কখনও হয় যেমন তোরা দেখিস্ রোগ

সারিয়া গেল। কিরকম জানিস্? যেমন কোথায়ও যাওয়ার সময় মানুষে কাপড় খানা ঠিক করিয়া পরিয়া নিল। এ, ত আর নিজে তাদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু নেয় না, করে না এ, হইয়া যায়। কিন্তু ঐ ভাব অর্থাৎ, যে গতিতে চলিবে এই ক্রিয়াদি দ্বারা যেন সেই গতিটায় চলিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া লইল। যেমন বাতাসে কাপড় এদিক ওদিক যায় আমরা বসে দেখি, এই শরীরও ত কাপড়ের মতই, ঠিক সেই রকমই দেখা যায়। ক্রিয়াদি হইয়া যে গতিতে চলিবে তাহার জন্মই যেন প্রস্তুত হইয়া লইল।”

বৈকালে বহুলোক মাকে নিয়া বসিয়াছেন। আজও সন্ধ্যার পূর্বে মা ছাতে গিয়া বসিলেন। সেখানে অভয়ের সহিত সকলে কীর্তন করিল। অনেকে আসিয়াছেন তাই কথা বার্তায়, কীর্তনে খুব আনন্দে সময় কাটিতেছে।
১৬ই আশ্বিন, সোমবার :—

আজ নবমী। এ বৎসর দুইদিন অষ্টমী চলিল তাই আজ নবমী। আজও আনন্দ উৎসব চলিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্বে মা আজ সকলকে নিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে চলিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডে প্রায় ষট্টি খানেক থাকা হইল। ভক্তেরা কেহ কেহ এই সুযোগে মার শ্রীপাদপদ্মে জবা গজাজল দিয়া পূজা করিলেন। সন্ধ্যার পর সকলে সেবাসদনে ফিরিয়া আসিলেন। কীর্তনাদিও হইল।

১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার :—

আজ ৩বিজয়াদশমী। আজ আমি ও যোগেশদাদা খেওড়া বাইতেছি উদ্দেশ্য মায়ের জন্মস্থানটার কিছু করা যায় কি না? আশ্রমের মেয়েদের আজ দেৱাতুন রাখিয়া আমরা খেওড়া রওনা হইয়া বাইব স্থির হইয়াছে। সোলন হইতে মাসীমা ও শ্রীযুক্ত নিশিবাবুও মায়ের আদেশে আসিয়াছেন তাঁহারাও মেয়েদের সঙ্গে দেৱাতুন আশ্রমেই এখন থাকিবেন। মা সম্প্রতি এখানেই আছেন। এলাহাবাদ হইতে মহারতন আসিয়াছেন।

মুসৌরীতে যিনি মায়ের মা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মা, (শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী অর্থাৎ মার দিদিমা হইলেন), ছেলে মেয়ে নিয়া সব আসিয়াছেন। মা দিদিমা দিদিমা বলিয়া খুব আনন্দ করিতেছেন। এই দিদিমা মাকে গোপাল বলিয়া আদর করেন। মাকে মালা দিয়া সাজাইলেন, আবার ৩বিজয়া দশমী বলিয়া পায় সিদ্ধি দিতেছেন মুখে মিষ্টি দিতেছেন। তাঁর একটি ছেলে কৃষ্ণকে সকলে নিয়া নাচাইতেছেন এই ভাবের একটা গান ধরিতেই মা বলিলেন, “দিদিমা! তুমি নাচ ত।” সে বৃদ্ধাও আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মা গিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “আমি বাম পাশে দাঁড়াইলাম” দিদিমাকে মালা দিয়া ধড়াচুড়া পরাইলেন। তিনি মাকে রাখিকা বলিয়া আদর করিলেন। সকলে এই লীলা দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

আমি বলিলাম, “মা, আজ যে বাম দিকে গিয়া রাখিকা হইলে?”
মা বলিলেন, “কেন জানিস্ না? উনি আমাকে কৃষ্ণ গোপাল
বলিয়া সাজাইতে ছিলেন, তাই তদভাবাপন্ন হইয়া গোপাল
হইলেন। সব কাজই তন্নয় হইয়া করা দরকার।”

এই প্রকার কত সব আনন্দ হইল। তারপর সকলে
মিলিয়া কীর্তন করিতে বসিলেন; বেলা ১২টা অবধি কীর্তন
চলিল তারপর মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।
আমি মার কাছে বসিয়া আছি, দুই চারিটি কথা হইতেছে।
শ্রীযুক্ত নীরোজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে
আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহের স্ত্রী মার কাছেই
থাকিবেন বলিয়া রহিয়া গিয়াছেন, অপরাপর সকলে চলিয়া
গয়াছেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলে
নিয়া মা যে ভাবে সামঞ্জস্য দিয়া খেলা খেলিতেছেন ইহা
বাস্তবিকই দুর্লভ। ইহা শুধু মার পক্ষেই সম্ভব, এত বড়
একটা শক্তি ছাড়া এই ভাবে সকলকে নিয়া খেলা কি ভয়ঙ্কর
ব্যাপার, ভুক্ত রোগীরা বিশেষ ভাবে এই কথার সাক্ষী প্রদান
করিবেন। কত বিরোধী মতের মধ্য দিয়া মার জীবন প্রথম
হইতেই এক ভাবে চলিয়াছে। কিন্তু সব খেলার মধ্যেই সকলে
মাকে ভাল বাসিয়াছে এবং মাকে চাহিয়াছেন। এতটুকুও
যদি মার মধ্যে কোথায়ও অসম্পূর্ণতা থাকিত, তবে এই
ভাবের খেলা চলিতে পারে না। সেদিন আরও একটা ভাবের
কথা বলিতেছেন, “দেখ, কখনও দেখা যায় এই শরীরটার

প্রতিই শুধু কাহারও তীব্র আকর্ষণ তখন কেমন যেন সেখানে শরীরটার ভাব এইরূপ হয় যে তাহাদের হাতে শরীরটা সহজে ধরা দেয় না যেন পিছলাইয়া যায়। এ'ও একটা ভোগ ত, তাই বোধ হয় ঐ রূপ হইয়া যায়; তাহার পক্ষে ঐ প্রয়োজন। আমি হাসিয়া বলিলাম, “আবার তাহাদের শরীরটার প্রতি একটু কম আকর্ষণ দেখ তাহাদের কাছে নিজে গিয়া ধরা দেও!” মা হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, এই রকম সত্যই হইয়া যায়! হয়ত তাহারা এই শরীরটার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু সেই একলক্ষ্যে স্থির ভাবে আছে, এক লক্ষ্য ধরিয়া আছে, তাহাদের কাছে গিয়া এই শরীরটা আপনা আপনি উপস্থিত হয়। এই রকম হইয়া যায়।” এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। এই কথাগুলির নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়া অনেকেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন। কুলকুল শব্দে মা গঙ্গা কোঠাখানির নীচ দিয়াই বহিয়া যাইতেছেন। একটানা শব্দে, একটু স্থির ভাবে বসিলেই মনটা স্থির হইয়া আসে। তার মধ্যে মা মহাশক্তি, কাছে বসিয়া আছেন। ভক্তদের প্রাণে আনন্দের সীমা নাই। মার শরীর দুর্বল এই সকলের আশঙ্কা।

মায়ের হাতের দুই তিনটি নখ একটু খারাপ ছিল; এই ঘটনারও কারণ শিশুকালে মার শরীরের দিকেও উপেক্ষা করিয়া সেবার ভাব। আমার কিন্তু প্রথম দর্শন হইতেই এই নখ খারাপটাই বড় উপকার করিয়াছিল, মায়ের মাথায়

তখন কিছুদিন উকুন ছিল, তাও আমার বহু উপকার করি-
 য়াছিল। আমি উকুন বাহিবার উপলক্ষে এবং নখে একটু
 তেল মাখাইয়া দিবার অছিলায় মার স্পর্শ বহুক্ষণ পাইতাম।
 এই উপলক্ষে আমি অনেক সময় মার কাছে থাকিতে পারি-
 তাম, কেহ কিছু বলিতে পারিত না। রাত্রিতে মার শুইবার
 পর সকলে চলিয়া গেলেও আমি নখে একটু তেল দিবার
 অছিলায় হাতখানি নিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম; পরে
 আমাকে যখন দূরে রাখতে লাগিলেন তখন উকুনও চলিয়া
 গেল, হাতের নখও কি রকম ভাল হয়ে গেল। মা এই গল্প
 এখনও সকলের কাছে বলিয়া আনন্দ করিতেছেন। অভয়
 ভাই তাই শুনিয়া গান ধরে, “সাজানের ছলনে আমি সঙ্গ করি”
 ইত্যাদি। এই কথা নিয়া খুব আনন্দ চলে। আজ দুপুরেও
 মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আমি হাতখানি নিয়া বসি-
 য়াছি মা হাসিয়া বলিতেছেন, “জ্যোতিষকে একদিন বলিয়া-
 ছিলাম খুকুনীর জন্মই এই নখ কয়টা এই ভাবে রাখিয়াছি
 ও ইহা নিয়া থাকিতে ভালবাসে।” আমি এই কথা শুনিয়া
 ছল ছল চোখে মার দিকে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম
 জাগতিক সমস্ত স্নেহ প্রেম একত্র হইলেও কি এই ভালবাসার
 তুলনা হয়? কত ব্যাপার ঘটয়াছে প্রতিবারই মনে হইয়াছে
 জগতের কোন মা সম্তানকে এই ভাবের এক কণা ভালবাসাও
 দিতে পারেন না। এই ভালবাসা যে অতুলনীয়। তাই ত
 জগতের কত স্ত্রী, পুরুষ, পাণী, পুণ্যবান নানা ধর্মাবলম্বী

নানা জাতি আজ মায়ের আমার, চরণ তলে আসিয়া দাঁড়াই-
তেছে। এত বড় চিড়িয়াখানার মধ্য দিয়া মা আমার, সব
দিকে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতেছেন। সকলেই মনে করিতেছেন,
“মা”, আমাকেই বুঝি বেশী ভালবাসেন।” কত জনে আবার
অভিমান, রাগে মাকে কত কথা বলিতেছে, মনে হইতেছে
মার মুখ বুঝি আর দেখিবে না। আবার দেখ, দুই চার মিনিটের
জন্ত মার একান্ত সঙ্গ সে পাইলেই তাহার ভাবের আশ্চর্য্য
পরিবর্তন, আবার মাকে ছাড়া সে বুঝি জানে না, এই ভাব
প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীযুক্ত মনুখ দাদার ছেলে জ্যোতি (নরসিং)ও আসি-
য়াছে। সে সেদিন বেশ বলিতেছিল, “মাকে যে আমরা রাগ
করিয়া যাহার যাহা খুসি বলি কিছুমাত্র ত্রুটি করি না, তাহার
কারণ এই যে আমরা বেশ জানি যাহা কিছুই বলি বা কেন
মার রাগও হইবে না আমাকে কিছু বলিবেনও না যাহা খুসি
তাই বলিয়া যাই।” এই ভাবে নিজের বাপ মাকেও কেহ
বলিতে সাহস পাইবে না কারণ সেখান হইতে এই ভাবের
একটা প্রতিধ্বনি আসিবে ভয় আছে, এখানে যে কোন ভয়ই
নাই। কিছুতেই মার স্নেহমাখা সদানন্দময়ী ভাবের কোন
পরিবর্তন হয় না।

বেলা তিনটা বাজিল, আমাদের যাওয়ার সময় হইয়া
আসিল। যদিও জানি কয়েকদিন পর মার কাছে কিরিয়া
আসিব তবুও মার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে এই ভাবিয়া

প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, যথাসাধ্য নিজের এই ভাবটা ভিতরে চাপিয়া মার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। মাও “যাওয়া নাই আস গিয়া” বলিয়া সান্ধনা দিলেন। কথ্যা আশ্রমের মেয়েরা এবং তাহাদের দেখিবার জন্ত মুর্সোরী হইতে যিনি আসিয়াছেন ইন্দু দিদি এবং মাসিমা ও নিশি বাবু দেৱাছন আশ্রমে থাকিবেন স্থির হইয়াছে। মা আমাকে বলিলেন “তুই গিয়া মেয়েদের আশ্রমে রাখিয়া আয়” তাই আমরা বেলা ৪টার ট্রেনে দেৱাছন চলিলাম।

দেৱাছন পৌঁছিয়াই আশ্রমে দুই চার মিনিট থাকিয়া মার আদেশ পালন করিয়া তখনি আবার দেৱাছন একসুপ্রেস ধরিবার জন্ত স্টেশনে চলিলাম। ৭১ টার ট্রেন ধরিয়া ৯১ টার হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছিলাম। দেখিলাম আমাদের জন্ত স্বামী অখণ্ডানন্দজী, মনমথ দাদা, যতীশ দাদা, সাধন ও সদানন্দ স্টেশনে আসিয়াছেন। আমরা এই ট্রেনেই খেওড়া রওনা হইতেছি। আশুও আমাদের সঙ্গে কলিকাতা চলিল।

১৮ই আশ্বিন বুধবার :—

ট্রেনে আশুর সঙ্গে অনেক কথা হইল। মা তাহাকে আসিয়া কয়েক মাসের শিশু দেখিয়াছেন। মায়ের স্নেহে, যত্নে সে মানুষ হইয়াছে। আশুর কয়েকটি কথা এখানে লিখিতেছি, আশু বলিতেছে “আমার বরাবরই একটা ধারণা ছিল, মার (খুড়িমা কেই মা বলিতেছে), কাছে যতই লোক আসুক আমাদের উপর মার ভাবের নিশ্চয়ই একটু পার্থক্য

আছে, কিন্তু যতই মাকে দেখিতেছি আমার সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা বুঝিতেছি, মার নিকট সবই সমান একটুও পার্থক্য নাই, ইহা দিন দিনই বুঝিতেছি, আমার এত দিনের ধারণা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাকার মৃত্যুর পর মাকে দেখিতে যখন দেয়াতুন গেলাম তখন মার ভাব দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, আমার কাকীমাই যে এই মা ইহাই যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। কাকার মৃত্যুর কথা মা যখন বলিতেছিলেন এবং মার ভাব দেখিয়া আমার পূর্বের কাকীমার ব্যবহার-গুলি, কথা, বার্তা, সব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। দেখিতেছিলাম ইহার কাছে সব সমান একটুও পার্থক্য নাই। অথচ কত স্নেহ যত্ন আমরা পাইয়াছি, তখনও ত্রুটি দেখি নাই আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে কি পরিবর্তন! যেন সেই আর এই, ধারণাই হয় না। অথচ আজও স্নেহ পাইতেছি কিন্তু তাহা যেন আর এক রকমে। যতই ভাবি আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই।” আরও বলিল, “আমার শাহবাগের একটা কথা মনে হইতেছে। যখন লোকজন সব আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, একদিন মা চৌকির উপর বসিয়া আছেন, আমি কাছে দাঁড়াইয়া রাগ করিয়া বলিতেছি, ‘এত লোকজন আমার ভাল লাগে না, বাহিরের লোক সব আসিয়া দিন রাত গোলমাল করে আমার এসব ভাল লাগে না।’ মা আমার দিকে না চাহিয়াই উঠিয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে বলিলেন, “এই কি? আরও কত আসিবে।” এই কথাগুলি

এখনও আমার কানে বাজিতেছে।” আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম, “তবেই দেখ মার চোখের উপর সবই খেলিতেছে, অথচ সেই অবস্থায়ও নিখুঁত ভাবে বধূত্বের অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। তোমার মা কি তোমরা কেহই, কোন ত্রুটি পাও নাই। পূর্ণ না হইলে কি কেহ এভাবে অভিনয় করিয়া যাইতে পারে? যেন ইচ্ছামত সকলকে নিয়া খেলিতেছেন।” আশুও সম্পূর্ণভাবে আমার এই কথার সমর্থন করিল। আরও বলিল, “কত দেখিয়াছি রান্না করিতে গিয়াছেন, শরীর একেবারে বাঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতেছে, কোন রকমে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন তারপর মাঝে মাঝে আমাকে হয়ত বলিয়াছেন, “ভাতটা নামাইয়া নে”—আমি ভাতে ভাত করিয়া খাইয়া স্কুলে গিয়াছি।” এসব কারণে আমাকে বলিয়াছেন আমার মার কাছে যাইতে, কিন্তু আমি খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হই নাই, বলিয়াছি আমি পাস্তাভাত খাইয়া স্কুলে যাইব তবুও আমি যাইব না।” এক দিন দুই দিন হয় ত চলিল তিন দিনের দিন দেখি খুড়ীমা কোন রকমে উঠিয়া গিয়া আমার জন্য কিছু পাক করিয়া রাখিয়াছেন।” মার নিখুঁত ভাবে কর্ম করিবার আরও কিছু গল্প শুনিলাম, যখনই যাহা শুনি তাহাই আশ্চর্য ও অপূর্ব। অথচ অন্যান্য সকলের মত, এই আশুও মার কোন ব্যবহার দেখিয়া, নিজের বুদ্ধির দ্বারা তাহার বিচার করিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে কালই কত কথা বলিয়াছে, তখন

মনে হয় মার বুঝি মুখ আর দেখিবে না। তারপর খানিক সময় মার একান্ত সজ্জা পাইয়াছে, এবং ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে বিচার আসিয়াছে; আজই সে বলিতেছে, “মাকে বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই।” এক আশ্চর্য্য জিনিষ। আজীবন স্বজনেরা কেহ কেহ মাকে নিজেদের আজীবন মনে করিয়া যখন দুই চার কথা বলে আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবি কেহই মাকে চিনিলাম না।” এই সব কথায় আমাদের সময় বেশ আনন্দেই কাটিতেছে।

১৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার :—

কথা হইয়াছে, মা ১১ই অক্টোবর হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া এলাহাবাদ যাইবেন। তথায় দুই দিন থাকিয়া ১৫ই অক্টোবর কলিকাতা রওনা হইবেন। ১৬ই কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

আমরা আজ প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিলাম, শ্রীযুক্তা সংজ্ঞা দেবী খবর পাইয়া স্টেশনে ছিলেন। মার ভক্ত প্রেম-গোপাল ও (মৌলানা সাহেব), আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সংজ্ঞা দিদির যত্নে ও সেবায় পথশ্রম দূর করিয়া, আশ্রয় ঘণ্টার মধ্যেই হাওড়া হইতে শিয়ালদহ গিয়া চট্টগ্রাম মেল ধরলাম। সন্ধ্যায় চাঁদপুর এবং রাত্রি প্রায় ২৥ টায় কসবা পৌঁছিলাম। এই স্থানেই মার পিতামহী পৌত্র প্রার্থনা করিতে আসিয়া পৌত্রী প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন। স্টেশনের অতি নিকটেই সেই বিখ্যাত কালী মন্দির। এইসব স্মৃতিতে প্রাণটা

ভরিয়া উঠিল। উদ্দেশে ৬কালী মাকে প্রণাম করিয়া আমরা নৌকার উদ্দেশ্যে চলিলাম। এক মাইল গিয়া নৌকা ধরিতে হইবে। গ্রাম্যপথ, জ্যোৎস্নায় চারিদিক যেন খল খল করিয়া হাসিতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ, সব নিস্তব্ধ, আমি যোগেশ দাদা ও প্রেমগোপাল একটি কুলির ঘাড়ে কম্বলাদি চাপাইয়া তাহার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিলাম। ঘাটে আসিয়া দেখি বহু নৌকা দাঁড়াইয়া আছে। একখানা নৌকা ঠিক করিয়া আমরা খালের ভিতর দিয়া খেওড়া গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। মার বিরহে প্রাণটা যেন এক একবার বিকল হইয়া পড়িতেছে, আবার মায়ের কাজে যাইতেছি এই ভাবনায় মনে একটা আনন্দও জাগিতেছে। মার জন্মস্থান বর্তমানে মুসলমানদের অধিকারে আছে, তাই প্রেমগোপাল চলিয়াছেন, তাহাদের মায়ের কথা ভাল করিয়া জানাইতে, এবং সেই স্থানটার একটু বিশেষ স্মৃতিরক্ষা করিতে। মার প্রতি প্রেমগোপালের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি, মার কাজে লাগিতেছে ভাবিয়া তাঁহার মহা আনন্দ। কত সময় মাকে স্বপ্নে দেখার কত গল্প বলিতেছেন। প্রেমগোপাল মক্কা, মদিনা করিয়া আসিয়াছেন। তাবটা চমৎকার, সত্য জিনিষ ধরিতে চায়, তাই মার প্রতি এই ভাব। তারাপীঠ ও কলিকাতায় মুসলমানরা, ইহাকে হিন্দুদের মাতাজীকে মানে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিল, কিন্তু ইনি তাহাদের কাছে ধর্মের প্রকৃত

তব্বের বক্তৃতা করিয়া সকলকে চুপ করাইয়া দিয়াছিলেন।
মাকে কলিকাতায় মসজিদেও নিয়া গিয়াছিলেন। প্রাণের
সত্য ভাব লইয়া ইনি কথা বলেন তাই ইহার কথাগুলি বেশ
মর্মান্বশী হয়।

আমরা ২১৩ বর্টার মধ্যেই গ্রামে পৌঁছলাম। তখনও
অন্ধকার একেবারে যায় নাই। মায়ের জন্মস্থান, আমাদের
নিকট ইহার অণুপরিমাণু পবিত্র। আমি এ গ্রামে দুইবার
আসিয়াছি কিন্তু অল্প সময় ছিলাম, তাই বিশেষ চিনি না।
ঘাটে এক গৃহস্থ পরিবার তাহাদের আত্মীয়দের নৌকায়
তুলিয়া দিতে ঘাটে আসিয়াছেন। হাতে লণ্ঠনটি আছে।
আরও একটি মুসলমান খালের ভিতর মাছ ধরিতেছিল।
আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করিল, আমরা
বলিলাম, “আনন্দময়ী মায়ের নিকট হইতে আসিয়াছি;”
শুনিয়াই সকলে মহা যত্নের সহিত আমাদের উঠাইয়া নিয়া
চলিল। দেখিলাম মা সব স্থানেই বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া
রাখিয়াছেন। এই গৃহস্থ পরিবারটি লণ্ঠন নিয়া ঘাটে হাজির
না হইলে অন্ধকারে একটু অসুবিধা হইত, কিন্তু তাহাও ভোগ
করিতে হইল না। আমরা ৬লক্ষীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের
বাড়ী চলিলাম; ভট্টাচার্য মহাশয়ের দুই ছেলে বর্তমান।
একটি বাড়ীতেই আছেন, নাম শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র ভট্টাচার্য
দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামে চাকুরী করেন, নাম শ্রীযুক্ত ললিতমোহন
ভট্টাচার্য। এই ললিতবাবুই কল্লবাজার দীনবন্ধু বাবুর

বাসায় ছিলেন। তখনই তাঁহার সহিত খুব পরিচয় হয়। মা ইহাদের ছোটবেলায় দেখিয়াছেন। মার মুখে শুনিয়াছি এই বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময় প্রতি বৎসরই মাকে ৩দুর্গা পূজার সময় আদর করিয়া ষষ্ঠী দিন নিয়া আসিত এবং ৩পূজার তিন দিন মা এই বাড়ীতেই থাকিতেন। ৩দাদা মহাশয়ের মাতুল বাড়ী এই গ্রামেই কিন্তু সেই বাড়ীটি গ্রামের এক পাশে ছিল।

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার :—

আমরা আসিতেই সকলে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের অনেকেই চিনিলেন। একটু করশা হইতেই আমরা মার জন্মস্থানটিতে প্রণাম করিতে চলিলাম। এবার গ্রামের ভিতর বেশ জল আছে, তাই আমাদের নৌকায় একটু যাইতে হইল। প্রেমগোপাল ও যোগেশ দাদা এ স্থানটি আর দেখেন নাই। সকলে মিলিয়া ঐ স্থানে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। অখিল বাবু এবং তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা বামাচরণবাবু প্রভৃতি ৩৪ জন আমাদের সঙ্গে গেলেন। খানিক পরেই আমরা ফিরিয়া আসিলাম। কথা হইল লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহার নামের একটু জমি আমাদের আশ্রম করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতেছেন। এই স্থানটিও, মা গতবার দেখিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন, “পুকুরের ধারে এই স্থানে আমি কত খেলা করিয়াছি।” আমাদের নিকট এই স্থানটিও অমূল্য। আমরা আনন্দের সহিত এই স্থানটিতে

আশ্রম করিতে রাজি হইলাম। ৩দাদা মহাশয়ের মাতুলালয়টি এখন মুসলমানের অধিকারে আছে, তাহা আশ্রমের জন্য নেওয়ার অনেক বাধা আছে, তাই আমরা গ্রামের মধ্যস্থানে এই স্থানটাই মনোনীত করিলাম। সকলে আনন্দে এই কাজে যোগ দিলেন।

২১শে আশ্বিন, শনিবার :-

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা, স্থির হইয়াছে আজ রাত্রিতে আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে গ্রামের সকলে মিলিয়া কীর্তনাদি করিবেন। কাল রাত্রিতেও “মা” নাম, কীর্তন হইয়াছে। প্রেমগোপাল ভাই, সেই কীর্তনে এত বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন যে বলক্ষণ মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন তারপর আজ শুনিলাম, কাল সারা রাত্রিই সেই ভাবে তিনি কাঁদিয়াছেন। আজ বলিতেছেন, “আমার প্রাণ যেন আজ আনন্দে বিভোর হইয়া আছে।” ইঁহার বাড়ী দিল্লী, জীবনে একবার নাকি চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন তাই পীমারে উঠিতে হইয়াছিল। কিন্তু মার জন্মস্থান তাই এখানকার জল কাদায় এত অনুবিধার মধ্যেও তাঁহার মহা আনন্দ।

আগামী কলাই আমি কলিকাতায় রওনা হইব ভাবিয়াছি। আশ্রমের ঘর উঠিবে তাই যোগেশ দাদা এখন এখানে থাকিবেন।

অনেকের মুখে মার ছোট বেলার গল্প শুনিতেছি। মধ্যবয়স্কারা বলিতেছেন, “আমাদের সঙ্গে ছোট বেলার নিশ্চল

কত খেলা করিয়াছে।” বৃদ্ধরা ছল ছল চোখে বলিতেছেন, “আমাদের দাদা বলিয়া ডাকিত, কত কোলে পিঠে করিয়াছি, চেহারাখানা বড় সুন্দর ছিল, আর অগ্ন্যাগ্ন ছেলেপেলেদের মত দুষ্ক ছিল না, বড় শাস্ত ছিল ; তাই গ্রামের সকলেই তাহাকে ভালবাসিতাম। কিন্তু আমরা চিনিলাম না।” আমাকে বলিতেছে, “মা, আমরা যেন রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিলাম আর, এখন ভোগ করিতেহ তোমরা। আমরা এমন মাকে চিনিলাম না। আর একবার যদি নিয়া আসিতে পার আমরা চরণ দর্শন করিতাম।” বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সরল ভাবের কত কথাই শুনিতে লাগিলাম। ৩লক্ষীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী সাদাসিধা প্রকৃতির, তিনি বলিতেছেন, “বিপিন ভট্টাচার্য্যের অবস্থা ত খারাপ ছিল, মা যখনই আমাদের বাড়ী আসিত আমি ২।৪ দিন রাখিয়া দিতাম একটু ভাল জিনিষ হইলেই ডাকিয়া খাওয়াইতাম।” আমি বলিলাম, “জানিয়া হউক না জানিয়া হউক, আগুণ নিয়া খেলা করিলেই একটা প্রভাব লাগেই, মাকে যত্ন করিয়াছেন, তাই আজ আপনার জায়গাতেই মার আশ্রমের বন্দোবস্ত হইল।” গ্রামের লোকেও এজগৎ ৩ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নীকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গ্রামের অনেকেই আমার নিকট হইতে অতি আগ্রহের সহিত মার ছবি চাহিয়া নিয়া গেলেন এবং নিয়া পূজার আসনে বসাইলেন।

যরে যরে আজ ৩লক্ষী দেবীর অর্চনা হইতেছে। পূজাদির

পর সকলে মিলিয়া আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া কীর্ত্তন করিলেন। আমরা বাতাসা সন্দেশাদি দিয়া লুট দিলাম। মার ছবি টেবিলে বসাইয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল। খুব আনন্দের সহিত মধ্যরাত্রি অবধি কীর্ত্তন চলিল।

২২শে আশ্বিন, রবিবার :—

মার নিকট হইতে গিয়াছি, তাই অনেকেই আমাদের দেখিতে আসিতেছেন। মার গল্প শুনিতেছেন।

সন্ধ্যা ৬টায় ৮লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে নিয়া আমি খেওড়া হইতে রওনা হইলাম। মার জন্মস্থানটি মুসলমানদের নিকট হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থাদি করিবার জন্ত মোলানা (প্রেম-গোপাল), রহিয়া গেলেন।

২৩শে আশ্বিন, সোমবার :—

আজ রাত্রিতে আসিয়া কলিকাতা পৌঁছিয়াছি। আগামী কল্যাই এলাহাবাদ রওনা হইব স্থির করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের চিঠিতে জানিলাম মা একদিন কণ্ঠল গিয়া, দক্ষালয়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও স্বামী মঙ্গলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রম হইয়া আসিয়াছেন। মা ভালই আছেন।

এখানে আসিয়া দেখি মার আগমনের সব ব্যবস্থাদি হইতেছে। ৫০ | ৬০ জন লোক মার সঙ্গে আসিতেছেন, ভ্রমর, এবং অন্যান্য সকলে মিলিয়া তাহার জন্ত সুবন্দোবস্ত

করিতেছেন। ভ্রমরদের স্কুলে অর্থাৎ রসা রোডে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়েই মার এবং ভক্তদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আমাকে সংজ্ঞা দিদি বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন। কত যত্নই না তিনি করিলেন ! আমি এ সকলের ভিতর মার অসীম করুণাই দেখিতে চেষ্টা করিতাম।

২৪শে আশ্বিন, মঙ্গলবার :—

আজ নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা ২টা বাজিয়া গেল। তারপর ননীদের বাসায় ভিক্ষা নিলাম। সন্ধ্যার পর ৮টায় দিল্লীমেলে এলাহাবাদ রওনা হইব। ননীর নিকট এক গল্প শুনিলাম, সেও এক অদ্ভুত ঘটনা!

সন্ধ্যা ৮টা গাড়ীতে এলাহাবাদ রওনা হইলাম।

২৫শে আশ্বিন বুধবার :—

আজ বেলা ১০টায় এলাহাবাদ পৌঁছিয়া দেখি শ্রীবৃন্দ শিবপ্রসাদ সিংহ এক বিরাট কাণ্ড লাগাইয়াছেন। মা আসিবেন, বেচারী সেই চিন্তায় পাগল। নিজের বাড়ীতে প্রকাণ্ড তাঁবু পড়িয়াছে। সে মহা ব্যস্ত, কি ভাবে মার সেবা করিবে ভাবিয়া ঠিক পাইতেছে না। জীভেন দাদার বাসায় মধ্যাহ্নে ভিক্ষা নিয়া শিবপ্রসাদ বাবুর বাড়ী গেলাম। মা আজ বৈকালে আসিয়া পৌঁছিবেন।

বৈকাল ৫টার গাড়ীতে মা আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি,

জীতেন দাদা ও তাঁহার স্ত্রী প্রয়াগ ষ্টেশনে গিয়া মার দর্শনের জন্ত অপেক্ষা করিয়া ছিলাম। এলাহাবাদ গাড়ী পৌঁছিতেই মেয়েরা মার গলায় মালার বোঝা চাপাইয়া দিল। “জয় আনন্দময়ী মাইকি জয়” বলিয়া ফুল ছিটাইতে লাগিল। হাইকোর্টের জজ ও এডভোকেটদের মধ্যে অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাকে শিবপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতে নিয়া আসা হইল। তাঁবুতে বহু লোক উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পাশ্চ মার বিশ্রামের জন্ত, সকলকে একটু শীত শীত বিদায় করিলেন।

২৬শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার :—

আজ সকাল বেলা ৮টায় মাকে মার তাঁবু হইতে বাহির করিয়া অগ্ন একটা তাঁবুতে নিয়া যাওয়া হইল। শিবপ্রসাদ বাবু তিনটা তাঁবু ফেলিয়াছেন, একটাতে মা থাকিবেন, একটাতে সকলে মাকে নিয়া বসিবেন, আর অগ্ন একটাতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, ডাক্তার পাশ্চ প্রভৃতি মার ভক্তরা অনেকে থাকেন। তাঁহার একটা বাড়ী অগ্ন আরও ভক্তদের থাকিবার জন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাকে নিয়া সকলে বসিলেন। শিবপ্রসাদ বাবু মাকে বেলা প্রায় ৯টায় একটু বেড়াইতে নিয়া গেলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসা হইল। বৈকালে মাকে জজ বাজপেয়ী সাহেবের বাড়ী নিয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখি, তাঁবুতে লোক ধরে না কীর্তনের এক দলও আসিয়াছে। কীর্তন সুরু হইল,

এদিকে এখানকার বিখ্যাত রাইট অনারেবল স্যার শ্রীযুক্ত
 তেজ বাহাদুর সঙ্গ, শ্রীযুক্ত পান্নালাল, আই, সি, এস,
 কমিশনার, ডাক্তার সি, ওয়াই চিন্তামণী, মিটার জাস্টিস্
 বাজপেয়ী, মিঃ জাস্টিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিটার জাস্টিস্ মুন্সী,
 খান বাহাদুর সৈয়দ আবু মহমদ খাঁ, ডাক্তার এন,
 পি, আস্থানা, অনারেবল মিটার পি, এন, সঙ্গ, ডাক্তার
 এল, ডি, বোশী, মিটার এ. এম, খাজা, ডাক্তার তারা
 চাঁদ, মিটার এম, লাহিড়ী, অবসর প্রাপ্ত পোর্ট মিটার
 জেনারেল বেঙ্গল ও আসাম, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ
 প্রায় সকলেই মার দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। খবর
 না দেওয়া সত্ত্বেও আজ লোক সংখ্যা খুব হইয়াছে। রাত্রি
 প্রায় ৮টার মাকে শুইবার তাঁবুতে নিয়া আসা হইল।
 তখনও অনেকে রহিয়া গেলেন তার মধ্যে কমিশনার শ্রীযুক্ত
 পান্নালালও আছেন। তিনি মার সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন।
 মার শরীর দুর্বল বেশী কথা হইল না, তবু দুই চারিটি ভাল
 ভাল কথা হইল। তিনি খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন স্থির করিবার উপায় কি? যাহারা কিছু
 জানে না, গুরুও নাই, তাহারা কি সাধন করবে? তাহারা কি
 করিয়া বুঝিবে তাহার পক্ষে কোনটা দরকার?” মা বলিলেন
 “দেখ, যেমন ছোট ছোট ছেলেদের ইচ্ছা না করলেও তোমরা
 কত যত্নে লিখা পড়া শিখাও, ক্রমে তাহারা বিদ্বান হইয়া
 উঠে, সেই রকম মন বাচ্চাটাকেও তোমরা শিক্ষা দিতে চেষ্টা

কর। মনের যেমন চঞ্চল স্বভাব তেমন স্থিরতাও মনেরই স্বভাব মে চায় প্রকৃত শান্তি তাই এই জাগতিক কোন বিষয়েই সে স্থায়ী শান্তি পায় না—ছুটাছুটি করে।”

“আর গুরু না থাকলেও সাধন ভজনের প্রথম উপায় যার যা’ ভাল লাগে করিয়া যাও। যেমন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তোমরা প্রথমে সব বিষয়ই কিছু কিছু শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর পরে এর ভিতর হইতেই বোঝা যায় তাহার কোন্ দিকে রুচি, সে সেই বিষয়টাই বাছিয়া নেয় এবং অপরগুলি ছাড়িয়া দিয়া সেই পথে চলিতে চলিতেই সে সেই বিষয়ে উন্নতি লাভ করে, তেমনই তোমরা নানা বিষয় প্রথম পড়িতে আরম্ভ কর যেমন, সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, কিছু কিছু কীর্তন, জপ ইত্যাদি এই সব করিতে করিতেই কোন্ দিকে তোমার রুচি, কোন্ পথে তোমার যাইতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন সেই পথ ধরিয়া ধরিয়া চলিতে থাকিবে দেখিবে যাহা দরকার হইয়া যাইবে।”

এই রকম নানা কথা বার্তা হইল। রাত্রি ৯টার সকলকে সরাইয়া মার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইল। মার শরীর দুর্বল, তাই এই রকম ব্যবস্থা করা হইতেছে। সকলেই মহা অনিচ্ছার সহিত এই নিয়ম মানিয়া নিতেছেন, কারণ সকলেই মাকে সর্বদা পাইয়াছেন—মার ঘরের দরজা ত কখনও বন্ধ থাকিত না; দিন রাত সকলে মাকে নিয়া বসিয়া থাকিতেন, শ্রান্তি, ক্লান্তি নাই। আর আজ অতি অল্প

সময়ই সকলে মাকে পাইতেছেন। ডাক্তার পান্থের সহায়তাতেই এই ব্যবস্থা চলিতেছে, নতুবা এই ভাবে নিয়ম মত মাকে রাখা দুর্লভ ব্যাপার হইয়া পড়িত। লোকে যেভাবে মার কাছে বসিয়া থাকে, যে আগ্রহভরা প্রাণে ছুটিয়া আসে, তাহাদের সরাইয়া দিবার ক্ষমতা ছিলনা। ডাক্তার সাহেব শুধু মার দিকে চাহিয়া এই কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই জন্য আমাদের উপর যথেষ্ট গালিবর্ষণও যে না হইতেছে তা নয়। মার সম্বন্ধেও কেহ কেহ কটাক্ষ পাত করিতেছেন। কিন্তু উপায় নাই, তাই সব মাথা পাতিয়া নিতে হইতেছে। ডাক্তার পান্থ কাল মাকে বলিতেছিলেন, “মা সকলকে তোমার দর্শন হইতে বঞ্চিত করায় যে পাপ লইতেছি তাহা হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিও।” মা বলিলেন, “তুমি ত কোন অন্যায় উদ্দেশ্যে কিছু করিতেছ না, তোমার অপরাধ কিছু নাই।”

২৭ শে আশ্বিন, শুক্রবার :—

আজও কমিশনার শ্রীযুক্ত পান্নালাল, তাঁহার মেয়ে, জামাতা প্রভৃতি সকলকে নিয়া আসিয়াছেন। কাল রাত্রিতে মার শুইবার ভাবই ছিলনা তাই আজ মাকে একটু বেশী সময় বিশ্রাম দিয়া বেলা ৯টায় বাহির করা হইল। খানিক সময় বসিয়াই এডভোকেট শ্রীযুক্ত শৈলনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। তথায় মেয়েরা কত ভাবে মায়ের অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। মার কাছে সকলে

মিলিয়া গাহিলেন—“শব্দে শব্দে মঙ্গল গাও জননী এসেছে
 দ্বারে।” সেখানে আধ ঘণ্টা ধানেক থাকিলেন, পরে শ্রীযুক্ত
 হরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় রত্নলাবাদ তাঁহার বাড়ীর দরজায়
 নিয়া গেলেন। সেখানেও তাঁহার ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, মা প্রভৃতি
 সকলেই ফুল, ফল ও মালা নিয়া মার পূজার জন্য দাঁড়াইয়া
 ছিলেন, তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া মা আবার তাঁবুতে
 ফিরিয়া আসিলেন। বহু লোক বসিয়া আছেন।

মার সঙ্গে সকলে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। কথায়
 কথায় মা বলিতেছেন, “এই যে তোমরা কর্ম্ম করিয়া যাও,
 এ যেন ‘রিটার্ন টিকিট’—আবার ফিরিয়া আসিবার বন্দোবস্ত
 করিয়া যাও”—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। এক ভদ্রলোক
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এই যে বলা হয় কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ,
 জ্ঞানযোগ ইহা কি ভিন্ন ভিন্ন পথ, কি একই পথ?” মা
 বলিলেন, “দেখ, আমরা একটা মন্দিরে যাইব, মন্দির সম্বন্ধে
 কিছু জ্ঞান না থাকিলে আমরা যাইতে চাহিতেছি কেন?
 আবার, মন্দিরে যে দেবতা আছেন, তাঁহার উপর আমার
 ভক্তির ভাব না থাকিলেও আমি যাইতাম না, আবার দেখ,
 যাইতেছি যে—ইহা হইল কর্ম্ম, কাজেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম
 সব এক সত্ত্বেই থাকে ভিন্ন ভিন্ন নয়।” আরও অনেক কথা
 হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার শুনিবার অবসর হইল না।
 আগামী কল্যাই মার এখান হইতে রওনা হইয়া যাওয়ার কথা।

আজ বৈকালে মাকে সকলে বেসেন্ট হলে নিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

আবার কমিশনার শ্রীযুক্ত পান্নালাল সপরিবারে আসিয়া মার সঙ্গে একান্তে কি কথা বলিলেন । অনেকেই একান্তে দেখা করিতে চাহিতেছেন কিন্তু সময় নাই বলিয়া, দিতে পারা যাইতেছে না । শ্রীযুক্ত তেজ বাহাদুর সঙ্গর বড় ছেলেও মার সঙ্গে পাঁচ মিনিট একান্তে কথা বলিয়া আসিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ।

বৈকালে মাকে বেসেন্ট হলে নিয়া যাওয়া হইল—বহু লোক একত্র হইয়াছেন, মা দরজায় যাইতে ফুলে ফুলে মাকে ভরিয়া দিলেন, সকলে উঠিয়া মার অভ্যর্থনা করিলেন, দরজায় পা দিতেই কীর্তন আরম্ভ হইল । মাকে নিয়া চেয়ারে বসান হইল । মা সকলের সঙ্গে নীচেই বসিয়া পড়িলেন, পরে সকলে দেখিতে পাইবে না বলিয়া, মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া চেয়ারে বসান হইল । শিবপ্রসাদ বাবু মার সম্বন্ধে একটু বক্তৃতা দিলেন । নাম কীর্তন হইল । লোকে লোকারণ্য । সময় বেশী নাই, তাই মাকে ঘণ্টাখানেক পরই অতিক্রমে বাহির করিয়া আনা হইল । এখানকার বালিকা কলেজের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মাকে নিতে আসিয়াছেন, তথায় যাওয়া হইল—য়েয়েরা নাচ, গান, আরতি ইত্যাদি করিয়া মার পূজা করিল । শিক্ষয়িত্রীগণ মার উপদেশ শুনিতে চাহিলেন, মা বলিলেন, “তোমরা এত লেখা পড়া কর, ঐ দিকের লেখা পড়ায়ও

একটু একটু টাইম দিও, এই আমার আরজি।" হাত জোড় করিয়া হাসি হাসি মুখে যখন এই কথা কয়টি বলিলেন, সকলেই মার আদেশ রক্ষা করিবেন স্বীকার করিলেন। মার মুখের উজ্জ্বল ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল।

রাত্রি ৭৥ টায় আমরা ফিরিলাম। ফিরিয়া দেখি, বহু লোক বসিয়া আছেন। এখানেও খানিক সময় কথাবার্তা হওয়ায় পর ৮টার একটু পূর্বে মাকে বিশ্রামার্থে উঠাইয়া আনা হইল। ডাক্তার পান্ডাই এই কাজে নিযুক্ত আছেন। তারপর প্রায় ৯টা অবধি সকলে কথাবার্তা বলিলেন। তারপর মার বিশ্রামের জন্ত সকলে একে একে বিদায় নিলেন।

২৮শে আশ্বিন, শনিবার :—

আজ সকালে ৯টায় প্রথমে মহারতনের বাসায় পরে ৬জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাগিনেয়ী শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া মাকে ৬জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বন্ধু কিটলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত নিয়া গেলেন। বৃদ্ধ মাকে গলায় ফুলের মালা দিয়া প্রণাম করিলেন। দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সময় অল্প, তাই কয়েক মিনিট তথায় থাকিয়া মাকে অল্প দুই এক স্থান ঘুরাইয়া তাঁবুতে নিয়া আসা হইল। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, ইনিই এখন কিটলী সাহেবের সেবায় নিযুক্ত আছেন। ইনি খুব অমায়িক।

তাঁবুতে কিরিবার পর সকলে মার নিকট বসিলেন; বেলা ১২টা অবধি কথা বার্তা চলিল।

সন্ধ্যার গাড়িতে আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম, ক্টেশনে বহু লোক মাকে তুলিয়া দিতে আসিলেন, তার মধ্যে ছতারীর নবাব, কেপ্টেন স্মার আহমদ সৈয়দ খাঁ, মিষ্টার জাস্টিস ভান্সা, মিষ্টার জাস্টিস বয়নী, মিষ্টার জাস্টিস মুন্না, খাঁন বাহাহর সৈয়দ আবু মহম্মদ, মিষ্টার পান্নালাল আই, সি, এস এবং ডাক্তার ডি, এল যোশী প্রভৃতি সকলেই ছিলেন।

২৯শে আশ্বিন রবিবার :—

আজ প্রাতে আমরা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ক্টেশনে বহু ভক্তবৃন্দ ফুলের মালা ইত্যাদি নিয়া মার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মা গাড়ী হইতে নামিতেই ভক্তবৃন্দ আনন্দময়ী মাতার জয়ধ্বনি দিল এবং ফুলে ফুলে মাকে সাজাইয়া প্রায় ঢাকিয়া দিল। আমরা দেশবন্ধু বালিকাস্কুলে, ১০০ নং রসা রোডে আসিলাম। গাড়ী দরজায় আসিতেই কীর্তন ও শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনিতে মায়ের আগমন সংবাদ প্রচার করিল। দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইয়াছে। মার জন্ম নির্দিষ্ট ঘরে ভ্রমর মাকে নিয়া আসিল। কত যত্নেই মার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। দ্বারে দ্বারে মঙ্গল কলসী ও কলাগাছ বসাইয়াছে। কীর্তনের জন্ম অতি সুন্দর প্যাণ্ডেল তৈয়ার হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় মাকে তথায় নিয়া যাওয়া হইল। লোকে লোকারণ্য—মার শরীর অমুস্থ তাই মাকে এত ভীড়ে বেশী সময়

বাহিরে রাখা যাইতেছে না, দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইতেছে। তাহাতে সকলে বড়ই অস্থির হইয়া পড়িতেছে, আবার কেহ কেহ মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মাকে বেশী সময় বাহিরে রাখা যাইতেছে না। এলাহাবাদে এই জন্য একটা গুজব শুনিয়া আসিয়াছি, যে কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, “আমরা মাকে দেখিতে যাইব না। মা ত ৯টায় বাহির হইবেন, তারপর খানিক সময় দরবারে বসিলেন আবার চেলারা উঠাইয়া নিয়া তাঁবুর ভিতর নিয়া গেল। এমন মার কাছে আমরা যাইতে চাই না” ইত্যাদি ইত্যাদি। যাক; এখানেও এত কথা বার্তার মধ্যে আমরা মাকে অনেক সময়ই ঘরে বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। কি করিব, উপায় নাই।

আজ অধিবাস হইল। সকলে মিলিয়া মধ্যস্থলে অতি সুন্দর মঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছেন। তার চারিদিকে সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিলেন। সিমলা-দিল্লীর ভক্তদের কীর্তন বড় সুন্দর, তাহা দেখিয়াই আমার ইচ্ছা হইয়াছিল ইহাদের নিয়া, বাংলা দেশের মার ভক্তরা, সকলে মিলিয়া কীর্তন করিলে বড়ই আনন্দ হইবে। তাই এই ব্যবস্থা। দিল্লী, সিমলার ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঢাকা, বহরমপুর, জামসেদপুর প্রভৃতি সব স্থান হইতেই ভক্তেরা আসিয়াছেন। আগামী কল্যা অহোরাত্র নাম হইবে।

৩০শে আশ্বিন, সোমবার :—

আজ অহোরাত্র নাম চলিতেছে, সকলের কত আনন্দ

তাহা বর্ণনাভীত, মার সম্মুখে সকলে একত্র হইয়াছেন। মার সঙ্গেও অনেকে আসিয়াছেন। মহারতন, জীতেন দাদার স্ত্রী, বাবু শিব প্রসাদ সিংহের স্ত্রী, ভাতৃবধু, কন্যা, জামাতা, ভাগিনেয়গণ সকলেই এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। মহানন্দে সকলে কীর্তনে যোগ দিতেছেন। মাকে মধ্যে মধ্যে নিয়া প্যাণ্ডেলে বসান হইতেছে। দুপুরে ভোগ হইল, মাকে বসাইয়া আরতি ও কীর্তনাদি করা হইল। নানা ভাবে শুধু আনন্দ চলিতেছে। একবার মা বাহির হইলে মার পায়ের ধূলা নেওয়ার জন্য এত লোক তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে যে শরীর রক্ষা করা দায়। অতি কষ্টে যুবকের দল মার শরীর রক্ষা করিতেছে। সে এক ভয়ানক কাণ্ড! আজ সন্ধ্যায় মার একটু ভাবাবস্থা হইয়া পড়িল। মাকে কীর্তন হইতে আনিয়া একটু বেড়াইতে নিয়া যাওয়ার জন্য আনিতেই রাস্তায় মার শরীর এলাইয়া পড়িল। মা কীর্তনে একটু সময় সকলের সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন। ডাক্তার পান্থই মার বিশ্রামের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। তাহাতে তাহার উপরও সকলে চটিয়া যাইতেছেন, কারণ মাকে পাইতেছেন না। সবই এক আনন্দ। একদিন মা বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মতই ডাক্তার পান্থের নির্দিষ্টমত বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িলেন। তার পরদিন হইতে বাহির হইতে ভক্তদের কাতর অহ্বানে আর মা থাকিতে পারিলেন না। নিজেই ঘরের দরজা খুলিয়া অনেক সময় বাহির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর দুর্বল, কিন্তু

সেদিকে খেয়াল নাই। আজ রাত্রি ১১টার পর মা বাহির হইয়া পড়িলেন, ডাক্তার ১০টায় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মা বাহির হইতেই ভক্তদের মহা আনন্দ। এতক্ষণ তাহার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। মাকে না পাইয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন। মা-ও মহানন্দে সকলের সঙ্গে খানিক সময় কীর্তনে ঘোরাফিরা করিয়া রাত্রি প্রায় ২টায় বিশ্রাম করিতে আসিলেন। ডাক্তার পান্থ শুইয়াছিলেন। ছাতে তাহার কাছেও গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া উঠাইয়া বলিলেন, “গুপ্ত ভাবে কিছু করিতে নাই, তাই তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি আমি বাহির হইয়াছি।” ডাক্তার পান্থও প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মাতাজীর যাহা ইচ্ছা।”

১লা কার্তিক, মঙ্গলবার :—

আজ ভোরে অহোরাত্র কীর্তন সমাপ্ত করিবার জন্ত নগর কীর্তনে বাহির হইল। খানিক পরে সকলে প্যাণ্ডেলে ফিরিয়া দধির ভাণ্ড ভাজিলে, বৈষ্ণবদের রীতি অনুযায়ী সব করিয়া, কীর্তন সমাপ্ত করিবার পূর্বেই মেয়েরা “মা মা” কীর্তন শুরু করিল। প্যাণ্ডেলের এক ধারে মালা চন্দনে সকলে সাজিয়া কীর্তনে বসিয়া গেলেন। মাও বসিয়া আছেন। প্রভাতে নাম বড়ই মধুর শুনাইতেছিল। বিশেষতঃ নামে সকলেই রাত্রি জাগরণ করিয়া আছেন। উদয়াস্ত সঙ্কল্প করিয়া মেয়েরা বসিয়াছেন। ঢাকার মেয়েরা প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে কীর্তন করিয়া, কীর্তন বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। ঢাকা

হইতে মেয়েরা অনেকেই আসিয়াছেন। আজও দুপুরে অতি সুন্দর ভাবে মেয়েরা একত্র হইয়া মাকে ভোগ দিলেন, আরতি করিলেন, মার ভোগের সম্মুখে মাকে বসাইয়া চারিদিকে সকলে অনেকক্ষণ কীর্তন করিলেন। ভ্রমর চণ্ডী হইতে দেবীর স্তোত্র পাঠ করিল। মেয়েরা সকলে মিলিয়া মায়ের স্তোত্র পাঠ করিল। এই ভাবে প্রায় ১১ ঘণ্টা মায়ের অর্চনা চলিল। তারপর মার বিশ্রামের জন্য মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সন্ধ্যায় মেয়েদের কীর্তন শেষ হইল। মার দর্শনের জন্য এত লোক একত্র হইছে যে এত বড় স্কুল-বাড়ী খানা এবং এত বড় প্যাণ্ডেলেও লোক ধরেনা। বহু লোক প্রতিদিন প্রসাদ পাইতেছেন।

আজও রাত্রি ১০টায় মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ডাক্তার পান্থ গিয়া শুইয়া পড়িলেন কিন্তু তারপর মা উঠিয়া বাহির হইলেন। প্যাণ্ডেলে অতি চমৎকার কীর্তন হইতেছিল, ছেলেরা মনে করিতেছিল, দেখি, মা এই কীর্তনে কি করিয়া ঘরে থাকেন? সত্যি মা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মত ছুটিয়া—“কীর্তন শুনি গিয়া”—বলিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া একেবারে প্যাণ্ডেলে গিয়া বসিলেন। সকলের মহা আনন্দ, তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। আজও মা রাত্রি প্রায় ২টায় শয়ন করিলেন, দুর্বল শরীর কিন্তু সকলের ভিতরই যে একটা শুদ্ধ ভাব চলিতেছে তাহাতেই মার মূর্তি উজ্জ্বল। আনন্দের বিরাম নাই, দিন রাত কোথা দিয়া যাইতেছে কাহারও খেয়াল নাই। কোথাও

রান্না খাওয়া দাওয়া চলিতেছে, কোথায়ও কীর্তনের আনন্দ চলিতেছে, আবার মায়ের দরজায় দলে দলে লোক বসিয়া মার দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এই ভাবে আনন্দ চলিতেছে।

২রা কার্তিক, বুধবার :—

আজ বিশ্রামের জন্ত মাকে ছুপুরে বিল্লার শিব মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। বেলা প্রায় ৪টা টায় তথা হইতে ফিরিয়া আসা হইল। মা ঘরে শুইয়া থাকেন তাহাতেও শান্তি, কিন্তু আজ মা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়, সকলে যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, মাকে মোটর হইতে নামাইয়া আনা দায় হইয়া উঠিল। জনসঙ্ঘ তৈলিয়া রাখা বাইতেছে না। মার দর্শনের জন্ত, চরণ ধুলার জন্ত, সকলে মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অথচ মার শরীর দুর্বল বলিয়া মাকে বাহিরে রাখা বাইতেছে না। এই ভাবেই চলিতেছে।

৩রা কার্তিক বৃহস্পতিবার :—

আজ মাকে বেলা ৯টা-৯টা টায় দক্ষিণেশ্বর নেওয়া হইল। সকলকে খবর জানান হইল না, তাই ভীড় কম হইল। গঙ্গার ধারে শ্রীশ্রীমা যেখানে থাকিতেন, সেই মন্দিরে মাকে নিয়া যাওয়া হইল, ভক্তদের সেখানেই প্রসাদের ব্যবস্থা করা হইল। খোলা স্থান, গঙ্গার ধারে মাকে নিয়া সকলে বেশ আনন্দ পাইলেন। বেলা প্রায় ২টা টায় শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু ও ভ্রমর মার কাছে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চবটীতে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। তথায়ও সুভাস বাবুকে বসান হইয়াছে।

মাকে ইনি আর কখনও দেখেন নাই। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত গুপ্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, দেশের কাজে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?” মা উত্তর দিলেন, “বাস্তবিক সেবার ভাব জাগিলে সেই পথ দিয়াও ভগবানকে পাওয়া যায়”—এই বলিয়া স্নাতক বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করিতেছ, কেন করিতেছ?” তিনি ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, “আনন্দ পাই”। মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, ইহা কি নিত্য আনন্দ, না খণ্ড আনন্দ?” শ্রীযুক্ত বনু মহাশয় বলিলেন, “তা’ত বলিতে পারি না।” মা হাসিয়া বলিলেন, “এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটিও একটু করিও বাবা। যদিও তোমরা বলিতে পার, ‘এই কাজ ত নিজের জন্ত করিতেছি না, সকলের উপকারের জন্ত’—কিন্তু আমি বলিব”—এই বলিয়াই আবার বলিতেছেন, “তোমরা যাহা বলাইতেছ তাই বলিতেছি, আমি ত লেখা পড়া কিছু জানি না,—তবে বলা হয়, এই যে সবই, নিজের জন্ত। সকলেই সেই এক অখণ্ড আনন্দই চাইবে। কেন চায়? না, সেই রসটা আমাদের জানা আছে বলিয়াই ত আমরা আবার চাইছি। তবে তোমরা বলিতে পার যে—‘এইসব করিয়া কি হইবে?’ কিন্তু বলা হয় যে, বাস্তবিক যদি এই দিকের কাজ করা যায়, নিজেকে নিজে জানতে পারে, তবে তাহা দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার স্বভাবতঃ হইয়া যায়। যেমন এম, এ, বি, এ, পাশ করিয়া প্রফেসাররা কত মুখকে বিদ্বান করিয়া দিতেছে।” মা হাসিয়া

বলিতেছেন “বাবা, তুমি ত কত জায়গায় বক্তৃতা টক্কৃত্তা দেও, এখানে কিছু বল না বাবা, আমরা শুনি।” শ্রীযুক্ত স্মৃভাস বাবু বলিলেন, “আমি কি এখানে শোনাতে এসেছি, আমি এসেছি শুন্তে”। মা অমনি হাসিয়া বলিলেন, “তবে এই মেয়েটা যা’ বলবে একটু শুন্বে বাবা ?” তিনি বলিলেন, “চেষ্টা করব।” মা বলিলেন, “শুধু বাহিরের দিকে লক্ষ্য রাখিও না বাবা, একটু ভিতরের দিকেও লক্ষ্য করিও, তোমার ত শক্তি আছে।” তিনি বলিলেন, “সেই পথ কি ?” কিন্তু অনেক লোক উপস্থিত থাকায় মার মুখ হইতে এই কথার পরিষ্কার উত্তর কিছু বাহির হইল না। অনেক সময়ই দেখিয়াছি যাহার কথা, শুধু তাহার কাছেই পরিষ্কার ভাবে বাহির হয়, সকলের সম্মুখে সব কথা হয় না। কথাবার্তা আর বিশেষ কিছু হইল না। স্মৃভাস বাবু প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। তারপর মা গিয়া গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিলেন। বলিলেন, “গঙ্গার ধারে আসিলে স্নান করিতে হয়।” তখন অনেকেই স্নান করিতে নামিয়া পড়িলেন। ডাক্তার পান্থকেও মা স্নান করিতে বলিলেন। তারপর মাকে নিয়া সকলে নাটমন্দিরে বসিলেন। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কন্যা যুথিকা মাকে ফুলের সাজে সাজাইয়া দিল। স্থান, কাল, পাত্র মিলিয়া বড়ই মধুর লাগিতেছিল। একটি ভদ্রলোক মাতৃবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া রহিল, মার অপরূপ মূর্তি ! কেহ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছে না। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত

স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব লীলা ফিল্মে তুলিয়া রাখিলেন। বেলা প্রায় ৫টায় আমরা দক্ষিণেশ্বর হইতে রওনা হইয়া আসিলাম। মার কথা ও গান রেকর্ডে নিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। স্কুল বাড়ীতে ফিরিবার পথে সেই কাজ করিয়া স্কুলে ফিরিলাম। মার ত বিশ্বাস নাই—হয়ত রেকর্ড করা আরম্ভ হইল, মা চুপ করিয়াই রহিলেন—সেজন্য শচী দাদা ও আমি মার নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলাম যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তিন বৎসরের চেষ্টায় এ কাজ হইল। মাকে মোটরে উঠাইয়া আমরা অনেকে হাত জোড় করিয়া হাতে পায় ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে করিতে মোটর যথাস্থানে আনা হইয়াছিল। বেশ সুন্দর হইল।

স্কুলে ফিরিয়া দেখি মার আসিতে দেবী দেখিয়া সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অসম্ভব ভীড়। মাকে অতি কষ্টে মোটর হইতে প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কীর্তন আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ১০টায় মাকে উঠাইয়া আনা হইল। ঘরে দুই চার জনকে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

মার সঙ্গে নানা কথা হইতেছে, কি কথায় মা বলিতেছেন, “ধর্মশালায় আর কতদিন থাকবে? আপন ঘরে যাবে না? কেমন সুন্দর—আপনিই ঘর, আবার আপনিই যাত্রী, আবার আপনিই পরবাসী, আবার দেখ আপনাতেই আপনি”—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কীর্তন শেষের পূর্বে রাত্রি প্রায় ১২টায় আবার মাকে প্যাণ্ডেলে নিয়া যাওয়া হইল। প্রায় ১২½ টায় কীর্তন শেষ হইল। মা ঘরে আসিলেন কিন্তু নানা ভাবে দুটামী করিয়া রাত্রি প্রায় ২টায় মা শয়ন করিলেন।

৪ঠা কার্তিক, শুক্রবার :—

একটি ঘটনা লিখা হয় নাই, গত পরশু দিন শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মার দর্শনের জন্য তাহার বন্ধু কালী বাবুকে (জমিদার), সস্ত্রীক নিয়া আসিয়াছিলেন। ধীরেন বাবু মাকে পূর্বে অনেকবার দেখিয়াছেন তিনি বলিতেছেন, “মা ইনি আমার পরম বন্ধু এবং আমি যতদূর জানি ইঁহারা বড় ধর্মপ্রাণ, ইঁহাদের পরিবারই খুব ভাল।” মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাড়ী কোথায়?” ধীরেন বাবু বলিলেন “বাগবাজার”। কত লোক কত স্থান হইতেই আসে মা ত এত জিজ্ঞাসা করেন না কিন্তু আজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কয় নম্বর ইঁহাদের বাড়ী?” ধীরেন বাবু বলিলেন, “৬৫নং”। মা অমনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “খুকুনী, এই ‘৬৫নং বাগবাজার’ ১০।১২ বছর হবে বোধ হয় মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল তোর নিকট বোধ হয় লিখা আছে?” তখন আমার মনে পড়িল ২।৩ বারই মার মুখ হইতে “৬৫নং বাগবাজার” এই শব্দ কয়টা বাহির হইয়াছিল। এত লোকের ভিতরও মা তাই ইঁহাদের বাড়ীর নম্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। “এতদিন

পর ৬১নং বাগবাজার আসিয়া হাজির”—এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। তখন ধীরেন বাবু বলিলেন। “মা, ইহাদের বাড়ী পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ইহাদের বাড়ী কয়দিন ছিলেন।”

কলিকাতায় মার আগমনে ১০০নং রসারোডে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে আনন্দের ছড়াছড়ি, সকলেই যেন নেশায় ভরপুর।

ডাক্তার পান্থ মার শরীরের দুর্বলতার জন্য অনেক সময়ই মাকে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিশ্রাম দিতে চেষ্টা করায় দর্শনার্থীর দল মাকে না পাইয়া ভয়ানক গরম হইয়া উঠিল। কেহ কেহ ব্যাকুলতার সহিত মাকে বাহির হইতে ডাকিতে লাগিলেন, মা তারপর হইতে ডাক্তার পান্থকে বলিলেন, “তুমি কিছু বলিও না”। তিনি মার আদেশে আর কিছু বাধা দিলেন না, ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল, এর মধ্যেই যথাসম্ভব মার বিশ্রামের চেষ্টা করা হইল, কিন্তু দিন দিন লোকসংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে বিশ্রাম আর বড় হইত না। হয়ত রাত্রি ১২টায় মাকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে তখন সকলে মিলিয়া প্যাণ্ডেলে কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিল এবং ছেলেরা কেহ কেহ মনে করিতেছে মাকে উঠাইয়া আনা চাই, সত্যই করুণাময়ী মা রাত্রি প্রায় ১টায় দোড়িয়া নীচে নামিয়া একেবারে প্যাণ্ডেলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন ছেলেদের মহা আনন্দ, তাহারা বলিতে লাগিল, “মা আমরা

জানিতাম—এখানে বসিয়া কীর্তন করিলে ও প্রার্থনা করিলেই মা এখানে ছুটিয়া আসিবেনই।” তাহাদের সাধনার সিদ্ধি হইল, আবার মহা আনন্দে কীর্তন চলিল। এই ভাবে মহানন্দে সকলের দিনরাত যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইতেছে কেহ জানিতেও পারিতেছে না। আবার পুরাণে ভক্তেরা লোক বেশী হওয়ায় এবং শরীর খারাপ হওয়ায় পূর্বের মত মাকে না পাইয়া অভিমানে কত কথাই বলিতেছে। এই রকম নানা ভাব নিয়া লীলাময়ীর লীলা চলিতেছে। আজও রাত্রিতে মা সকলকে নিয়া প্যাণ্ডুলেই কাটাইলেন। সকলেরই হাতে মহানন্দ। শচী বাবু প্রভৃতি কয়েকজন সারা রাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া দিলেন।

৫ই কার্তিক, শনিবার :—

আজ মা ঢাকা রওনা হইবেন। ঢাকা হইতেও অনেকেই আসিয়াছেন, সকলে মাকে নিয়া ঢাকায় যাইবেন। কলিকাতার উৎসবে সকলেই যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। সকালে কীর্তন, মধ্যাহ্নে মার ভোগারতি, কীর্তন এবং সন্ধ্যায় কীর্তন চলিয়াছে, সকলে কত আনন্দ করিয়াছেন। এই সাতদিন—দিন রাত উৎসব চলিয়াছে। ভোগেরও বিরাট আয়োজন। জামসেদপুর, বহরমপুর, ঢাকা প্রভৃতি সব স্থানের ভক্তেরা অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আজ দীপাশ্বিতা, ৩কালী মায়ের পূজা; আজ সকলে মিলিয়া মার পূজার আয়োজন করিয়াছেন। বহরম-

পুরের অবনী বাবু শ্রীশ্রীমাকে পূজা করিবেন। অনেকে উপবাসী আছেন, মায়ের চরণে একসঙ্গে সকলে অঞ্জলি দিবেন। ভ্রমর পূজার সব ব্যবস্থা করিয়াছে। সন্ধ্যার পর মার পূজা আরম্ভ হইল। ফুলে ফুলে মাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। মা আসনের উপর শুইয়া পড়িলেন। বাঁশ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে মার শরীরের উপর লোকের ভীড় যাইয়া না পড়িতে পারে। পূজার পরই মাকে নিয়া টেশনে রওনা হওয়া গেল।

৬ই কার্তিক, রবিবার :—

আজ বেলা প্রায় ২৥ টায় আমরা ঢাকা পৌঁছিলাম। অনেকেই মাকে আনিতে নারায়ণগঞ্জ গিয়াছিলেন। মার আগমন উপলক্ষে মঙ্গল কলসী দ্বারা আশ্রম সাজান হইয়াছে। মা মাত্র দুই তিন দিনের জন্ম আসিয়াছেন। সকলে খবরও পায় নাই। যাহারা খবর পাইতেছে ছুটিয়া আশ্রমে মাকে দেখিতে আসিতেছে। ‘ঢাকার মা’, অথচ বলিতে গেলে ঢাকাবাসীরাই মাকে পায় না। আগামী কল্য অন্নকূট হইবে। কালীতে এই তিথিতেই শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণার অন্নকূট হয়। এখানেও শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণাকে অন্ততঃ ১০৮ রকম ব্যঞ্জন দ্বারা ভোগ দেওয়া হইবে।

৭ই কার্তিক, সোমবার :—

আজ অন্নকূট। আজ প্রায় সাত আট বৎসর যাবত এই ভোগ হইয়া আসিতেছে কাজেই সকলেরই জানা, ১০ জন

শ্রীলোক (ব্রাহ্মণ), রান্না করিতে আসিলেন। প্রায় ১৩৬ রকম ব্যঞ্জন দ্বারা শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণার ভোগ হইল। অনেকেই প্রসাদ পাইলেন। আজ মার আগমনের সংবাদ অনেকে পাইয়াছেন। কাজেই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। ইতিমধ্যে মার এক খেয়াল হইল, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “খুকুনি, তোরা ত কন্ডলে আমাকে শুইতে দিস্ তাহাও ত জানোয়ারের লোম, আমার ঠাণ্ডা লাগে তাই আমি চুলের বালিশে শুইব”— এই বলিয়াই হাসিয়া বলিলেন, “কি করিব, আমার যে ঠাণ্ডা লাগে, উহাদের বল্ দেখি আমাকে চুল দিবে কি না।” এই বলিয়া দুই তিনটি বিধবাকে দেখাইয়া দিলেন, দেখিলাম তাহারা মাথায় বেশ তেল দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া আসিয়াছেন, বুঝিলাম এই জন্তই মার এই খেয়ালটা জাগিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বের শচী দাদার বোনের চুল কাটিয়াছিলেন, সেই হইতেই চুলের খেয়ালটা চলিতেছে। বিধবাদের বলায় তাহারা সানন্দে কিছু কিছু চুল দিতে স্বীকৃত হইল। মা শুইতে চাহিয়াছেন এই আনন্দে চুল কাটিবে। দেখিয়া সখবারাও চুল দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, কুমারীরাও দিবে। ভূদেব বাবু বলিলেন, “পুরুষের চুল নিবেন না? আমরাও দিব।” তখন মার আদেশে চারখানা কাঁচি আনা হইল। সখবা, বিধবা, কুমারী ও পুরুষদের পৃথক পৃথক চুল কাটার জন্ত। সকলের চুল কাটার উৎসব চলিল, মা আমাকে দিয়া চুল কাটান স্তরু করিলেন। পঞ্চবটীতে অশোক বৃক্ষের নীচে

সধবাদের, অশ্বখ বৃক্ষের নীচে কুমারীদের, বটবৃক্ষের নীচে বিধবাদের ও পুরুষদের চুল কাটার ব্যবস্থা করিলেন, এই এক উৎসব আরম্ভ হইল। বলিলেন, “সধবাদের চুলের লাল বালিশ, বিধবাদের চুলের সাদা বালিশ, কুমারীদের চুলের হরিদ্রাবর্ণের বালিশ এবং পুরুষদের চুলের...বালিশ হইবে।” মা বলিলেন, “মেয়েদের চুল দিয়া তোষক হইবে, সধবাদের চুল দিয়া বালিশ, বিধবাদের চুল দিয়া পাশ বালিশ হইবে।” অমনি ভূদেব বাবু বলিলেন, “মা আমাদের চুল দিয়া পায়ের বালিশ করিও।” এই বালিশের তত্ত্বও মা কিছু কিছু বলিলেন। চুল কাটার ধুম পড়িয়া গেল, কেহ চারি আনা, কেহ আট আনা, কেহ বার আনা চুল দিতে লাগিল। মা রাত্রিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরের ভিতরে শুইলেন।

মা আজ সকালেই সকলকে নিয়া সিদ্ধেশ্বরী হইয়া আসিলেন। মুক্তাকে দেখিতে তাহার বাড়ীর দরজায় গিয়াছিলেন; মুক্তা অতি গরীব, তার উপর তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, তাই মা নিজেই তাহাকে দেখিতে গেলেন।

৮ই কার্তিক মঙ্গলবার :—

আজও মা ঢাকাতেই রহিলেন। আগামী কল্য রওনা হইবার কথা। মাকে দেখিয়া কাহারও আশা মিটিতেছে না। আবার মাকে কবে দেখিবে এই চিন্তাই সকলের প্রাণে জাগিতেছে। মেয়েরা মাকে নিয়া আজ সারা রাত কীৰ্ত্তনে জাগিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

৯ই কার্তিক, বুধবার :—

কাল সারারাত কীর্তন চলিয়াছে। মেয়েরা বেশ কীর্তন করিয়াছে। রাত্রি ২টায় হিরণ দিদির মেয়ে বেলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে যখন ধরিল—“কৃষ্ণ কানাইয়া, বংশী বাজাইয়া, গউ চরাইয়া হারে রে রে রে রে……”—স্ত্রী কণ্ঠের স্বাভাবিক মিষ্ট সুরে, গভীর রাত্রিতে, ঐ নাম বড়ই মিষ্ট শুনাইতে লাগিল। মা-ও মন্দির হইতে উঠিয়া কীর্তনের ঘরে গিয়া বসিলেন। কাল মার নিকটই মেয়েরা এই নাম-গান শিখিয়াছে। সারারাত নাম-গান অতি সুন্দর ভাবে চলিয়াছে। আজ আর প্রাতে কেহ বাড়ী গেলেন না। কারণ আজ মা ঢাকা হইতে রওনা হইবেন। মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সকলে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ফিরিয়া গেলেন।

১০ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার :—

আজ প্রাতেই কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমরা মার সঙ্গে বিলার শিব মন্দিরে গেলাম। ও, এন, মুখার্জীর ছেলে যামিনী বাবু, মাকে নিজেদের স্থাপিত একটি মন্দিরে নিয়া যাইবার জন্য অনেক দিন হইতেই অনুরোধ করিতেছেন, আজ সন্ধ্যায় তথায় যাওয়া হইবে স্থির হইল; তথায় শ্রীযুক্ত রাম কমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের কীর্তন হইবে স্থির হইয়াছে। আমরা বৈকাল প্রায় ৫টায় বিলার শিব মন্দির হইতে রওনা হইলাম। এলাহাবাদ হইতে বাবু শিব প্রসাদ সিংহ মহাশয়ও আসিয়াছেন। মার কথা, হাসি ইত্যাদি রেকর্ড করিবার

চেষ্টা কয় বৎসর যাবতই চলিতেছিল, এবার সে কার্যটি সম্পন্ন করা হইল। অতি কষ্টে ১০খানা রেকর্ড করিতে যাওয়া হইল, ৫ খানাই নষ্ট হইয়া গেল। আমাদের ত আর পূর্বে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নেওয়া সম্ভব নয়, উপস্থিত মত যা' হইয়া গেল তাই ভাগ্য মনে করিলাম। মা ত আর রেকর্ড করিতে যান নাই, তাই মার নিত্য স্বভাব যাহা, তাই আমরা পাইলাম। মার ত খেয়াল, কখনও হাসি, কখনও কথা, কখনও গান এই ভাবেই রেকর্ড হইল। আমাদের নিকট তাহাই অমূল্য বস্তু। এই কার্যটি সম্পন্ন করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা যামিনী বাবুর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌঁছিলাম। তথায় গণেশ মূর্তিটি বড় সুন্দর। যামিনী বাবু সপরিবারে মা এবং সঙ্গীর সকলের যথেষ্ট সেবা-যত্ন করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহে সেই রাত্রি মন্দিরেই বাস করা হইল।

১১ই কার্তিক, শুক্রবার :—

আজ ভোরে কীর্তনাদি করিয়া আমরা আবার মাকে নিয়া বিলার মন্দিরে আসিলাম। আজই দুপুরের গাড়ীতে নবদ্বীপ যাওয়ার কথা। যামিনী বাবুর বিশেষ আগ্রহে, দ্বিপ্রহরে ভোগের সময় মা আবার তাঁহার মন্দিরে যাইবেন স্থির হইয়াছে। তাই হইল, যামিনী বাবুর বাড়ী হইতেই মাকে ফেঁশনে নিয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে প্রায় ৬০৬৫ জন চলিল। সন্ধ্যায় নবদ্বীপ পৌঁছিয়া হেতমপুরের ধর্মশালায় যাওয়া হইল। মা ধর্মশালায় যাইবার পূর্বেই সমাজ

মন্দিরে গেলেন। তথায় ললিতা সখীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি মাকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “আমার মহাভাগ্য যে মা আজ মেয়েকে দেখিতে আসিয়াছেন” ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাক্তার পান্থ, মায়ের সঙ্গে সখীমার কথাবার্তা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বলিলেন, “আমি এমন সুন্দর মিলন আর দেখি নাই, আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—আনন্দে যেন আমার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল, সবই রসময়। আজ নবদ্বীপবাসই স্থির হইল।

১২ই কার্তিক, শনিবার :—

আজ প্রাতে মেজদি (শচীদাদার বোন মনোরমা), মাকে নিজের তৈরী কাজ দিয়া অতি সুন্দরভাবে কৃষ্ণ সাজাইলেন, কটো তোলা হইল। বেলা ১১টায় আমরা এখান হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ৩ টায় হাওড়া পৌঁছিলাম। তখনই মাকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়া যাওয়া হইল তথা হইতে বিল্লার শিবমন্দিরে গেলেন। তথা হইতে ক্টেশনে যাওয়া হইবে স্থির হইল। আপাততঃ বিদ্যাচল যাওয়া স্থির হইয়াছে। শিবপ্রসাদ বাবুও মাকে বিদ্যাচল নেওয়ার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সকলের মতে বিদ্যাচল যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

রাত্রি ৮টায় বোধে মেলে মার সঙ্গে আমরা বিদ্যাচলে রওনা হইলাম। ক্টেশনে বহুলোক মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া

দিতে আসিয়াছেন। সকলেই মার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

১৩ কার্তিক, রবিবার :—

আজ বেলা ৮টায় আমরা মির্জাপুর পৌঁছিলাম। স্টেশনে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সিংহ, জীতেন দাদা প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাি সব বন্দোবস্ত করিয়া মাকে বিদ্যাচলে নিয়া আসিলেন। কাশী হইতেও বাচ্চুর মা, বাচ্চু আসিয়াছে, মির্জাপুর হইতে কুলদা বাবু, উপেন বাবু প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন।

১৪ই কার্তিক, সোমবার :—

কাশী, মির্জাপুর ও কলিকাতা হইতে আগত ভক্তদের নিয়া মা সকালেই পাহাড়ে একটু ঘুরিয়া আসিলেন। প্রায় ২০। ২৫ জন ভক্ত মার সঙ্গে আছেন। এই পাহাড়ে মাকে নিয়া সকলেই বেশ আনন্দ করিতেছেন।

১৫ই কার্তিক, মঙ্গলবার :—

আজ কলিকাতা হইতে শচী দাদা, যুথিকা, অণু এবং যতীশ দাদার মা ও স্ত্রী আসিয়াছেন। শচী দাদা দুই দিনের ছুটিতে আসিয়াছেন। অন্যান্য সকলে এখানেই থাকিবেন।

আজ মির্জাপুর হইতে এতদেশীয় কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, মার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় কথা হইতেছে, একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এই যে জগতে সকলের কত দুঃখ কষ্ট হইতেছে, তাহার ছাপ বা প্রভাব তোমার উপর কিরূপ হয়?”

মা উত্তর দিলেন, “দেখ, তুমি এখানে বসিয়া আছ পাহাড়ে কত লোক আসিতেছে যাইতেছে, কত কি হইতেছে তুমি শুধু দেখিয়া যাইতেছ, “দ্রষ্টা”। ইহাও একদিকের কথা।” এই বলিয়া চুপ করিলেন।

পরে রাত্রিতে শুইতে যাইয়া এই সম্বন্ধে একান্তে আমাকে বলিতেছেন, “দেখ, সব সময় সব কথাত বাহির হয় না। ওরা তখন যে বলিল জগতের সুখ দুঃখের প্রভাব কিরূপ ভাবে তোমার মধ্যে পড়ে? কথা কি জানিস? নিজের শরীরের হাত, পা বা যে কোন অংশ যেমন দেখি, নাড়ি চাড়ি, ঠিক সেই রকম আর কি। কেহ এই শরীরটা—তোদের দৃষ্টিতে হিংসা করিলে, গালাগালি দিলে কি রকম হয় জানিস? যেমন নিজের নখেই নিজের শরীরে আঁচড় লাগে। কাজেই কাহার উপর রাগ হইবে, আবার আঁচড়েরও কোন প্রশ্ন নাই। এক ছাড়া ত দুই নাই। আবার ‘আমি-তুমি’ যদি বলিস্ তবে কি রকম হয় জানিস? তিনিই সর্বরূপে আছেন, এইরূপে তিনিই হিংসা করিতেছেন। কাজেই দুঃখের-রাগের কারণও কিছু থাকিতে পারে না।” আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, “সবই দরকার কিছুই উপেক্ষা করিতে নাই। দেখনা প্রথম কোন গাছ বা লতা উঠাইতে হইলে কতকগুলি আগাছার বা শুকনা ডাল ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়। সেইগুলির সাহায্যে গাছ বা লতা বড় হইতে পারে। পরে কিন্তু সেই গাছ বা লতা হইতে কত ফল ফুলের সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয় সবই

দরকার। আবার দেখ, সময় না হইলে কিছু হয় না, দেখ, না, বীজ পুতিয়া যতই যত্ন কর সময়ের অপেক্ষা করিতেই হইবে। টানিয়া ত আর গাছ উঠাইতে পার না; তুমি শুধু সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরিয়া সেবা করিয়া যাইবে। তবেই যথাসময়ে গাছ এবং ফল ফুল সব পাওয়া যাইবে; সাধনার প্রধান অঙ্গই হইল ধৈর্য্য।”

এর মধ্যেই একদিন, একান্তে আমাকে বলিতেছিলেন, “কত অবগতাই না এই শরীরটার ভিতর হইয়া গেল। দেখিতাম কি জানিস্? তোদের মুখে যে শুনি কত দেব দেবীর মূর্ত্তির কথা—সেই সব এই শরীরটা হইতেই যেন কেমন কেমন করিয়া প্রকাশ হইতেছে, আবার এই শরীরটাতেই মিলাইয়া যাইতেছে। কি যে সব হইত। সে সব মূর্ত্তি কি রকম তাহা তোদের বুঝাইতে পারিব না।” আমি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। শিশুর মত সরল ভাবে হাসিতে হাসিতে এইসব বলিয়া যাইতেছেন।

এবার কলিকাতায়, শ্রীরামপুরের গোবর্দ্ধনের মা আসিয়া-ছিলেন, তিনি বলিলেন “একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে; কিছুদিন হইল গোবর্দ্ধনের একটি ছেলে মৃতপ্রায় হওয়ায় তাহাকে বাহিরে আনা হইয়াছে, শ্মশানে নিয়া যাইবার জন্য লোকজন সব প্রস্তুত। এর মধ্যে গোবর্দ্ধন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে, “মা আনন্দময়ী, এবার তোমার প্রভাব দেখাও আমার পুত্রকে বাঁচাও মা।” কি আশ্চর্য্য খানিক পরেই ছেলের

একটু একটু শ্বাস বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে ছেলে বাঁচিয়া গেল। আমার ৬০ বৎসর বয়সের মধ্যে এইরূপ ঘটনা আমি আর কখনও দেখি নাই। এই অবস্থা হইতেও যে বাঁচে ইহা হয়ত কেহ কখনও দেখেন নাই।” এই ঘটনাটি লিখিবার জন্য গোবর্দ্ধনের মা বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় উৎসবের সময় ৩তারাপীঠ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয় আসিয়াছিলেন তিনিও একটি ঘটনা পুস্তকে দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া যান। ঘটনাটি এইরূপ বলিলেন—“কয়েক বৎসর পূর্বের শ্রীশ্রীমা যখন একবার ৩তারাপীঠ যান তখন বহু ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গে ছিলেন। একদিন আনন্দময়ী মায়ের প্রসাদ রিতরণ হইতেছে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয় প্রসাদ গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন কারণ তন্ত্রে আদেশ আছে তান্ত্রিক লোক গুরুবাতিরেকে অন্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবেন না। এদিকে আনন্দময়ী মা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইলেও তিনি দেবী, কি তান্ত্রিক, কি বৈদিক—কিছুই জানা যায় না, অতএব কেহ যদি হাতে প্রসাদ দেয় তখন ‘লইব না’ বলাও ঠিক হইবে না এইরূপ চিন্তা করিয়া পাণ্ডা মহাশয় সে স্থান হইতে সরিয়া পড়েন। উক্ত দিবস সন্ধ্যা হইতেই পাণ্ডা মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং প্রসাদ গ্রহণ না করাই অসুস্থের কারণ বলিয়া ধারণা হয় ও আগামী দিবস সর্ববাগ্রে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য মন উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু পর দিবস প্রত্যুষেই শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী দেবীকে

দিয়া মা প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া দেন, “পাণ্ডাকে দিয়া আইস।” “সাদরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার দেহ স্তম্ভ হয় এবং মনের ধাঁধা ঘুটিয়া গিয়া আনন্দিত হন।”

মা ত নিজের প্রসাদ কাকেও দেন না। কখনও কখনও দেখা যায় কোন জিনিষ খাইতে খাইতে বলেন—“এই জিনিষটা অমুককে দিয়া আয়। তোদের মতে বা’ বা’ ভাল জিনিষ, শুধু এই শরীরকেই খাওয়াইবি নাকি?” এই ভাবে দিতেন। আবার কখনও মুখে দিবার পূর্বের ঐরূপ জিনিষ সকলকে দিয়া তারপর নিজে মুখে নেন। আমরা কত বলিয়াও মাকে পূর্বের খাওয়াতে পারি না।

মা প্রাতে ও বৈকালে আশ্রম সন্নিকটে খরপ্তিতনার বাধান জায়গায় গিয়া বসেন, নানা কথাবার্তা হয়। কীর্তনাদি হয়। নবদীপে কৃষ্ণ সাজাইবার কথায় মা আমাদের বলিতেছেন, “শোন্ খুকুনি, আসন মুদ্রাদি যেমন আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে, এই যে সাজ সজ্জা ইহাও ত কেহ বলিয়া দিতেছে না, বাহার ভিতর হইতে যেমন আসিতেছে, সে তেমনই সাজাইতেছে, বোধ হয় এখন এসব হওয়া দরকার তাই এসব আপনা আপনিই হইয়া বাইতেছে।”

১৬ই কার্তিক, বুধবার :—

আজ বিশেষ কোন ঘটনা নাই। এখানেও অনেক কিছু বন্দোবস্ত করা হইতেছে কিন্তু মার থাকিবার খেয়াল কত দিন থাকে ঠিক নাই।

১৭ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার :—

আজ প্রাতে বৃথিকা ও অনু খরটি তলায় বসিয়া নাম কীর্তন করিতেছে মা উপর হইতে নামিয়া সেই দিকেই গেলেন, কিন্তু তাহাদের কাছে না গিয়া দুফাঁদী করিয়া একটা ছোট করুণা গাছের নীচে বসিলেন। স্থানটা বড়ই অপরিষ্কার, কাঁটাও আছে কিন্তু মা তথায় বসিয়া পড়ায় দলবল সকলেই গিয়া সেখানে বসিলেন। নরেশ দাদা সঙ্গে আসিয়াছেন, তিনি এবং বাচ্চু, কি জন্তু মার উপর একটু অভিমান করিয়া কাঁদিতেছে, মা ডাকিলেন তবুও তাহারা গেলেন না ঘরেই বসিয়া রহিল। অনেক পরে নরেশ দাদা গেলেন, বাচ্চু গেল না। বৃথিকারও একটু অভিমানের ভাব ছিল, কিন্তু আমি বলায় সে গিয়া কীর্তনে যোগ দিল। মা নিজে খানিক সময় নাম কীর্তন করিলেন সঙ্গে সঙ্গে আমরাও করিলাম। পরে অভয় আরম্ভ করিল সঙ্গে সঙ্গে সকলে করিতে লাগিলাম। মা চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর কীর্তন বন্ধ করিয়া মাকে নিয়া আমরা ঘরে আসিলাম তখনও অভিমানীদের অভিমান দূর হয় নাই। চোখে জল। মা ঘরে আসিয়া বিছানায় অর্ধশায়িত ভাবে আছেন, দুই চার কথার পরই মা বলিতেছেন, “তোমরা হাস, তাই আমাকে হাসাও এখন তোমরা কাঁদিতেছ আমিও কাঁদি। হাসি ও কান্না একই। তোমরা যেমন করাইবে তাইত হইবে।” এই বলিয়া চুপ করিলেন, অনেকে আপত্তি করিলেন, কিন্তু মা বলিতেছেন—

“আও ভাই আও”—এই বলিয়া মুখে কাপড় মুড়ি দিয়া শুইলেন।
 খানিক পরে কাপড় তুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা শিশুর
 মত কাঁদিয়া উঠিলেন। এই কান্নায় কৃত্রিমতা নাই, চোখের
 জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। মার কান্না দেখিয়া অনেকেই
 কাঁদিতে লাগিলেন। অভিমানীর দল আসিয়া মার পায় প্রণাম
 করিয়া মনে মনে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিলেন। প্রায়
 ১৫২০ মিনিট পরে মা চোখ খুলিয়া চোখের জল মুছিতে
 মুছিতে একটু হাসিমাখা স্বরে বলিলেন, “এ কি, তোমরা সকলে
 আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছ কেন? কি হইয়াছে?” তারপর
 বলিলেন, “হাসি ও কান্না ত একই তোমরা যেমন করাইয়া
 নেও। অনেক হাসিত হাসিলাম! কান্নাও শুরু হইল।” এই
 বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সারাদিনই আজ মার ভাবটা
 কেমন কেমন দেখা যাইতেছে। একটা পরিবর্তন আসিতেছে
 তাহা বোঝাই যাইতেছে। কি করিবেন আশঙ্কায়, সকলেই যেন
 উদ্বিগ্ন। কেহ কেহ প্রশ্নও করিলেন কিন্তু মা উত্তর দিলেন,
 “আমি ত এক রকমই আছি।”

রাত্রি ১১টায়া সকলে শুইয়াছে, মা নরেশ দাদাকে নিয়া
 বাহির হইতেই আমি ও বৃথিকা উঠিয়া মার কাছে গেলাম মা
 বলিলেন, “তোরা থাক আমি একটু বেড়াইয়া আসি।” যাহাকে
 শরীর অসুস্থের জন্ত কত সাবধানে রাখা হইয়াছে, তিনি নিজেও
 আমাদের এই সব বিধান কয়েকদিন বেশ মানিয়া আসিতেছেন,
 আজ কয়দিন যাবতই ধীরে ধীরে সব যেন ভাঙিতেছিলেন, ভাবের

পরিবর্তন একটু একটু দেখা যাইতেছিল। ভয়ানক সর্দি, এর মধ্যে ঠাণ্ডায় বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা বাধ্য হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম। জানি, কিছু দিন হয়ত সকলের মতে বেশ চলিলেন হঠাৎ আবার সব ভাজিয়া বাহির হইয়া পড়েন—তখন কাহাকেও চিনেন বলিয়াও মনে হয় না। রাত্রি প্রায় ১১টার অভয়কে ডাকাইয়া কিছু কথাবার্তা বলিলেন যুথিকাও গেল। আমি মার আদেশ রক্ষা করিবার জন্য ঘরেই বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। মা ঘর হইতে বাহির হইয়া খরপ্তিতলায় গিয়া বসিয়াছেন। এইভাবে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সকলে ভোরের কীর্তন শুরু করিল। মা শুইয়া রহিলেন।

১৮ই কার্তিক, শুক্রবার :—

আজও মা ঘরে আসিলেন না। বলিলেন “কয়েকদিন হইতেই গাছতলায় থাকিবার খেয়ালটা হইতেছিল গাছতলায়ই থাকিব।” তাই একখানা কম্বল বিছাইয়া গাছতলায়ই পড়িয়া রহিলেন। সকলে, মার এদিক ওদিক পাথরে শুইয়া রহিল। দ্বিপ্রহর এইভাবে কাটিয়া গেল। মা কি করিবেন, কোথায় যান, এই আশঙ্কায় আমরা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম! বেশ জানি, শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণেই মার খেয়ালের বাধা হওয়ার উপায় নাই। আজও রাত্রিতে মা গাছতলাতেই কাটাইবেন স্থির হইল।

১৯শে কার্তিক, শনিবার :—

কাল রাত্রিতেই বাবু শিবপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন। আজ

সকালেই তাঁহার মোটরে অষ্টভূজা ও বিদ্যাবাসিনী যাওয়া হইল। মা মোটরেই বসিয়া রহিলেন, সঙ্গীয় যাহারা দেখে নাই তাহারা নামিয়া দর্শন করিয়া আসিল। মোটরে কথায় কথায় বলিতেছেন, “টাকা পয়সারও ত ব্যয় আছে, চলাচল আছে, দেখনা, আজ এখানে কাল ওখানে যায়; আবার প্রথম পয়সা ইত্যাদি যখন তৈয়ার তখনই হইল জন্ম আবার হয়ত পয়সা গালাইয়া কবচ তৈয়ার হইল তখনই তাহার মৃত্যু বা একটা বিশেষ পরিবর্তন হইল বলা হইল; তবেই ত দেখ এ সব পরিবর্তনশীল জিনিষের সঙ্গ করিলেই তোমাকেও আবার পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেই গতাগতি করিতে হইবে।”

আমরা বিদ্যাচল হইতে আশ্রমে ফিরিতেছি পথে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে দিয়া আসিতেছি, তখন কথা উঠিল মার ‘বন্ধুর’। কথাটি এই, এই মন্দিরে একটি বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী থাকিত মাকে দেখিলেই সে বকাবকি করিত। তাহার কারণ এই ছিল যে মা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেন সে হয়ত মনে করিত মা গৃহস্থ মানুষ গৃহস্থদের সঙ্গে আসেন এমতাবস্থায় তাঁহার সঙ্গে মা বেশ পরিচিতার মত আলাপ করিতে যান ইহা সন্ন্যাসিনীর অপমানের বিষয়। ইহা নিয়া মহারঙ্গ হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঘরে গিয়া হয়ত মাকে বকিতেছে, আবার আমরা সকলে অগ্ৰমনস্ক হইলেই উঁকি দিয়া মাকে দেখিত, মা আবার তাহা দেখিয়া ফেলিতেন, আমাদের দেখাইতেন, তাহাতে আবার বৃদ্ধা আরও চটিয়া

যাইতেন। হয়ত কিছু কাজ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে মাকে একটু চোখ ঘুরাইয়া দেখিয়া নিতেছেন, কিন্তু যেই মা ইহা লক্ষ্য করিতেন অমনি আবার বকাবকি শুরু হইত। মা হয়ত আমাদের বলিলেন, “কিছু পরস্যা ওকে দিয়া যাও”—আমরা পরস্যা দিতে যাইতেই গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যেই মা রওনা হইয়া কিছু দূরে গেলেন অমনি বাহিরে আসিয়া গলা বাড়াইয়া, মাকে যত দূর দেখা যায় দেখিতেন। মাকেই শুধু গালাগালি করিতেন আর কাহাকেও নয়। এই সব কথা নিয়া মা আজ অনেক আনন্দ করিলেন। ভোলানাথ তাই বৃদ্ধাকে মার বন্ধু বলিয়া আনন্দ করিতেন। এখনও মা বলেন, “ঐ দেখ আমার বন্ধুর বাড়ী।”

তারপর চুল কাটার কথা উঠিল। প্রথম ত ঢাকায় দুই তিনটি বিধবার চুলের পরিপাটি দেখিয়া মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখেছ খুকুনি, কোথায় ইহারা ব্রহ্মচারিণী ভাবে জীবন কাটাইবে, সেই পরমপতিকেই পতিভাবে পাইতে চেষ্টা করিবে, না কি ভয়ানক ভোগ বিলাসে দিন কাটাইতেছে”—এই বলিয়াই ছেলে মানুষের মত মুখখানা বাঁকাইয়া আবদার ধরিলেন—“আমার শীত করে আমি চুলের বালিশে শুইব, কে কে দেবে জিজ্ঞাসা কর না।” তারপর সখবারা—গণেশ বাবুর স্ত্রী, প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী ধরিলেন, “আমরাও দিব”। ভূদেব বাবু বলিলেন, “মা আমরা দিব না, আমাদের চুল দিয়া পায়ের বালিশ কর মা।” এইভাবে সকলের চুল কাটার উৎসব চলিল। বালিশ

তৈয়ার হইল, তারপর যে কোথায় পড়িয়া রহিল কে জানে ! আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ করিলেন । কুমারীদের ত পূর্বেই চুল কাটা শুরু হইয়াছিল । আমি হাসিয়া বলিলাম, “মা চুল যাহারা দিল, শিখদের মত মাথাও সেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে দিয়া গেল নাকি ?” আজ কাশী যাওয়ার কথা উঠিয়াছে । বৈকালের দিকে কাশী যাওয়া হইবে স্থির হইয়াছে ।

বৈকালে প্রায় ষ্টোয় আমরা মাকে নিয়া শিবপ্রসাদ বাবুর মোটরে কাশীধাম রওনা হইলাম । সঙ্গীয় সকলে ট্রেনে চলিয়া গিয়াছেন । বীরেশ্বর পাণ্ডের ধর্মশালায় সকলকে রাখিয়া পাঁচ সাতজনকে সঙ্গে নিয়া মা গঙ্গার মধ্যে নৌকায় থাকিবার জন্ত চলিলেন ।

আমরা একখানা বজরা করিয়া মাকে নিয়া নৌকায় রহিলাম । কথা হইল প্রাতে ও বৈকালে ঘাটে নৌকা লাগান হইলে তখন সকলে মায় দর্শন পাইবেন । জ্যোৎস্না রাত্রি, গঙ্গাবক্ষে মাকে নিয়া থাকা যে কত সৌভাগ্যের কথা এবং কত আনন্দদায়ক তাহা বর্ণনাভীত । মহানন্দে রাত্রি কাটিয়া গেল ।

২১শে কার্তিক রবিবার :—

প্রাতে দ্বারভাঙ্গা ঘাটে নৌকা লাগাইতেই দলে দলে নৌকা মাকে দর্শন করিবার জন্ত নৌকায় উঠিতে লাগিলেন । সকলকে মিষ্ট ব্যবহারে ও দর্শনদানে কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করিয়া আবার নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল । এখানকার সিদ্ধিমার কথা শুনা যাইতেছে তিনি বেশ উচ্চ অবস্থায় আছেন । মা

অভয়কে ও নরেশ দাদাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, “আমার মাকে গিয়া তোমরা দর্শন করিয়া আইস।” তাহার। সিদ্ধিমাকে দেখিয়া আনন্দ পাইল, ফিরিয়া আসিয়া মার নিকট তাঁহার কথাবার্তা বলিল। সকলকেই মা বলিতেছেন, “তোমরা যেখানে যাইয়া আধ্যাত্মিক জগতে একটু উন্নত হইতে পার সেখানেই যাইবে। এখানে ত কোন বাধা নাই, যে যেখানে সেই আনন্দ পাইতে পারিবে বলিয়া মনে করিবে সেখানেই যাইবে।” কেহ কেহ বলিতেছেন, “মা তুমি আবার আর এক মার কাছে পাঠাইতেছ কেন?” মা হাসিয়া বলিতেছেন, “বাঃ তোমরা এমন ভিন্ন ভাব রাখ কেন? সবই আমার বাবা, মা। আবার কথা হইল সবই-টবই নাই আমার ঐসব নিয়া একটাই বাপ, মা যা বল।”

একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন “মা, আমি কিছু ফল আনিয়া দিলে খাইবে ত?” মা হাসিয়া বলিতেছেন, “বাঃ, আমার ত একটা ভিন্ন জমিদারী আছে বলিয়া আমি জানি না, যে সেই জমিদারীরটা খাইব আর কাহারও কিছু খাইব না। আমি ত জানি সবই এক ঘরের অথবা ভিন্ন যদি বল, তবে সকলের ঘরে ঘরেই, আমার খাওয়ার বল, পরার বল, সব রহিয়াছে। আবার এখান হইতে যখন কাহাকেও কিছু নিতে বলা হয় সে ভিন্ন ভাবিয়া হয়ত নিতে সঙ্কোচ বোধ করে আমি বলি, “তোমাদের ঘরই যে আমার ঘর, তোমাদের বাক্সই যে আমার বাক্স। আমার যে বাক্সগুলি

তোমাদের ঘরে আছে (অর্থাৎ তাহাদের বাসগৃহ), তাহার ভিতর এই জিনিষগুলিও নিয়া রাখিয়া দাও।” এই বলিয়া শিশুর মত সরল হাসি হাসিতে লাগিলেন। আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন :—

“সবই আমার দোস্ত

যে বা পেয়েছে তাই নিয়ে হয়ে আছে মস্ত।”

এই বলিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আজও নৌকায় মহানন্দে কাটিয়া গেল।

২১শে কার্তিক, সোমবার :—

আজ চুড়ামণি যোগ। দেশ বিদেশ হইতে বহু লোক স্নান করিবার আশায় গঙ্গাতীরে একত্র হইয়াছেন। রাত্রি ২টার পরেই গ্রহণ লাগিবে।

সন্ধ্যায় হরিহর বাবাজির ওখানে যাইব ভাবিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দুইখানা বড় নৌকা করা হইয়াছে। সঙ্গে এত লোক জুটিয়াছে যে নৌকা চালান দায়। রাত্রি প্রায় ১টার এক স্থানে নৌকা ঠেকিয়া গেল। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায়ও নৌকা ধোলা যাইতেছে না। বাবাজীর কাছেও যাওয়া হইল না কারণ এত বড় নৌকা যাইবে না বলিয়া মাঝিরা আপত্তি করিল। কিন্তু অনেকটা দূর আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে স্নান করিবেন কাজেই ২টার মধ্যে নৌকা কোনও ঘাটে নিয়া যাইতে হইবে। সারা রাত্রি মারও শোওয়া হইতেছে না, বহু লোক সঙ্গে। মার নৌকায় কষ্ট সত্ত্বেও সকলে

বসিয়া আছে তবুও কেহ মার সঙ্গ ছাড়িয়া অথ নৌকায় বাইবে না কাজেই নৌকা ভরানক ভারি হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে মা বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, আশ্চর্যের বিষয় দুই চার মিনিটের মধ্যে নৌকা ছাড়াইয়া নিল। নৌকা নিয়া একটা ঘাটে লাগান হইল। সঙ্গীয় সকলে যথাসময়ে নান করিয়া জপ ধ্যানাদিতে বসিলেন। গ্রহণ প্রায় ২ ঘণ্টা স্থায়ী। দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল।

২২শে কার্তিক, মঙ্গলবার :—

আজ মাকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য ভোরেই নৌকা ছাড়িয়া মধ্যগঙ্গায় নোঙ্গর করিয়া রাখা হইল। আমরা মার কাছে বসিয়া রহিলাম। বেলা প্রায় ৯টায় আবার নৌকা দ্বারভাঙ্গা ঘাটে আনা হইল। এইভাবে গঙ্গায় বেশ আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল।

২৩শে কার্তিক, বুধবার :—

আজও গঙ্গায় কাটিতেছে। আমি বলিলাম, “মা, কেহ কেহ বলেন সব মহাত্মাদেরই একটা সম্প্রদায় আছে, তাঁহারা দীক্ষাদিও দিয়াছেন সকলেরই সেই হিসাবে একটা চিহ্ন আছে, এ’ও আছে সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ বেশ উন্নত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের মার সে সবও কিছু রহিল না। আর দলের মধ্যে বিশেষ উন্নতই বা এমন কে ?”

মা বলিতেছেন, “দেখ, তোরা এমন করিয়া একটা ভিন্ন গণ্ডিবদ্ধ করিয়া নিস্ কেন ? জানিস্ ত এই শরীরটার কাছে

নাম করা সব মহাত্মাদের আশ্রিতেরাই কেহ কেহ আসিয়া সাধন ভজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যায় তোরা সব সময় তাহাদের খবর জানিস্ না, তাহারা গোপনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যায়, এবং বলে যে, ‘আমরা যে এখানে আসিয়াছি তাহা যেন প্রকাশ পায় না।’ কি বলিব, শোন, এমনও এক এক জনের অবস্থা-সাধনে উন্নতি না হওয়ায় আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত, হয়ত কিছু বলা হইল, আমি ত বলি না তোরাই বলাইয়া নিস্—সেই কথায় শান্তভাবে কাজ করিতে চলিয়া গেল আবার আসিয়া খবরও দিয়া যায় সাধনে বেশ ফল পাইতেছে। তবে কথা কি জানিস্, এই শরীরটার ত সবই এক, কাজেই যাহারা কাছে থাকে তাহারা উন্নত হইলে এ দলের নাম হইবে, অপর সম্প্রদায়ের লোককে সাধনের কথা বলিয়া দিলে সে উন্নত হইলে এই শরীরটার নাম হইবে না, এসব কথা ত এখানে কিছুই নাই”—এই বলিয়া হাতখানি শিশুর মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া একটু একটু হাসিতে লাগিলেন। আবার কথা উঠিল, কোন কোন মহাত্মা বলিয়া দেন অমুকে অমুক স্তরে আছে, উহার ঐ অবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। মা এসব কিছুই বলেন না, এই কথায় মা বলিতেছেন “দেখ্ এসব কি বল্? শরীরের মধ্যে হাত, পা, আঙ্গুল সব যার যার যায়গায় আছে, তা কি বলিতে যাই আমার হাতটা ঐখানে আছে, পাটা ঐ জায়গায় আছে? আঙ্গুলটা এতবড় লম্বা।

যে কোন মহাপুরুষই বল অথবা জীব, জন্তু, পশু, পাখী বাহাই বল, সবই ত ঐ এক ছাড়া ত কিছুই নাই। কাজেই উপরে নীচে কি বলিব? তবে খেয়াল হলে এটা হতে পারে যে আমার ঐ আঙ্গুলটায় একটু পোকা ধরা আছে, এই আঙ্গুলটা বেশ ভাল, এই পর্য্যন্ত।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্যের মতও যে এই শরীরের মত। সর্ব মতই যে এখানে। অবাধ গতি আর কি। আমি বলিলাম, “শঙ্করাচার্যের নামটা কিন্তু উল্লেখ হইয়া গেল।” মা হাসিয়া বলিলেন “হাঁ, বাবার নামটা হইয়া গেল।” এই বলিয়া বলিতেছেন, “সব নিয়াই এই শরীরটার সম্প্রদায়।” আবার আলাদা আলাদা আছে বই কি। সর্বরূপে, রকমে রকমেও যে।”

২৪শে কার্তিক, বৃহস্পতিবার :—

মার মধ্যে মধ্যে ভাবটা একটু চুপচাপ হইয়া যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে কথা হইতেছে। কাল পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মাকে বৈকালে নিয়া গিয়াছিলেন। কথাবার্তা বলিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার ফিরিয়াছেন। সিদ্ধিমার কাছেও মা কাল ফিরিবার পথে গিয়াছিলেন। ইনি খালিশ-পুরার মা নামেও পরিচিতা। বেশ অবস্থা। তাঁহার কাছে মা একটি ছেলেকে দীক্ষা নিতে পাঠাইয়া দিলেন এবং কথায় কথায় বলিলেন, “দেখ, যাহার কাছে যা-যা’ পাওনা থাকে সে নিবেই। তবে এই শরীরটার কথা, এখান হইতে যার যা যা’

পাওনা তা দূরে থাকিলেও পাইবে, এমন নয় যে নিকটে থাকিলেই শুধু পাইবে।

২৫শে কার্তিক, শুক্রবার :—

আজ ভোরে বড় নৌকা হইতে ছোট একটা নৌকায় খানিক সময় আমরা মাকে নিয়া একটু ঘুরিয়া আসার পরই মার ভাবের একটু পরিবর্তন দেখা গেল। শরীর যেন অবশ। এই ভাবে কয়েক ঘণ্টা চলিল। তারপর একটু স্বাভাবিকভাবে আসিলেন বটে কিন্তু কেমন ঘুম ঘুম ভাব। আজই বিদ্যাচল যাওয়ার কথা বলিলেন। বৈকালে আমরা বিদ্যাচল চলিলাম।

২৬শে কার্তিক, শনিবার :—

আজ সকালে আশ্রম ভাঙ্গা হইতেছে দোতালী করা হইবে সেই দৃশ্য দেখাইয়া কথায় কথায় মা বলিলেন, “এই দেখ নূতন করিতে হইলে কত ভাঙ্গা-চোরা করিতে হয়, তবে মূল ভিত্তি কিন্তু একটাই থাকে—যেমন সত্য, তাহা চিরদিনই, একভাবেই আছে। আর বাহিরের দিকটা এমনই ভাঙ্গা চোরা করিয়া তবে গড়িতে হয়। গড়ার পূর্বের এমনই ভাঙ্গা-চোরা করিতে হয়। তবে না নূতন হয়।” একজন বলিল, “মা বড় জ্বালা”, মা বলিলেন, “জ্বালাই ত ভালো।”

আজও মার সেই প্রকার বিম্বিম্ব ভাব। দুপুরে গিয়া গাছ তলায় বসিলেন। বৈকাল বেলা একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। খানিক দূর হাঁটিয়া আসা হইল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় কালী

হইতে আসিলেন। রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গে মার অনেক কথা হইল, মার শরীরে যে সব ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছে সেই সব কথা উঠিল। খরপ্টি তলায় বসিয়াই কথাবার্তা হইতেছে। পাহাড়ের গম্ভীর নিস্তব্ধতা—রাত্রিতে আরও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, মা ঐ সব কথা কবিরাজ মহাশয়কে বলিতেছেন। স্থান, কাল ও পাত্র যেন সব মিলিয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ১১টা অবধি কথাবার্তা হইল।

গোপীনাথ বাবু বলিলেন “মা, ঐ যে ঝুলন পূর্ণিমার দিন দীক্ষার মত কি হইয়া গেল তারপর হইতে শরীরের ক্রিয়াদির কি কিছু পরিবর্তন হইল?” মা বলিলেন, “দীক্ষা ত নয়,” গোপীনাথ বাবু এ কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, “তা ত নয়ই মা, তবে যে ঘটনাটা হইয়াছিল এই বলা যায় মাত্র।” মা বলিলেন “হাঁ, ঐ ঘটনার পর হইতে আসন মুদ্রাদি সব বিশেষভাবে হইতে লাগিল। কেমন চমৎকার দেখ, আমি ঐ সময়তে দেখিতাম কি জান? শ্বাস এক এক সময় একেবারে বন্ধ অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটিতেছে। তবে তখন ত অজানার মত ব্যবহার চলিবে। সাধনের ক্রিয়াগুলি চলিতেছে ঠিক ঠিক সাধকের প্রথম অবস্থার মতই সব হইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় ভোলানাথকে বলিতাম তুমি ত কখনও কখনও অশ্রুত চলিয়া যাও আমার কিন্তু এই রকম হইয়া যায়। আমি ত একাই থাকি। এই বলিয়াই হাসিয়া বলিতেছেন, ইহাকেই তোমরা কুস্তক না কি বল বুঝি?” গোপীনাথ বাবুও হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, মা।”

তারপর মা বলিতেছেন, “তারপর ঐ বুলন পূর্ণিমা দিন শরীরের বিশেষ একটা এলান ভাব, আমি ভোলানাথকে তাহাও বলিলাম তারপর রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিলাম।” এই বলিয়াই বলিতেছেন, “দীক্ষাদি হইলে কি খাওয়া দাওয়া হইত? খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়া ভোলানাথকে বলিলাম, দেখ আমার শরীরটা আজ যেন বিশেষভাবে কেমন হইয়া যাইতেছে, আমি এখনই মাটিতে বসি। এই বলিয়া আমি মাটিতেই বসিয়া রহিলাম। কত কি হইতে লাগিল তোমাদের যে যজ্ঞাদির জন্ত সব করিতে হয় না? সেই রকম সব করিতেছি। তারপর যে বীজটি সেই দিন ফুটিল সেই বীজটিও পরে মধ্য স্থানে লিখা হইয়াছিল! তারপর সেই বীজেই উহার উপর আলতিও হইয়াছিল! সেই দিন ভিতর হইতে ঐ সময় একটা বীজ ফুটিল। সেই বীজটাই কিছুদিন স্থায়ী ছিল তারপর আরও অনেক বীজ ফুটিয়াছে সেই সেই বীজ দ্বারা পূজাদি হইয়া আবার শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম বীজটি তিন বৎসর মৌন ভাস্ক্যার পরও কিছুদিন ছিল, কণ্ঠে কখনও কখনও উচ্চারিত হইতে থাকিত। আবার দেখ, বীজ পাওয়ার পর জপ হইয়া যাইতেছে, এমন কি মাথায়, বুকে সব হাত রাখিয়া রাখিয়া নিয়ম মত জপাদি হইতেছে।” গোপীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই জপ বন্ধ হওয়ার পর কি অবস্থা হইল?” মা বলিলেন, “তারপর একটা শূন্য অবস্থা।”

এর পর দীক্ষার সময়ের আরও অনেক কথা হইল, সব কথা

আমি গুছাইয়া লিখিতে পারিব না। তারপর গোপীনাথ বাবু বলিলেন, “মা, সেদিন কাশীতে আমার সঙ্গে বাগানে বসিয়া যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন সেখানে কে গিয়াছিলেন? আপনি ‘এখন যাইব না’,—এই রকম একটা শব্দ করিলেন মনে হইল।”

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, “তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছিলে কোন অশরীরী তথ্য গিয়াছিলেন, তুমি কি রকম দেখিলে বল ত?”

গোপীনাথ বাবু বলিলেন, “আমি ত প্রথম খেয়াল করি নাই পরে একটা জ্যোতির মত দেখিলাম।” গোপীনাথ বাবু মার কথার উত্তরে ইহাও স্বীকার করিলেন মধ্যে মধ্যে তিনি এই রকম সব বুঝিতে পারেন। সেদিন তাঁহার গা ছমছম করিতেছিল। মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তোমার কি ভয় করিতেছে” ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা হইল; মা এই মাত্র বলিলেন, “যিনি আসিয়াছিলেন তিনি ওখানে সর্বদাই যান; সেদিনও গিয়াছিলেন।” শঙ্করানন্দ স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন: “মা, তিনি কি সাধনায় সহায়তা করিতে পারেন?” মা গোপীনাথ বাবুকে বলিলেন, “মনে করিয়া দেখ, তখন আমাদের কি ভাবের কথা হইতেছিল। যেই যেই ভাবের কথাবার্তা যেখানে হয় সেই সেই ভাবের অশরীরীগণও তখন বিনা আহ্বানেও সেই খানে আসিয়া জমা হয়। এক এক সময়, দেখনা কথাগুলিতে সকলের ভাব বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহারা (অশরীরীরা) আসিয়া ঐ কথার ভাবে যোগ দিয়াছেন তাই সেখানকার ভাবগুলি জমিয়া গিয়াছে। এই যে এখানে কথা

হইতেছে এখানেও আছে। "নিস্কর রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। চারিদিক যেন কিভাবে স্তব্ধ হইয়া মার কথা শুনিতেছে— অনির্বচনীয় রূপরাশি দেখিতেছে। আমি, মা, গোপীনাথ বাবু ও শঙ্করানন্দ স্বামিজী এই কয়জন মাত্র খরপুটি তলায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম। সেই সময়ের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না, অনুভব করিবার বিষয় মাত্র।

২৭শে কার্তিক রবিবার :—

আজও বেলা ৮টায় মার সঙ্গে আমরা সকলে ঘুরিতে বাহির হইলাম। যাহারা বিক্ষাচল অর্ধভূজা পাহাড়ে আসিয়াছেন, তাঁহারা ই জানেন এ পাহাড়ের কি শোভা। আমরা হাঁটিতে হাঁটিতে সমতল ভূমিতে একটা গাছতলায় গিয়া বসিলাম। নেপালদাদাও কাশী হইতে তখনই আসিয়া পৌঁছিলেন। নেপাল দাদা বলিলেন, "পুরাকালের ঋষিদের কথা মনে হইতেছে। এই রকম খোলা স্থানে মাকে নিয়া সকলে গাছতলায় বসিয়া আছি।"

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় আজও মার নিকট হইতে নানা ভাবের কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্র তাই মারও অনেক কথা বাহির হইতেছে। আজিকার কথাও আমি সব গুছাইয়া লিখিতে পারিব না। যদি কবিরাজ মহাশয় কখনও এ সম্বন্ধে কিছু লিখেন তবেই সকলের জানিবার সম্ভাবনা। আমি অক্ষম। দুই একটি কথা মাত্র লিখিতেছি, কথায় কথায় মা বলিতেছেন "দেখ বাবা, দীক্ষাদির

পর যখন পূজাদি হইত ঘরে কিছু নাই, কিন্তু এমনভাবে পূজাদি হইতেছে প্রদীপ, ধূপ-ধূনা, নৈবেদ্য ; সব সাজানো। আর কি হইত জান ?” একটা ক্রিয়া করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন, “এইভাবে নিজের ভিতর হইতেই দেবতাকে বাহির করিয়া নিয়া পূজা করিয়া আবার নিজের মধ্যেই মিলাইয়া দেওয়া হইত।” গোপীনাথ বাবু শুনিয়া বলিলেন, “মা, শাস্ত্রেও ঠিক এই রকম বলে।”

তারপর মা বলিতেছেন “এই হইল এক রকম, আবার, নিজের ভিতরই সব মন্ত্রাদি ফুটিতেছে—প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। তোমরা মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি, না কি বল বাবা, এই কি তাই?” গোপীনাথ বাবু বলিলেন, “হাঁ মা এই তাই।” “অনেক সময় আমার মুখ হইতে “সোহং” শব্দ বাহির হইয়াছে, খুকুনিও শুনিয়াছে।” গোপীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা মা, নিজের ভিতর হইতেও মন্ত্রাদি কোটে, আবার অনেক সময় যে বাহির হইতেও কোন কোন আদেশ পাওয়া যায় সে কোন্ অবস্থায়?” মা বলিলেন, “ঐ যে বলিলাম, নিজের ভিতর হইতেই দেবতা বাহির করিয়া পূজাদি হইতেছে, সেই সময়তেই ঐ দেবতা এমন প্রত্যক্ষ হয় যে, বরদান, আদেশ প্রভৃতি সব শোনা যায়। কত বলিব বাবা, এ যে অনন্ত।” এই সব কথা বলিতে বলিতে মার যেন একটু ভাবান্তর হইল। গোপীনাথ বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এ সব কথায় আর কাজ নাই, মা আবার ঐ ভাবেই ডুবিয়া যাইবেন। এখন নীচে রাখাই

ভাল।” না বলিলেন “কোন গোলমাল নাই ত। যেমন তোমাদের হাসিতে, কথায় যোগ দিয়া যাই এও তেমনি, ঐ ভাবে যোগ দেওয়া।”

এই বলিতে বলিতে আবার বলিতেছেন, “দেখ, ঐ ক্রিয়াদি যখন আপনা আপনি হইয়া যাইত ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়া একটু করিতে গেলেই শরীর একেবারে গোলমাল হইয়া যাইত, তখনই ত দ্রুত-স্বরূপে সব দেখা যায় যে, আমার ইচ্ছাশক্তির কোন ক্ষমতাই নাই, তিনি যেমন করাইতেছেন তেমনই হইয়া যাইতেছে। সেই মহাশক্তির ক্রিয়াগুলি শরীরের মধ্যে হইয়া যাইতেছে আর আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি। এই ত দ্রুত। কোন গোলমাল নাই, অভাব বোধ, কষ্ট বোধ নাই। যাহা বাহির হইবার হইতেছে, যাহা বাহির না হইবার তাহা বলিতে গিয়াও হয় জিহ্বা কামড়াইয়া রাখার ভাব হইতেছে নতুবা দুই আঙ্গুল দিয়া মুখ চাপিয়া রাখা হইতেছে। এই রকম কত বলিব, সবই যে অনন্ত, এই না বলিতে পারার জন্যও দুঃখ নাই বা অভাব বোধও নাই। বলিবার জন্য কোন আবেগও ভিতরে নাই। কাজেই কোন গোলমাল নাই। তোমরা যেমন আঘাত দিতেছ সেই রকমই শব্দ বাহির করিয়া নিতেছ, বাস্”—এই বলিয়া ছেলে মানুষের মত ছোট্ট করিয়া হাত তালি দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বেলা প্রায় ১০টায় আমরা আশ্রমে ফিরিলাম। মার কোথায় যাওয়া যাওয়া ভাবটা খুব আছে, আমরা আশঙ্কা করিতেছি কখন

বাহির হন ঠিক নাই। এলাহাবাদ হইতেও জীতেন দাদা, শিবপ্রসাদ ভাই সকলেই আসিয়াছে।

কয়দিন হইতেই দুধ খাওয়ার ভাবটাও কমিয়া গিয়াছে। আর ডাক্তার পাশ্বে যে খাওয়া ও বিশ্রামের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। আজও বলিলেন, “খুকুনি, সব নিয়ম ভাঙ্গিয়া দেও। যখন উঠিব তখন খাইব। যখন শোবার ভাব হইবে শুইব, তোমার টাইম এখন সব ভাঙ্গ। আমি এখন শুইব।” আমি তাড়াতাড়ি একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। কাশ্মিরী একটি ভক্ত স্ত্রীলোক কল নিয়া আসিয়াছে কিছু মাকে খাওয়াইয়া দিলাম এবং সকলকে দেওয়া হইল। দুই তিনটা তাঁবু ফেলা হইয়াছে, মা শুইয়া পড়িতেই সকলে একে একে উঠিয়া তাঁবুতে গিয়া বসিলেন।

বিক্ষ্যাচলে মা যাহাতে কয়েকদিন থাকেন তাহার জন্য তাঁহারা কত বন্দোবস্ত করিতেছেন, মাকে অনুরোধ করিতেছেন যাহাতে শরীর সুস্থ হইবার জন্য মা কয়েকদিন বিক্ষ্যাচলে থাকেন। কিন্তু মার ভাবে বোধ হইতেছে মা বেশী দিন থাকিবেন না, কখন নামেন ঠিক নাই। চারিদিকের সুবন্দোবস্ত করিতে দেখিয়া মা শুধু হাসেন আর বলেন, “এক নিশ্বাসের ত বিশ্বাস নাই আর আমিও কোথায় কয়দিন থাকিব কিছুই স্থির নাই। এত বন্দোবস্ত দেখিয়া হাসি পাইতেছে”—তবুও কাহারও মন মানে না তাই তাহারা যথাসাধ্য সেবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মার শরীরও খুবই দুর্বল কিন্তু আমরা

সকলেই জানি এসব কিছুতেই মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না, কখন যে সব ভাঙ্গিয়া রওনা হইবেন, ঠিক নাই।

২৮শে কার্তিক, সোমবার :—

আজ প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, ফিরিবার পথে বলিতেছেন, “আজ নামিতে হইবে।” জীতেন দাদা ও শিবপ্রসাদ তাই কালই চলিয়া গিয়াছেন তাহারা মার ভাব দেখিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন কোন প্রকারেই মাকে রাখা যাইবে না তাই বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন নামিবার সময় একবার যেন এলাহাবাদ হইয়া যাওয়া হয়। তাই আজ মা বলিলেন, “দেখ কোন গাড়ীতে যাওয়া সুবিধা হইবে?” ঠিক হইল সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে সকলে রওনা হইবে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার মেয়ে আজ দুই দিন হয় মার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহারাও ঐ সময়তেই কাশী রওনা হইতে পারিবেন। কাজেই সকলে একসঙ্গে নামিয়া যাওয়া হইবে। অভয় কয়েকদিন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট থাকিবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই সকলে নামিলাম। শিবপ্রসাদ বাবুর পরিবারের স্ত্রীলোকেরা অনেকেই সঙ্গে, তা ছাড়া শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পরিবারও সঙ্গে, সকলকে নিয়াই এলাহাবাদ রওনা হওয়া হইল। বাঁহারা কাশী যাইবেন তাঁহারা প্রথমে রওনা হইয়া গেলেন। তারপর আমরা এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলাম। রাত্রি ১০টার আমরা এলাহাবাদ পৌঁছিলাম, জীতেন দাদা ও শিবপ্রসাদবাবু

প্রভৃতি অনেকে ফৈশনে ছিলেন। আমাদের নিয়া বজরায় গেলেন।

২৯শে কার্তিক, মঙ্গলবার :—

আজ মার জ্বর জ্বর ভাব, সকলে মাকে দর্শন করিতে নোকায় আসিতেছেন। আজ দুপুরে এখানকার দুইটি ধনীলোক মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শুনলাম তাঁহারা দুইজন খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র (কানাইয়া লালরা), মাকে তাঁহারা বলিলেন, “মা, আমাদের একটা কীর্তনের স্থান আছে তথায় প্রত্যহ কীর্তন হয়, আপনি সেখানে একবার পদধূলি দিলে আমরা কৃতার্থ হইব। মাসে একদিন অষ্টপ্রহর কীর্তন হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।” কীর্তনের যে দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সে বিষয় অনেক বলিলেন। মা বলিলেন, “দেখ বাবা, তোমাদের কথা শুনিয়া খুবই আনন্দ। তোমরা দিন দিন কীর্তনে বেশী সময় দিতেছ ইহা খুবই আনন্দের কথা। তোমরা ইচ্ছা করিলে আরও একটি কাজ করিতে পার, কীর্তন আরম্ভের সময় শান্তভাবে কিছু সময় সকলে স্থির হইয়া বসিয়া বাঁহার নাম করিবে তাঁহার চিন্তা করিয়া পরে নাম আরম্ভ করিবে। আবার কীর্তন অন্তেও ঐভাবে কিছু সময় সকলে খানিক সময় বসিলে বেশ একটা স্থির ভাব জাগিবে এবং আনন্দ পাইবে।” ধর না, মাসে অন্ততঃ একটা দিন, ক্রমে বাড়াইতে পার, ক্ষতি নাই। মাসে একটা দিন অন্ততঃ সব স্ত্রীলোকরা মিলিয়া একটা সময়

ধ্যান জপ ইত্যাদিই করিলে। পুরুষেরা এক সময়তে সকলে মিলিয়া ধ্যান জপ করিল। সত্যি কথা বলিতে হইলে ধ্যান ত করিলে হয় না, আপনি হইয়া যায়। ধ্যান হইল সন্ন্যাসপ্রকাশ, তবে, যেমন সন্ন্যাসী হওয়ার জন্ত সন্ন্যাস বৃত্তি নিতে হয়, সেই রকম ধ্যান হইবার জন্তও ধ্যানের বৃত্তি নিতে হয়। হওয়া আর করা, অনেক তফাৎ আছে কিন্তু।” আজ রাত্রি ৮টায় কীর্তনে যাওয়া স্থির হইল।

বৈকালে মাকে একটু বেড়াইতে নিয়া যাওয়া হইল। অল্প সময়ের জন্য শিবপ্রসাদ বাবুর বাড়ীও নিয়া যাওয়া হইল। সকলে মিলিয়া মার অমৃত বাক্যাবলী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। ধানিক পরেই মাকে আবার নৌকায় নিয়া যাওয়া হইল, যাওয়ার পথে কীর্তনের স্থানে নিয়া যাওয়া হইল। শিবপ্রসাদ বাবু মার জন্ত তাঁবু ফেলিয়াছেন, কিন্তু মা নৌকায় থাকিবেন বলিলেন।

আজ একটি ঘটনা হইয়াছে। ঘটনাটি এই :—একটি অতি সাদাসিধা গোছের বৃদ্ধা সংজ্ঞাদিদির বাড়ীতে কাজ করিত, সে মার সেবা করিবে বলিয়া মার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। কাল বৃদ্ধাটি মাকে কি বলিতে যাঁইয়া কাঁদিয়া আকুল। আমরা বলিলাম, “তোমার কথা পরে মা শুনিবেন।” মা-ও বলিলেন, “থুকুনি! সময় করিয়া ও’র কথা আমাকে শুনাইও কিন্তু, নতুবা তোমার দোষ।” তা’ই হইল আজ গঙ্গার ধারে মা নৌকা হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বৃদ্ধা বলিতেছে, “মা,

আমি কিছুদিন পূর্বের কলিকাতায় জপ করিতে বসিয়া দেখিয়াছিলাম, যেন একজন অতি সুন্দর পুরুষ দাঁড়াইয়াছেন, গলায় শুভ্র পৈতা; কে যেন আবার বলিতেছে—নারায়ণ। আমি বেশ দেখিতেছি, হঠাৎ দেখি শিবমূর্তি; আবার দেখি মা তোমার এই মূর্তি, পিছনে যেন অভয় ছেনোট। আমি অনেক সময় দেখিলাম কিন্তু হৃৎকের বিষয় আমি সেই নারায়ণের চরণ দর্শন করিলাম না এবং তিনি কোন কথা আমার সঙ্গে বলিলেন না।” এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মা বলিলেন, “তুমি কাঁদিও না, তোমার ইচ্ছামত জপ সর্বদা করিও।” আমি বলিলাম, “তুমি কাঁদিও না মার চরণ দর্শন কর, এই ত মা তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তুমি শান্ত হও।” বাস্তবিকই বৃদ্ধা শান্ত হইল। মাকে প্রণাম করিল। আমি একটা বিষয় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ঢাকা হইতে আসিবার সময় ষ্টীমারে একটি অপরিচিত মেয়ে মার কাছে দীক্ষা পাইয়াছে বলিয়া যে প্রকাশ করিয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই মেয়েটি মাকে জানিত না। এই প্রথম দর্শন। সেই মেয়েটিও বলিয়াছিল, মা তাহাকে “নারায়ণ” এই মন্ত্র দিয়াছেন; আবার মার মুখ হইতে নিজের পরিচয়ও “পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ” বাহির হইয়াছিল। আবার এই বৃদ্ধা ও নারায়ণ মূর্তিই দেখিল, কে জানে ইহার ভিতর কোথায় কি ভাবে যোগাযোগ আছে!

আজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল, আই, সি, এস, কমিশনার, (এলাহাবাদ ডিভিসন)—এবং অগাধ অনেক ভদ্রলোক

আসিয়াছেন। একটি ভদ্রলোক মার অনেক কথা লিখিয়া নিতেছেন। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মা, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সকলের সঙ্গে ত সর্বদা দেখা করেন না, তোমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে?” বাহিরের দিক হইতে মার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। কিন্তু মা জবাব দিলেন, “বাপের সঙ্গে কি মেয়ের দেখা না হয়?” আবার একজন বলিলেন, “মা, দাক্ষিণাত্যে রমণ মহর্ষি আছেন, তাঁহার সঙ্গে তোমার দেখা হয়?” বাহিরের দিক হইতে তাঁহার সঙ্গেও মার দেখা হয় নাই। কিন্তু একথায়ও মা পূর্বের মতই জবাব দিলেন। এই কথায় কমিশনার শ্রীযুক্ত পান্নালালের প্রাণের ভিতর কি রকম ভাব হইল তিনি হাত ঘোড় করিয়া বলিলেন “মা, আমরা আপনাকে নিয়া কত খেলা করিতেছি, আমাদের ক্ষমা করিবেন।” ভাবটা দেখিয়া মনে হইল যেন গীতায় অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন

।

।”

কমিশনার শ্রীযুক্ত পান্নালালের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা হাসিয়া বলিলেন “বাপ মেয়েকে এই রকম বলে না কি? এইত পরের মত কথা বলিলে”; তিনি বলিলেন, “না মা, সেই ভাবে বলি নাই।” আরও অনেক কথা হইল, একজন বলিতেছেন, “মা, কার্য্য করিয়া গুরুর কৃপা আনিতে হয়,” মা বলিলেন, “গুরুর অহেতুক-কৃপা আছেই। ভিতরেই ত

গুরু ; কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা জাগে সেও ত গুরুর কৃপা, কাজেই বলিতে হইবে গুরুর কৃপাতেই সব হয়, তবে একটা অবস্থা আছে যখন গুরুর কৃপা অনুভব হয়।”

৩০শে কার্তিক, বুধবার :—

আজ মা রওনা হইবেন. ভাবে বুঝা যাইতেছে, কিন্তু কোথায় যাইবেন কিছুই বলিতেছেন না। বৈকালে জীতেন দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ ত কোথাকার গাড়ী কখন?” এই বলিয়া তিন চার বার নাম করিলেন। শেষে স্থির হইল মা রাত্রি ৯টার গাড়ীতে বৈষ্ণনাথ রওনা হইবেন। সঙ্গে আমি, রুমা দেবী এবং মহামায়া (এই ‘স্ত্রীলোকটি এবার কলিকাতা হইতে সেবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছে), যাইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী, মনোরঞ্জন (একটি ব্রহ্মচারী, এটাও এবার কলিকাতা হইতে মার সঙ্গে আসিয়াছে) প্রভৃতি ২৪ জন বিদ্যাচল চলিয়া যাইবেন। মা বলিতেছেন, “কোথা হইতে কোথায় যাই আমার কিছু ঠিক নাই।” সকলেই বুঝিলেন, মাকে বাধা দিলে বাধা মানিবেন না, তাই সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। অখণ্ডানন্দজীর খুবই কষ্ট হইল কিন্তু মার আদেশ, তাই মাথা পাতিয়া নিলেন. কোনরূপ বাধা দিলেন না।

রাত্রি ৯টায় আমরা রওনা হইলাম। যতীশ দাদার মাতা, স্ত্রী ও মেয়ে বৃথিকা, এবং প্রাণকুমার বাবুর ছোট মেয়ে অণু বিদ্যাচলেই মার কাছে আসিয়াছিল তাহারাও সঙ্গেই চলিল।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ষষ্ঠ ভাগ

বিস্তারিত বিষয় সূচী
(বর্ণানুক্রমিক)

हिन्दु धर्म का इतिहास

भाग १

हिन्दु धर्म का इतिहास
(प्रारम्भिक भाग)

নানা অবস্থার কথা	২১৮
অসুস্থতা	৫
ইচ্ছা-অনিচ্ছা	২২
কামাখ্যা পর্বতে ঘটনা	১৫৬
কালীমূর্ত্তির অঙ্গহানি	৬৯
খেয়াল—	
খেয়াল হইলে সব সম্ভব—ঘটনা	৫৮
খেয়াল হইরাছে, জ্বর	২১৬
খেয়ালে জনৈক ভদ্রলোকের পূর্বজন্মের কথা	৪৪
গোপাল লীলা, শৈশবের কথা	৩২
“চিরকুমারী”	৯০
জন্মস্থানের কথা	২৬৪
ঢাকায় কালীপূজার ইতিহাস	১৮
ঢাকায় ধানকেনার বাড়ীতে কীর্ত্তনের ইতিহাস	১৮৪
দীক্ষা	৩১১
পাটপাতার ঘটনা	১৯৭
পেটে ব্যথা	২২২
মার পূজা শরীরে-সাধনার খেলা	৩১৫
পূর্ব কথা	১৬৪, ১৬৭
“পূর্বব্রহ্ম নারায়ণ”	১২১
প্রভাব	৮২
বিদ্যাকূট হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সাপ	১৮

ভাবাবস্থা—

আউটসাইদী	১৮৬
সোলন	১২৫
নাটতে ভাত ঝাওঁয়া	১৯৩
মার শরীরের প্রতি আমাদের আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া	২৫৮
মারের উপর জগতের স্থখ দুঃখের প্রভাব	২৯৫
মায়ের শরীর	১৮০
মায়ের সম্প্রদায়—সিদ্ধি মা	৩০৭
মায়ের শরীরে ক্রিয়া	২৪৩
য়েকওঁ	২৮৪
শরীর লইয়া ক্রীড়া	১১৬
স্থল শরীরীরা মার কাছে	১৯
স্তোত্র	১৪৮
হাতের লেখা	১১
হাতে স্থগন্ধ	২০৮

লীলা ও লীলা-মহচর

আঙুর কথা—	২৬৪
এক ভক্ত	২৫২
কল্যাণম প্রতিষ্ঠা	২৪৩
কমলা নেহেরু	৪০
কাহাইয়া লাল	৩১৯
কিন্‌লী সাহেব	২৭৫
কুঞ্জ বাবু'র সন্ন্যাস	১৩
ক্রন্দন লীলা	২৯৯
গৌবর্দ্ধনের মায়ের ঘটনা	২৯৭
“চুলের বালিসে গুইব”	২৮৯

জন্মোৎসব, ঢাকা	৬৭
বারেন দাদা	৯৭
নির্মল বাবুর মৃত্যু	১৮৮
পান্নালাল	৩১২
প্রলাদী পোড়া ডালে গন্ধ নাই	২০৯
“৬৫ নং বাগবাজার”	২৮৫
বন্ধু	৩০২
বুদ্ধার ঘটনা—নারায়ণ	৩২০
ভোলানাথ—	
অবস্থা	৩৭
কীর্তন	৮
মৃত্যুর বিবরণ	৫৪, ৬৫, ১০৮, ১৩৬, ১৪৯
সলিল সমাধি	৬০
নেত্রদেব কীর্তন, ঢাকার	৭২
নরেশ বাবুর পত্র	১৩৪
নতীন্দ্র পাণ্ডার ঘটনা	২৯৭
শিখ সাজু	২০৪
শিব প্রসাদ সিংহ	২৯৪
সুকুমারের মৃত্যু	২১০
স্বভাষ চন্দ্র বসু—	২৮১
মায়ের উপদেশ	
ইষ্টনন্দ গুপ্ত রাখিতে হন	১৮৩
এক লক্ষাই উপায়	২১৫
রূপা ও কন্দ	১৮১
জীবমুক্তদের স্বপ্ন	২০২

বিত্তপত্রালা নিয়ন্ত্রণ	৩৩
নাথের প্রভাব	২০১
পত্রোত্তরে মাতৃবাণী	১৪৫
প্রকৃতি ও পুরুষ	৪০
ব্রহ্ম-সমুদ্র ও জীব-তরঙ্গ	৩২
নাথ-নস্থির করা	২২০, ২৭০
নাথ "যোগকে ভাড়াব কেন"	২০৩
নাথ "ব্রিটান টিকিট"	১৭৮
নাথ সমুদ্র	৩২, ২৪৩
নাথ মায়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত	
মায়ের এলাহাবাদ	২৬৯, ৩১৮
মায়ের কলিকাতা—নাম-যজ্ঞ	২৭৬, ২৯৯
শ্রী কাম্বী—চূড়ামণিযোগ	৩০৪
মায়ের ডিক্লে দর্শনে - পথে	১৬৯
মায়ের ঢাকা—কালীপূজা, অন্নকূট	২৮৭
মায়ের বিদ্যাচল	২৯
মায়ের সুন্দরী	১৫৮, ১৮৫
মায়ের মিমলায় নামযজ্ঞ	১০৩
মায়ের সোলনে নামযজ্ঞ	১১৪, ১২৫
মায়ের হরিদ্বার	১, ১৩৩, ২১৭, ২৩১

শেষ

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

সদ্বাণী (মাতৃবাণী সংগ্রহ) — ৩ ভাইজী	
ঐ (গুজরাটী অনুবাদ) — শ্রী কান্তি ভাই বাস	২১
ঐ (ইংরাজী অনুবাদ) — শ্রী গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	২১
সাত্ত্বদর্শন (সংক্ষিপ্ত জীবনী) — ৩ ভাইজী	১১০
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (বিস্তারিত ধারাবাহিক জীবনী)	২১
— ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়	
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ভাগ	
প্রতিখানা—	২১
ঐ ১ম ভাগের হিন্দি অনুবাদ — ডাঃ পান্নালাল	৩১
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত,	
১ম, ও ২য় ভাগ প্রত্যেকটি—	১১০
মা আনন্দময়ীর আগমনে — শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১০
মা আনন্দময়ীর বাণী — অভয়	১১০
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী লীলাকথা — অভয়	১১০
মা আনন্দময়ীর কথা —	১১০
Ma Anandamayee—by Devotees	১১০
মা — (মায়ের ৬ খানি দ্বিবর্ণ চিত্র সম্বলিত বাংলা এ্যালবাম)	১১০
MA — (ঐ ইংরাজী)	১১০
মা ছাড়া মায়ের ছবি প্রতিখানা—	২১০ ১১০ ৩১০

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দময়ী আশ্রম, ২১৯৪ ভদৈনী

Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

বেনারস ।

শ্রীশ্রীমদাঃ আনন্দময়ীমন্ত্র

- ১। কিষণপুর, দেয়াছন
- ২। রায়পুর, ,,
- ৩। ডোঙ্গা, ,,
- ৪। উত্তরকাশী, চাঁহরি, গাড়ওয়াল
- ৫। পাতালদেবী, আলমোড়া
- ৬। অ'ভূজ পর্বত, বিদ্যাচল
- ৭। ভদৈনৌ [২১৯৪] বেনারস
- ৮। ভীমপুরা, নর্মদাতীর; চান্দোদ, শুজরাট
- ৯। বাগাগঞ্জ, মাও একডালিয়া রোড, কলিকাতা
- ১০। স্বর্গদ্বার, সমুদ্রতীর, পুরী
- ১১। র ৭১, ঢাকা
- ১২। সিদ্ধেশ্বরী, ,,
- ১৩। খেওড়া, ত্রিপুরা

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তম ভাগ—

এলাহাবাদ ত্যাগের পর
বৈষ্ণনাথ, বিদ্যাচল-বরোদা, ব্যাস,
চান্দোদ, দিল্লী-দেরাছন, হুথিকেশ,
উত্তরকাশী ইত্যাদি ভ্রমণকালে,
দিদিমার সন্ন্যাস, মার সাধনার
খেলার বিবরণ, ভোলানাথের
সহিত ঢাকা-বাজিতপুর বাসকালীন
পূর্বকথা ইত্যাদিতে মায়ের যে
আত্মপরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—
তাহা অতুলনীয়। শুক্লসঙ্গে
কথোপকথনে যে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা
অনুভূতির রসে সিক্ত হইয়া
বিস্তৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহা
ভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

[চৈত্র, ১৩৪৫]

